কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

RAMDOSS Library
Dhaka

মীজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
মার্কেটিং বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৯৯
আগস্ট ১৯৯২
বাএ ২৬৪৯

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আবদুর রউফ সরকার

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

BANSDOC Library
Accession No. 12216
Date 6.6.05

KRISHIPANNAYR BAZARZATKARAN: PART II. (Marketing farm Products) by M[illegible] Rahman. Published by Gholam Moyenuddin, Director. Text Book Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh.
First Edition, December 1992.
Price: Taka 100·00

ISBN 984–07–2658–7

উৎসর্গ

মীনু ও অনিন্দ্যকে

ভূমিকা

কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনাকাল প্রায় এক দশক বিস্তৃত। মার্কেটিং বিষয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর পাঠ্যবিষয় হিসেবে কোর্সটি পড়াতে গিয়ে বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত পুস্তকের তীব্র সঙ্কট অনুধাবন করি। আমেরিকায় রচিত পাঠ্যপুস্তক, যেগুলো মার্কেটিং বিষয়ের প্রায় সব কোর্সেরই টেক্সট বই ; 'কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ' কোর্সের জন্যে এদেশের প্রেক্ষিতে ভীষণভাবে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, যা অন্যান্য কোর্সের ক্ষেত্রে ততটা নয়। তাই 'মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকের তীব্র সঙ্কট' নয় বরং উল্লেখিত বিষয়ে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকের শূন্যতা' আমাকে এই পুস্তক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। 'কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ' পুস্তকটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে 'কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ' বিষয়ের 'তত্ত্বীয় দিক এবং 'প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী' আলোচনা করা হয়েছে। একই খণ্ডে সমবায়, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ওপর 'পণ্যভিত্তিক' আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোগের জন্যে বণ্টন পর্যন্ত পদ্ধতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যদিও প্রায় পণ্যেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই কিছু কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে, একাধিক পণ্যের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। পুস্তকটির দুই খণ্ড মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কৃষিপণ্যের বাজারজাকরণ' কোর্সের সিলেবাসের সিংহভাগের প্রয়োজন মিটবে। এছাড়া স্নাতক শ্রেণীর "পরিবহণ ও গুদামজাতকরণ", "বাজারজাতকরণ নীতিমালা" এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর "বাংলাদেশে বাজারজাতকরণ" কোর্সের সহায়ক পুস্তক হিসেবে একটি বিশেষ অবদান রাখবে।

এই পুস্তক রচনায় আমার সহকর্মীরা আমাকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক আসগর আলী তালুকদার, অধ্যাপক এম. এ. কুদ্দুস, জনাব সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান ও জনাব আবু সাঈদ তালুকদারের নাম আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি। পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হকের পরামর্শ পুস্তকটির মান উন্নয়নে ফলদায়ক হয়েছে। পরবর্তী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আবদুল্লাহ্ ফারুক পুস্তকটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সম্পাদনা পর্যায়ে ডঃ ফারুকের বাংলাদেশের বাজারজাতকরণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োগ পুস্তকটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

এই পুস্তক রচনায় দেশী-বিদেশী বহু পুস্তকের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এসকল পুস্তকের লেখকদের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। এ পর্যায়ে ডঃ আবদুল্লাহ্ ফারুক, অধ্যাপক এম. এ. কুদ্দুস, ডঃ এম. এ. মান্নান, রমনীমোহন দেবনাথ, মনোরঞ্জন দে এবং জনাব বেলায়েত হোসেন কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলোর কথা স্মরণ করছি। লেখকদের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। অতি প্রয়োজনীয় একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এজন্যে আমি বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বিভাগের এবং প্রেসের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর নিকট কৃতজ্ঞ। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিকতার কারণেই পুস্তকটি প্রকাশিত হল।

দীর্ঘদিন ধরে আমার স্ত্রীর অনবরত অনুপ্রেরণা পুস্তকটির বিশাল পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সচল রেখেছিল। পাণ্ডুলিপি রচনায় তাঁর সহযোগিতার কথা সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, পুস্তকটি "আমাদের" রচনা।

মার্কেটিং বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মীজানুর রহমান

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ	পাট	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	ডাল	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	আলু	৪৬
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	শাকসব্জী	৫৭
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	ফল ও ফলজাত	৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশে ফল ও শাকসব্জী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা	১০৯
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	পান	১২৫
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	চিংড়ি	১৩৩
নবম অধ্যায়	ঃ	লবণ	১৪৪
দশম অধ্যায়	ঃ	আখ	১৫৭
একাদশ অধ্যায়	ঃ	তামাক	১৬৭
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ	চা	১৮৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ	মৎস	২১৩
চতুর্দশ অধ্যায়	ঃ	মসলা	২২৯
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঃ	চামড়া	২৪৪
ষষ্ঠদশ অধ্যায়	ঃ	দুধ	২৬১
সপ্তদশ অধ্যায়	ঃ	তুলা	২৮৬
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ		২৯৯

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশের কতিপয় কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

পাট

ভূমিকা ঃ পাট বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশেই পাটের চাষ হয়. তবে আমাদের মোট আবাদী জমির মাত্র ৭% পাটের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ উপমহাদেশে পাট সর্বপ্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থান লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৭৯৩ সালে গ্রেট বৃটেন থেকে সর্বপ্রথম পাট কেনার প্রস্তাব আসে, এর পর ধীরে ধীরে পাটের ব্যবসা সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাপকভাবে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি শুরু হয়, (উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালে এ দেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়), তারপর ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিদ্রব্যে পরিণত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্বোত্তম উৎস হয়ে ওঠে পাট এবং অদ্যাবধি (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন কারণে পাটের চাহিদা হ্রাস পেলেও) পাটই বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস।

কেবলমাত্র পাট ও পাটজাত দ্রব্য সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে একটি পৃথক পাট মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে পাটের ব্যাপক চাহিদার জন্যে পাট বিপণন তথা পাটের পরিকল্পিত উৎপাদন, বন্টন ও সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পাট থেকে আসে। পাট সংস্থাসমূহের একটি হচ্ছে পাট পরিদপ্তর। এর কাজ হ'ল দেশের অভ্যন্তরে পাট বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সরকারী নীতি প্রয়োগ করা। এছাড়া কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী সংস্থা পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পাট সংস্থা, পাট ব্যবসায় সংস্থা, পাট বাজারজাতকরণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাট বাজারজাতকরণ সংস্থার কাজ পাটচাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য লাভের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নিজস্ব ক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে পাটচাষী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করা ; তাছাড়া পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা। এ দেশে প্রায় ৮০টির মত পাটকল পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে, সরকার সম্প্রতি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু পাটকল বেসরকারী মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছেন। নিম্নে পাট বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হচ্ছে।

পাট বিপণনে বিভিন্ন প্রণালীর সমস্যা

বাংলাদেশে পাট বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী তথা মধ্যস্থ কারবারী জড়িত রয়েছে। কাঁচা পাটের বণ্টন প্রণালী ব্যবহারকারীর শ্রেণীভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। পাট বিপণনে মধ্যস্থ কারবারী যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করে থাকে তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বেপারী ও ফড়িয়া ঃ বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে পাট উৎপাদিত হয়, সেখানে বেপারীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাট সংগ্রহ করে। পাটের বণ্টন প্রণালীর প্রথম ধাপেই কর্মরত থাকে দেশব্যাপী এ ধরনের অসংখ্য বেপারী ও ফড়িয়া। বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্থ কারবারীর মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি। যেহেতু এ ধরনের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী উৎপাদনকারী তথা কৃষক শ্রেণীর কাছ থেকে সরাসরি পাট ক্রয় করে থাকে, ফলে স্থানীয় বাজারে তাদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি থাকে। সাধারণত হাটের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাটের বাজার বসে। সেখানে ফড়িয়া কারবারীরা পাট কেনার জন্য উপস্থিত হয় এবং উৎপাদকদের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে পাটের মূল্য স্থির করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাট বিপণনে, বেপারী হল প্রাথমিক মাধ্যম। অনেক সময় উৎপাদনকারী তথা কৃষকরা বেশি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের উৎপাদিত পাট নিকটস্থ বড় বাজারে নিয়ে আসে। পাটের শ্রেণী, গুণ, রং ও শুষ্কতার ওপর মূল্য নির্ভর করে।

সাধারণত বেপারী ও ফড়িয়াগণ কৃষক শ্রেণী হতে আসা ব্যবসায়ী শ্রেণী, যারা পাটের মৌসুমে যখন খামারের কাজ কম থাকে, তখন এ ব্যবসা করে থাকে। সব সময় এদের পক্ষে বিশ্ব বাজারের খবরাখবর রাখা সম্ভব হয় না এবং পাট চিনতে না পারায় এদের বিশেষ দক্ষতা অর্জনের সুযোগও হয় না। যেহেতু এ ধরনের ব্যবসায়ীদের পুঁজি সামান্য এবং ঋণের সুযোগ স্বল্প, তাই এরা একবারে ২০/৩০ মণের মত পাট কিনে বিক্রয় করে। এবং যতদূর সম্ভব কৃষক হতে কম দামে পাট কেনার চেষ্টা করে। অন্যদিকে চাষীদের পক্ষে ফড়িয়া-বেপারীদের কাছে বাড়িতে বসে পাট বিক্রয় করা সুবিধাজনক ব্যবস্থা। কারণ তাদের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ এত কম যে, তা নিয়ে দূরের বাজারে সামান্য বেশি দামে বিক্রয়ের সম্ভাবনাটা তেমন একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়। তাই ক্ষুদ্র কৃষকগণ যদিও উৎপাদনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে কিন্তু পাটের বাজারজাতকরণে এ সমস্ত বেপারী ও ফড়িয়াগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে কৃষকগণ বরাবরই পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বেপারী বা ফড়িয়াদের পাট বিক্রয়ের উৎস বিভিন্ন উচু শ্রেণীর মধ্যস্থ কারবারী যেমন, কাঁচা বেলার, পাকা বেলার বা তাদের এজেন্ট কিংবা সরাসরি মিল বা মিলের প্রতিনিধি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বেপারী ও ফড়িয়াদের শতকরা তেতাল্লিশ জন একাধিক উৎস থেকে পাট ক্রয় করে এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রেতাদের নিকট তা বিক্রি করে।

আড়তদার ও দালাল : আড়তদার এমন একজন মধ্যস্থ কারবারী যে [illegible] ফড়িয়া ও উৎপাদককে পাটের ক্রেতা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। আড়তদার [illegible] উৎপাদক, [illegible] বা ফড়িয়া এবং অন্যদিকে বেলার ও মিলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে [illegible] তবে আড়তদারগণ নিজেরা পাট ক্রয় করে না, সে ক্ষেত্রে তারা দালালের [illegible] ও বিক্রেতার মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে এবং তাদের নির্ধারিত কমিশন উভয় [illegible] কোন এক পক্ষের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। হাট বা বাজারে আড়তদারদের একটি [illegible] বা [illegible] থাকে, যেখানে ওজন করার, স্বল্পকালের জন্য পাট গুদামজাত করার [illegible] [illegible] ব্যবস্থা থাকে।

আড়তদারদের কাজ কিছুটা নমনীয়। সধারণত সে নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে [illegible] মাঝে মাঝে বিক্রেতাদের আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণ সুবিধা দান করে [illegible] [illegible] কখনও কখনও পাট কেনাবেচার কাজ করে, তবে অনেক সময় [illegible] আড়তদারদের নিকট থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

দালাল বা ব্রোকারও একজন মধ্যস্থ কারবারী। দালাল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক [illegible] [illegible] থাকে। তার প্রধান কাজ হল ক্রেতা ও বিক্রেতাকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনয়ন [illegible] [illegible] খোলা পাটের ক্রয় বিক্রয়ে জড়িত থাকে এবং ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের [illegible] [illegible] কমিশন গ্রহণ করে থাকে। আড়তদারদের ন্যায় দালালদের সুনির্দিষ্ট কোন অফিস [illegible] [illegible] ক্রেতা ও বিক্রেতা এ দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন [illegible] দালাল অন্য কোন কর্মে থাকে না।

কাঁচা বেলার : কাঁচা বেলার বড় বড় বাজারে নিজেদের কাঁচা বেল তৈরির ব্যবস্থা [illegible] কিন্তু রপ্তানির জন্য ক্রয় করা পাট সাধারণত ৫ মণের পাকা বেল বাঁধা গাঁইটে রূপান্তরিত [illegible] হয়। কাঁচা বেলার তাদের কাঁচা গাঁইটসমূহ শিপার, পাকা বেলার বা স্থানীয় মিলের [illegible] বিক্রি করে। অবশ্য তার পক্ষ হয়ে খোলা পাট ক্রয় করার জন্য প্রাথমিক বাজারসমূহে [illegible] বেলাররা প্রায়ই শাখা অফিস খুলে থাকে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করে থাকে।

গাঁইট ব্রোকার : গাঁইট ব্রোকারের কাজ হ'ল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন [illegible] গাঁইট বাঁধা পাটের লেনদেন সম্পূর্ণ করা। বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র [illegible] [illegible] ও খুলনায় এ ব্রোকাররা সর্বাধিক তৎপর থাকে। তারা কাঁচা বেলার, পাকা বেলার [illegible] এ সময় সময় আভ্যন্তরীণ মিলগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়। [illegible] [illegible] বিক্রেতাদের সাথে প্রথমে যোগাযোগ করে তাদের বিক্রয়যোগ্য পাটের পরিমাণ [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য সম্পর্কে অবিহিত হয়। এর পরে সে সম্ভাব্য ক্রেতাদের খুঁজে বের করে [illegible] তাদের প্রয়োজনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনে নেয়। দুই পক্ষের মধ্যে [illegible] [illegible] ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে ব্রোকার তার কার্য সম্পন্ন করে।

পাকা বেলার ও শিপার ঃ সাধারণত পাকা বেল করবার জন্য (এবং সময় সময় কাঁচা বেল করবার পূর্বেও) গুণানুসারে গ্রেডিং বা অ্যাসর্টমেন্ট করে, গোড়ার শক্ত আঁশ কেটে বাদ দিয়ে উত্তমরূপে শুকাবার পর, ব্রামা প্রেস (বা হাইড্রোলিক প্রেস) নামক যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়ে নির্দিষ্ট আকারের বেলে রূপান্তরিত করতে হয়। রপ্তানির জন্য শুধু এরূপ গ্রেডিং করা পাকা বেলই জাহাজে গ্রহণযোগ্য।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিপার বা পাকা বেলার একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে মধ্যস্থ কারবারীদের মধ্যে পাকা বেলার ও শিপাররাই হল সর্বশেষ যোগসূত্র। কতিপয় পাকা বেলার রয়েছে যারা নিজেরা পাট রপ্তানি করে না। শিপার বা পাকা বেলারগণ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

ক. খোলা অশ্রেণীবদ্ধ পাট ক্রয় ;
খ. কাঁচা পাট পর্যালোচিতকরণ ও পাটের কাঁচা গাঁইট বাঁধা ;
গ. চূড়ান্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ ও চূড়ান্তভাবে গাঁইট বাঁধা ;
ঘ. পরিবহণ ;
ঙ. অর্থসংস্থান ;
চ. সংরক্ষণ ;
ছ. রপ্তানি ;

প্রান্তস্থানীয় পাট বেলিং ও রপ্তানিকারক ফার্মসমূহ গুরুত্বপূর্ণ এসেম্ব্লিং বাজারগুলোতে ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে থাকে। সাধারণত স্থানীয়ভাবেই কাঁচা গাঁইট বাঁধার কাজ নিষ্পন্ন করা হয় এবং পাকা গাঁইটে রূপান্তরিত করার জন্য নারায়ণগঞ্জ, দৌলতপুর ও চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, যেখানে পাট বেলিং বা প্রেসিং-এর ব্যবস্থা আছে, সেই বাজার সাধারণত বড় ধরনের ব্যবসায়ীদের কার্যস্থল। এ ধরনের বাজারকে সেকেন্ডারী বাজার বলা হয়, যেমন সরিষাবাড়ী বা সিরাজগঞ্জ, যে সকল বাজার হতে সরাসরি পাট বিদেশে রপ্তানি করা হয়, সে সকল বাজারকে টার্মিনাল বাজার বলা হয়। এজন্য বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার পাটের বাজারকে টার্মিনাল বাজার বলা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাটের বণ্টন প্রণালীতে বহুবার রদবদল হয়েছে। পাকিস্তান আমলে যেরূপ বিপণন পদ্ধতি বিরাজ করছিল তার পরিবর্তন হলেও তা কেবল চূড়ান্ত বিপণনে হয়েছে, প্রাথমিক বিপণন পর্যায়ে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে বণ্টন প্রণালীতে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ও জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন পাট কলসমূহ এবং পাট রপ্তানি সংস্থার নিকট পাট বিক্রয় করে আর পাট রপ্তানি সংস্থা ও প্রাইভেট রপ্তানিকারীরা সমুদয় পাট বিদেশে রপ্তানি করে। ফড়িয়া ও বেপারীরা তাদের ক্রীত পাটের কিছু অংশ জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ও জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনের কাছে এবং কিছু অংশ পাট কলগুলোর কাছে এবং কিছু আড়তদার ও দালালদের কাছে বিক্রি করে। পাকা বেলাররা পাটকলগুলোর নিকট কিছু পাট বিক্রয় করার পর বাকি পাট বিভিন্ন রপ্তানি সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করে।

পাটের বিপণনে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ এবং উৎপাদনকারী তথা কৃষকদের স্বার্থ

জাতীয় অর্থনীতিতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। সময়মত পরিকল্পনার অভাব আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, পাটনীতি তথা পাটের ন্যায্য মূল্য নিয়ে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের অভাব, সঠিক পরিসংখ্যান এবং ব্যবস্থাপনার অভাবে পাটের বিপণন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হয়। এদেশে পাট বিপণনের সঠিক প্রক্রিয়া নিয়ে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা সেই সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এবং সরকারের এক আন্দোলনের পর্যায় শেষ হয়ে ১৯৮৬তে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে পাটের বিপণন প্রক্রিয়ার সঠিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এ দেশের পাট ও পাটজাত দ্রব্য রক্ষা করতে হলে কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু পাটের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শুধু সুনির্দিষ্ট দাম বেঁধে দিলেই পাট চাষীদের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে আপাতদৃষ্টিতে চাষীদের উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় "চাই সরকার" মত।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন অর্থনীতির নিজস্ব একটা গতি রয়েছে। একে পাশ কাটিয়ে যে কোন নীতি গ্রহণ করা হোক না কেন তা কখনই বাস্তবে পরিণত হবে না। নিম্নে পাট বিপণন প্রক্রিয়ায় মূল্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়ার যুক্তি চাষীদের স্বার্থের অনুকূলে নয়; তা আলোচনা করা হল।

এদেশের পাটের বিপণন প্রক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। সেগুলো হল :

- ক প্রাথমিক স্তর
- খ মাধ্যমিক স্তর
- গ সর্বশেষ স্তর

ক প্রাথমিক স্তর ঃ প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র চাষীরা সাধারণত স্বল্প পরিমাণে পাট বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসে, ফলে দরকষাকষির ক্ষেত্রে তারা বড় ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফড়িয়া এবং ঐ ধরনের আঞ্চলিক ব্যবসায়ীদের পরিকল্পিত জোটের সাথে এঁটে ওঠে না। তদুপরি পাটের পরিসংখ্যানের অভাব এবং সরকারী কাঁচাপাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা না থাকায় প্রতি বছরের মত এবারও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় প্রায় তিনগুণ পাট বেশী উৎপাদিত হয়েছে, ফলে এবছর অর্থাৎ ১৯৮৬ তে পাট চাষীকুল তাদের উৎপাদিত পাট বাজারে এনেও ক্রেতার অভাবে তা বিক্রি করতে পারছে না। প্রায় প্রতি বছরই এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ক্ষুদ্র চাষীরা পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

খ. **মাধ্যমিক স্তরঃ** পাট বিপণনে মাধ্যমিক স্তরটি থাকে উচ্চাভিলাষী ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, কেননা মৌসুমের শুরুতে স্বল্পমূল্যে কাঁচা পাট ক্রয় এবং তা গুদামজাতকরণের ব্যক্তিগত এবং সরকারী উভয় সুযোগ সুবিধাই তারা ভোগ করে থাকে। অপরদিকে বেসরকারী ও সরকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর পক্ষে মৌসুমের শুরুতে পর্যাপ্ত গুদামের অভাবে পাট সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সরকার নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট মূল্য তথা নিয়ম নীতিমালা অনুযায়ী পাট ক্রয় করতে হয় বলে বছরের শুরুতে সরকারী আধা-সরকারী অথবা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাজারের চলতি রেট অপেক্ষা বেশি মূল্যে পাট ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়, মৌসুম শেষে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প মূল্যে পাট ক্রয় করার সুবিধা ভোগ করে থাকে। ফলে ব্যবসা যা পাওয়ার তা মধ্যস্বত্বভোগী তথা উচ্চাভিলাষী ব্যবসায়ীরাই পেয়ে থাকে, এতে কৃষকদের স্বার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

গ. **সর্বশেষ স্তর ঃ** কাঁচা পাট বিপণনের সর্বশেষ স্তরটিতে উৎপাদনকারী তথা চাষী এবং ব্যবসায়ী উভয়ই সুবিধা এবং অসুবিধা ভোগ করে থাকে। উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম হলে, সে ক্ষেত্রে চাষী ভাল দাম পাবার সম্ভাবনা থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বর্তমানে পাটের আবাদ কমে যাওয়ায় এবং উন্নতমানের পাট উৎপাদিত না হওয়ায় পাটের দাম সর্বশেষ পর্যায়ে কমার সম্ভাবনা থাকে ৫০%। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের মৌসুম অনুযায়ী এবং মন্দার সময় পাটের মূল্যের তারতম্য ঘটে। যেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে তাদের মজুদকৃত পণ্যের ভাল দাম পাবার সম্ভাবনা থাকে।

এবছর জুলাই মাসের শেষের দিকে বাজারে পাট ওঠা শুরু করবে। কিন্তু বাজারে সে সময় ক্রেতা পাওয়া যাবে না, কেননা গত বৎসরের (১৯৮৫) প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ বেল পাট [illegible] হয়ে বিভিন্ন গুদামে পড়ে আছে। নতুন মৌসুমে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনকে ৭ লক্ষ বেল পাট কেনার জন্য ১২০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বৎসরে ৩১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, ঐ টাকায় কর্পোরেশন প্রায় ২৪ লক্ষ বেল পাট কিনেছিল।

বর্তমানে বাজারে নতুন মৌসুমে পাট ওঠা শুরু করলেও ক্রেতার অভাবে চাষীরা বাজারে পাট বিক্রি করতে পারছে না। ওদিকে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী এবং আর্থসামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাটের ন্যূনতম মূল্য মণপ্রতি ৫০০ টাকা বেঁধে দেবার দাবি তুলছে। আপাতদৃষ্টিতে এ দাবি যুক্তিযুক্ত মনে হলেও বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে তা আমাদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

পাট পর্যায়িতকরণের পদ্ধতিগত সমস্যা ও সম্ভাবনা

উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যকে তার মান, আকার, স্বাদ, গন্ধ এবং দ্রব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে এবং মূল্য নির্ধারণ করে, সে সমস্ত গুণাগুণ এবং পূর্ব নির্ধারিত মান গুলিকের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার সুষম শ্রেণীতে দ্রব্যকে বিভক্ত করাই হল

শ্রেণীবিন্যাসকরণ বা গ্রেডিং। দ্রব্যের মান বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। একই দ্রব্যের বিভিন্ন মানের জন্য তার চাহিদা এবং মূল্য স্থান ও কালভেদে ভিন্নতর হয়। সুতরাং উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, ক্রেতা এবং ব্যবহারকারী সকলের সুবিধার জন্য পণ্যের গ্রেডিং প্রয়োজন হয়। ক্রেতা যখন ব্যক্তিগতভাবে দ্রব্যের গুণাগুণ অবলোকন করে ক্রয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে তখন ঐ দ্রব্যের গ্রেডিং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন ক্রেতার পক্ষে অনেক সময়ই গুণাগুণ যাচাই করে পণ্যদ্রব্য কেনা সম্ভব হয় না। তখন দ্রব্যের একটি উন্নতমানের গ্রেডিং পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। এটি বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির একটা দিক এবং এ দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিভক্ত ভারতে 'কৃষিপণ্য (গ্রেডিং ও মার্কিং) আইন ১৯৩৭' প্রণয়ন করা হয়, তা এখন পর্যন্ত বলবৎ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তেমন কোন কার্যকারিতা বা প্রয়োগ নেই।

বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে কাঁচা পাট বিশেষ রপ্তানিযোগ্য পাটের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রেডিং সর্বাপেক্ষা জটিল কাজ। পাটের মান নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী তার গ্রেডিং গত শতাধিক বৎসর পূর্ব হতে চলে আসছে। পাটের সুনির্দিষ্ট গ্রেডিং অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া উন্নত গ্রেডিং ব্যবস্থা ছাড়া পাটের মান এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। নিম্নে পাট গ্রেডিং এর মান, [illegible] সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা আলোচনা করা হল ঃ

বাংলাদেশে পাট পর্যায়িতকরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে বয়ন গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে পাট পর্যায়িত করা হয়। এই গুণাগুণ আবার নির্ধারিত করা হয় পাটের তন্তুর কতিপয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। যে সব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়, সেগুলো হলো তন্তুর দৈর্ঘ্য, কঠিনতা, নমনীয়তা, উজ্জ্বলতা এবং [illegible] বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় পাট উৎপাদিত হয়, সে সব জেলার মধ্যেও ভূমি, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া এবং পানির লভ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে পাট পর্যায়িত করার সময়ে পাটের উৎপাদন অঞ্চলও বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন উপায়ে পাট পর্যায়িত করা হয় ঃ-

(ক) প্রাথমিক পর্যায়িতকরণ
(খ) চূড়ান্ত পর্যায়িতকরণ

ক পাটের প্রাথমিক পর্যায়িতকরণ

প্রাথমিক গ্রেড বা পর্যায় নির্ধারণ করার সময় প্রথমে পাটকে বৈচিত্র্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ সদা ও তোষা। এরপর এদের প্রত্যেকটিকে উৎপাদন অঞ্চল অনুযায়ী আরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। শ্রেণীগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. **জাত ঃ** ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, কুমিল্লা জেলায় উৎপন্ন পাটের নাম জাত পাট। জাত অঞ্চলে পাট উৎপাদনের সবচেয়ে কাম্য জলবায়ু বিরাজমান। সাধারণত জাত অঞ্চলে উৎপাদিত পাট ডিস্ট্রিক অঞ্চলে উৎপাদিত পাট অপেক্ষা উন্নতমানের।

২. **ডিস্ট্রিক্ট ঃ** পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল, পটুয়াখালি, সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় উৎপাদিত পাটের নাম ডিস্ট্রিক পাট। ডিস্ট্রিক অঞ্চলের ভূমি পাট উৎপাদনের জন্য ততটা উৎকৃষ্ট নয় এবং আবহাওয়া অবস্থা সব জেলায় একরকম হয় না।

৩. **নর্দানঃ** রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলার উৎপাদিত পাটকে বলা হয় নর্দান পাট। নর্দান অঞ্চলের পাট ডিস্ট্রিক অঞ্চলের পাট অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর।

বিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জেসিয়ান এবং স্যাকি এর জন্য পাট পর্যায়িতকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। তখন ১নং, ২নং, ৩নং ৪নং এবং আর ও কাটিংস এ ছয়টি গ্রেড প্রবর্তন করা হয়। ক্রমানুসারে গ্রেডসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. জেসিয়ান ওয়ার্প
২. জেসিয়ান ওয়েকট
৩. স্যাকিং ওয়ার্প
৪. স্যাকিং ওয়েকট
৫. রিজেকশন (৬) এবং
৬. কাটিং

বেশ কয়েকবার পরিবর্তনের পর ১৯৩৮ সালে টপ, মিডল এবং বটম নামে তিনটি স্ট্যাণ্ডার্ড প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান জুট এসোসিয়েশন এ স্ট্যাণ্ডার্ড গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালে জুট এসোসিয়েশন আরও একটি নতুন গ্রেড অন্তর্ভুক্ত করে এর নাম সি-বটম। পর্যায়িতকরণের আরও পরিবর্তন সাধিত হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান জুট এসোসিয়েশন সাতটি গ্রেডের প্রচলন করে যা আজও আমাদের দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে গ্রেডসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ-

বিভিন্ন গ্রেডের পাটের বর্ণনা

গ্রেড	অবস্থা	কাটিং এর উচ্চতার মাত্রা
টপ	চমৎকার রং ও উজ্জ্বল, উত্তম দৈর্ঘ্য এবং সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত খুব মজবুত তন্তু।	[illegible]
মিডল	মজবুত ঝকঝকে তন্তু পছন্দসই মাঝারি দৈর্ঘ্য, ভাল রং, শ্যামলা রং বর্জিত, ভাল উজ্জ্বল, দাগমুক্ত এবং ঝকঝকে, গোড়া বিবর্জিত।	[illegible]
বটম	যে কোন রং এর মধ্যম শ্রেণীর মজবুত তন্তু যা অন্য দুপ্রকার উচ্চ শ্রেণীর গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করার অযোগ্য।	[illegible]
বি-বটম	উপরে বর্ণিত যে কোন গ্রেডের অনুপযোগী মাঝারি দৃঢ়তা সম্পন্ন তন্তু।	[illegible]
সি-বটম	শেষ প্রান্তে কর্কশতা বিবর্জিত মধ্যম মানের দৃঢ়তা ও রং বিশিষ্ট তন্তু	[illegible]
ক্রস-বটম	পাটকাঠি বা ছুৎকামুক্ত ও জট পাকানো নয় এমন ধরনের দুর্বল শ্রেণীর শক্ত, যে কোন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পাট	[illegible]
[illegible]	ধুলাবালি ও কাটিংস বিবর্জিত যে কোন প্রকার জট পাকানো ও দুমড়ানো-মোচড়ানো পাট	

খ. পাটের চূড়ান্ত পর্যায়িতকরণ

খোলা কাঁচা পাট বা প্রাথমিকভাবে গাইট বাঁধা পাট থেকে পর্যায়িতকরণ করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়িতকরণের সময় পাটের নিম্নাংশের শক্ত অংশ কেটে ফেলা হয়; ফেলে দেওয়া অংশের নাম কাটিংস। বাকী অংশের নাম লং জুট। কাটিং ও লং জুট আলাদা আলাদা প্যাকিং করা হয়। চূড়ান্ত গ্রেড তিন প্রকার। যথা ঃ

১. পাবলিক মার্কস
২. প্রাইভেট মার্কস
৩. সর্ট গ্রুপস

১. **পাবলিক মার্কস ঃ** বিদেশী পাট ব্যবসায়ী ও বয়নকারী কর্তৃক স্বীকৃত গ্রেডসমূহকে পাবলিক মার্কস নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৯৩ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা বেলিং জুট এসোসিয়েশন এসব মার্কস নির্ধারণ করে। তারপর বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। [illegible]

লণ্ডন জুট এসোসিয়েশন ৩০ টির অধিক গ্রেড উদ্ভাবন করে। এসকল গ্রেড সাদা ও তোষা উভয় প্রকার পাটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২. **প্রাইভেট মার্কস ঃ** বিশেষ কোন বিদেশী আমদানিকারক বা বয়নকারীর চাহিদা মেটানোর জন্য দেশীয় রপ্তানিকারক নিজের বুদ্ধি মাফিক যে গ্রেড গ্রহণ করে তাকে বলা হয় প্রাইভেট মার্কস বা প্রাইভেট গ্রেড। এসব মার্কস অনেকটা মুদ্রিত বাণিজ্যিক প্রতীক বা পাবলিক মার্কস-এর উপর শ্রেণী বিন্যাস। এ জাতীয় গ্রেডে বেলারের পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে পাটের গাঁটের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

৩. **সর্ট গ্রুপস ঃ** সর্ট গ্রুপস লণ্ডন জুট এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত হয়। বহুসংখ্যক পাবলিক ও প্রাইভেট মার্কস -এর ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সর্ট গ্রুপস এর প্রবর্তন করা হয়। এগুলো প্রত্যেক বছর সংশোধন করা হয়। বিদেশের সাথে সর্ট গ্রুপস এর ভিত্তিতে প্রচুর বাণিজ্য হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের পাটের গ্রেডিং গ্রুপকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ

ক. পুরাতন পদ্ধতি
খ. নতুন পদ্ধতি

বাংলাদেশের পাট বিপণনে গ্রেডিং পদ্ধতিতে যথেষ্ট মত পার্থক্য ও জটিলতা রয়েছে। ১৯৭০ সালের পূর্বে পাকিস্তান জুট এসোসিয়েশন (PJA) এক ধরনের গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু রেখেছিল এবং এ ধরনের গ্রেডিং ব্যবস্থাকে বলা হয় গ্রেডিং এর পুরাতন পদ্ধতি। পণ্য গ্রেড চিহ্নিতকরণে পুরাতন পদ্ধতি অপ্রতুল এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে জানা যায়। এজন্য ব্যবসা ন্যায় বিরুদ্ধ, সংঘর্ষপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়। ফলে উৎপাদনকারী পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য উৎপাদনকারীরা পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য যে, ষাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে উচ্চ এবং মধ্যম গ্রেডের পাট মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হতো কিন্তু পরবর্তীতে তা বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। যদিও দেশে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল। এ সমস্ত কারণে পুরাতন পদ্ধতির গ্রেডিং ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরাতন পদ্ধতিতে উভয় প্রকার (সাদা ও তোষা) পাটের কাঁচা গ্রেডের ব্যবস্থা ছিল সাতটি করে মোট চৌদ্দটি। সে স্থলে নতুন গ্রেডিং করা হয়েছে পাঁচটি করে মোট দশটি। নিম্নে নতুন গ্রেডিং প্রবর্তনের উদ্দেশ্যেসমূহ এবং প্রবর্তিত গ্রেডিং এর ব্যাপক বিশ্লেষণ দেয়া হলো ঃ

উদ্দেশ্যসমূহ

১. স্পিনারদের প্রয়োজনের কথা বাদ রেখে বিদ্যমান গ্রেডের সংখ্যা কমিয়ে যুক্তিসঙ্গত সীমায় নামিয়ে আনা।

২. গ্রেডসমূহকে সহজ করা যা উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, স্পিনার ও ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৩. যতদূর সম্ভব গ্রেডসমূহ এমন করা যাতে একটির বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যটি হতে পৃথক হয় অর্থাৎ মিলে না যায়।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চাহিদা সামনে রেখে কৃষি খাদ্যদ্রব্য বিভাগীয় কমিটির (AFDC) পাটের 'সেকশনাল কমিটির' সুপারিশ অনুযায়ী তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউশন ১৯৬৮ সালে নতুন করে পাটের পাকা গ্রেডের মান প্রণয়ন করে যা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কার্যকরী আছে তা বাস্তবায়ন।

আঁশের গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে পাটকে বিভিন্ন পাকা গ্রেডে বিভক্ত করার জন্য পাটের পাকা গ্রেডকে সংশোধিত এবং পুনর্বিন্যাস করে যে ভাবে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সাদা পাট

১. **বাংলাদেশ সাদা-স্পেশাল (BW-Special) ঃ** সাদা, ক্রিম সাদা বা [illegible] দ্যুতি। খুব শক্ত ও খুব উন্নতমানের ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন পাট যা সম্পূর্ণভাবে যে কোন দাগের ত্রুটিমুক্ত। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, সুন্দরভাবে আঁচড়ানো এবং লালচে অগ্রভাগ মুক্ত

২. **বাংলাদেশ সাদা-এ (BW-A) ঃ** সাদা হতে হালকা ক্রিম রং ভাল দ্যুতি, শক্ত এবং খুব ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ। যে কোন রকমের দাগমুক্ত ভালভাবে আঁচড়ানো এবং লালচে অগ্রভাগ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

৩. **বাংলাদেশ সাদা-বি (BW-B) ঃ** হালকা ক্রিম হতে গাঢ় রং ভাল দ্যুতি, শক্ত ও উন্নত মানের ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন পাট যা দোষমুক্ত। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, ভালভাবে আঁচড়ানো এবং লালচে অগ্রভাগ বিচ্যুত।

৪. **বাংলাদেশ সাদা-সি (BW-C) ঃ** হালকা ধূসর। হালকা লালচে হতে [illegible] পরিষ্কার পাট, বেশ শক্ত ও মাঝারি ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ যা শক্ত দাগমুক্ত এবং তীব্র ছটালো আগামুক্ত। ভালভাবে কাটা এবং আঁচড়ানো, কালো শিকড়মুক্ত তবে দাগ গ্রহণযোগ্য।

৫. **বাংলাদেশ সাদা-ডি)(BW-D)** ঃ যে কোন রং, মাঝারি শক্ত, মাঝে দাগ ও ত্রুটি গ্রহণযোগ্য। কিছু কিছু বীজ ও আঠালো আঁশ গ্রহণযোগ্য তবে পরিষ্কারভাবে কাটা এবং আঁচড়ানো। লালচে অগ্রভাগ গ্রহণযোগ্য।

৬. **বাংলাদেশ সাদা-ই (BW-E)** ঃ যে কোন রং। পঁচা আঁশ ছাড়া যে কোন ধরনের শক্ত শূলামুক্ত, তবে দাগ গ্রহণযোগ্য। অমসৃণভাবে কাটা এবং আঁচড়ানো।

তোষা পাট

১. **বাংলাদেশ তোষা-স্পেশাল (BT-Special)** ঃ একই রকম সোনালী লাল রং। সর্বোৎকৃষ্ট বুননি, খুব উন্নতমানের ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন তোষা। যা সম্পূর্ণভাবে যে কোন ধরনের ত্রুটিমুক্ত। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে আঁচড়ানো।

২. **বাংলাদেশ তোষা-এ (BT-A)** ঃ একই রকম রূপালি ধূসর হতে সোনালী রং, উৎকৃষ্ট বুননি, শক্ত এবং উন্নতমানের ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন তোষা পাট। যা সম্পূর্ণভাবে যে কোন ধরনের দোষমুক্ত, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে আঁচড়ানো।

৩. **বাংলাদেশ তোষা -বি (BT-B)**ঃ হালকা থেকে মধ্যম রকমের ধূসর তামাটে রং। বেশ পরিষ্কার, উৎকৃষ্ট বুননি এবং মাঝারি উন্নতমানের ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন তোষা পাট। যা দাগমুক্ত, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে আঁচড়ানো।

৪. **বাংলাদেশ তোষা- সি (BT-C)** ঃ মিশ্রিত রং, মাঝারি শক্ত, মাঝে মধ্যে ছাল ও নরম দাগ গ্রহণযোগ্য কিন্তু রানার্স মুক্ত তবে কিছু বীজ ও আঠালো আঁশ গ্রহণযোগ্য। কালো ডাঁশমুক্ত, মসৃণ করে কাটা ও আঁচড়ানো এবং গোড়ার কালো অংশ অক্ষত.

৫. বাংলাদেশ তোষা-ডি (BT-D)ঃ মিশ্রিত রং, মাঝারি শক্ত, মাঝে মধ্যে ছাল ও দাগ গ্রহণযোগ্য কিন্তু রানার্সমুক্ত। বীজ ও আঠালো অগ্রভাগ গ্রহণযোগ্য, অমসৃণভাবে কাটা এবং পেছানো।

৬. **বাংলাদেশ তোষা-ঈ (BT-E)** ঃ যে কোন রং। পঁচা আঁশ ব্যতীত যে কোন রকমের শক্ত তবে পঁচা এবং শূলামুক্ত পাট। দাগ এবং শক্ত গাট গ্রহণযোগ্য। অমসৃণভাবে কাটা ও পেছানো।

পাকা বেল করে বিদেশে রপ্তানির পর উৎপাদিত পাটের বাকী অংশ বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারে শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাটের পাকা শ্রেণী বিন্যাসকে পুনর্বিন্যাস এবং সংশোধন করে উপরিউক্ত পাকা গ্রেডিংয়ের প্রবর্তন করা হয়। সে সঙ্গে পাটের কাঁচা শ্রেণী বিন্যাসকেও কিছুটা সংশোধন করার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের এ মান নির্ধারণ করার সময় উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, প্রযুক্তিবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত নেয়া হয়। সে অনুসারী কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য বিভাগীয় কাউন্সিলের (AFDC) পাটের "সেকশনাল কমিটির"

সুপারিশ অনুযায়ী তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান স্টাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউশন জানুয়ারী ১৯৭০ সালে নতুন করে পাটের কাঁচা গ্রেডের মান প্রণয়ন করে। যা বাংলাদেশে এখনও কার্যকরী আছে।

এ কাঁচা শ্রেণী বিন্যাসে সাদা ও তোষা পাটের ৫টি করে মোট দশটি গ্রেড আছে। সেগুলোর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

সাদা পাট

১. **সাদা টপ ঃ** অত্যন্ত শক্ত আঁশ, বেশ ভাল লম্বা, সাদা। ক্রিমি/উজ্জ্বল পাকে সোনালী রং। শ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ, যা সর্ব প্রকারের ত্রুটিমুক্ত। ওজনে সর্বোচ্চ ২০% কাটিং হতে পারে যা পাকা গ্রেডিংয়ে বাংলাদেশ সাদা-স্পেশালের অনুরূপ হয়।

২. **সাদা মিডেল ঃ** শক্ত আঁশ, বেশ লম্বা ; সাদা/হালকা ; ক্রিম/হালকা রং ভাল ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন; দাগমুক্ত, গাটমুক্ত এবং আগা কর্কশহীন। ওজনে সর্বোচ্চ ২০% কাটিং হতে পারে। এর পাকা গ্রেডিং বাংলাদেশ সাদা-এ এর অনুরূপ হয়।

৩. **সাদা বি-বটম ঃ** উত্তম আঁশ, বেশ লম্বা। রূপালী সাদা/হালকা ক্রিম হতে গাঢ় রং ভাল ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ। গাঢ় ধূসর রং এবং নরম আগা মুক্ত। দাগমুক্ত এবং গাটমুক্ত। ওজনে সর্বোচ্চ ২৫% কাটিং হতে পারে যা পাকা বেল হয়ে বাংলাদেশ সাদা-বি এর অনুরূপ হয়।

৪. **সাদা-সি বটম ঃ** মাঝারি শক্ত, যে কোন রং, মাঝারি ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ শক্ত গাটমুক্ত এবং শক্ত আঠালো আগামুক্ত। ওজনে সর্বোচ্চ ৩৩% কাটিং হতে পারে যা পাকা বেল হয়ে বাংলাদেশ সাদা-সি এর অনুরূপ হয়।

৫. **সাদা ক্রস বটম ঃ** যে কোন ধরনের শক্ত, যে কোন রং। মাঝে মধ্যে দাগ, ত্রুটি এবং গাটসহ বীজ ও আঠালো আঁশ থাকতে পারে। ওজনে সর্বোচ্চ ৪০% কাটিং হতে পারে যা পাকা হয়ে বাংলাদেশ সাদা-ডি এর অনুরূপ হয়।

তোষা পাট

১. **তোষা টপ ঃ** অত্যন্ত শক্ত আঁশ। অনেক লম্বা। সোনালী লাল ক্রিম সব রং শ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ যা সর্ব প্রকারের ত্রুটিমুক্ত। ওজনে সর্বোচ্চ ১৫% কাটিং হতে পারে যা পাকা গ্রেডিংয়ে বাংলাদেশ তোষা স্পেশালের অনুরূপ।

২. **তোষা মিডেল ঃ** শক্ত আঁশ, বেশ লম্বা, ভাল ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ ... পাটের রূপালী ধূসর হাতে সোনালী রং এবং অন্যান্য পাটের হালকা সোনালী হতে লালচে রং। ওজনে সর্বোচ্চ ১৫% কাটিং হতে পারে যা পাকা গ্রেডিংয়ে বাংলাদেশ তোষা এ এর অনুরূপ

১. **তোষা–বি বটম ঃ** উত্তম আঁশ, বেশ লম্বা, ভাল ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন আঁশ। জাত পাটের মতই ধূসর। তামাটে ধূসর রং এবং অন্যান্য পাটের হালকা ধূসর। লালচে রং দাগমুক্ত এবং শিকড়মুক্ত ওজনে সর্বোচ্চ ২০% কাটিং হতে পারে যা পাকা হয়ে বাংলাদেশ তোষা–বি এর অনুরূপ

২. **তোষা–সি বটম ঃ** মাঝারি শক্ত, যে কোন রং। শক্ত গিটমুক্ত, গোড়া শিকড়মুক্ত। সামান্য আঠালো ও বীজমুক্ত দাগ গ্রহণযোগ্য। ওজনে ২০% কাটিং হতে পারে যা পাকা গ্রেডিং-এ বাংলাদেশ তোষা–সি এর অনুরূপ হয়।

৩. **তোষা ক্রস বটম ঃ** যে কোন ধরনের শক্ত, যে কোন রং। মাঝে মধ্যে দাগ এবং শক্ত গিটসহ বীজ ও আঠালো দাগ গ্রহণযোগ্য। ওজনে সর্বোচ্চ ২৫% কাটিং হতে পারে যা পাকা গ্রেডিং-এ বাংলাদেশ তোষা–ডি এর অনুরূপ।

পাট চাষে বিড়ম্বনা

বাংলাদেশের পাট চাষের ইতিহাস বস্তুত প্রাকৃতিক এবং মানুষের গড়া খামখেয়ালীপূর্ণ বিড়ম্বনার ইতিহাসেরই নামান্তর। সালাহউদ্দিন আহম্মেদ তার লেখা "পাট চাষের তিন দশক ১৯৫০–৭৯ ও অতঃপর" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্তিটি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। পাটের উজ্জ্বল দিক এবং বিপদসংকেতগুলো দুই-ই ভালভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। পাট উৎপাদনকারী ভাগ্যহীন ২ কোটি ৫০ লাখ কৃষক পরিবারের সদস্যবৃন্দের কল্যাণ তথা পাটের কল্যাণ, উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে জড়িত প্রধান প্রধান এজেন্সী এবং ব্যবসায়ী, ব্যবহারকারী এবং অন্য সকলে জাতীয় অর্থনীতি ও স্বার্থের আলোকে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ পালন করছেন কিনা তা চুলচেরা বিচারের সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কি ভূমিকা পালন করা হয়েছে, কি উচিৎ ছিলো ও কি করা দরকার তা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কারণ পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা–বাণিজ্যের ব্যাপারে এবং জাতীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক, তাৎক্ষণিক ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অনতিবিলম্বে সেই সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নই কৃতকার্যতার একমাত্র চাবিকাঠি। এক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, পক্ষপাতিত্ব ও অক্ষমতা অমার্জনীয়।

ডক্টর এস. ডি চৌধুরী বলেন, "দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়ীরা পাট চাষীদের শোষণ করতে থাকে। পাট বাণিজ্যে এদের কোন নিষ্ঠা নেই। রাতারাতি প্রচুর টাকা উপার্জন করাই তাঁদের লক্ষ্য। মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত পাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সকলে স্পেকুলেশনের ভিত্তিতে ব্যবসা করার ফলে পাটের বাজারে অনিশ্চয়তা বিরাজমান থাকে"। ফলে পাট চাষীদের মূল্যের উঠানামা হয় সাংঘাতিক প্রকৃতির এবং এতে কেবলমাত্র পাট ব্যবসায়ীরাই হয় অন্যায়ভাবে লাভবান। গত দুই দশকে পাট চাষীরা তাই খুব কম সময়েই তাদের উৎপাদিত

পাটের ন্যায্য মূল্য পেয়েছে। ক্ষুদ্র পাট চাষীদের প্রায় সর্বাংশই "জেটিসি" এবং "জেএমসির" পাট ক্রয়ের আওতার বাইরে থেকে যায়। যেহেতু তারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৎপরতা চালিয়ে ফড়িয়া, বেপারী এবং অন্যান্য মাধ্যম থেকে পাট সংগ্রহ করে। ফলে সরকার পাট চাষীদের জন্য পাটের সর্বনিম্ন দর বেঁধে দিলেও বিগত বছরগুলোতে পাট চাষীরা কখনও নির্ধারিত দাম পায়নি। তাদের অবস্থার উন্নতি দূরের কথা, অবনতি তাদের ভাগ্যে অভিসম্পাত হয়ে নেমে এসেছে।

অনেক বছর পর্যন্ত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পাট চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন পরিচালনার জন্য পরবর্তীতে একটি ডিরেক্টরেট খোলা হয়। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর নওয়াজেস আহম্মেদ লিখেছেন যে, বাংলাদেশের পাট চাষ এক উদ্বেগজনক অবস্থায় পড়েছে। প্রতি বছর পাটের বিশ্ব বাজারে আমাদের অংশ হ্রাস পাচ্ছে। শতকের প্রথমাংশে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারের শতকরা ৬০ ভাগ চাহিদা পূরণ করতো তা ৫০ ভাগে নেমে এসেছে। কারণ, বাংলাদেশ পাট উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটের উৎকর্ষ সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। গত ২০ বছরে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট তেমন কোন উন্নতমানের পাট উৎপাদনের পথ প্রদর্শন করতে পারেনি। অর্ধ শতাব্দী আগে সনে আবিষ্কৃত মাঝারি ধরনের ভ্যারাইটিগুলো এখনও চলছে।

"পাট চাষের দিকে বিশেষ দৃষ্টিদানের জরুরী প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে উপলব্ধি হচ্ছে। পাট শুধু প্রধান রফতানী পণ্যই নয় এবং জাতীয় শিল্পের প্রধান অংগই নয় বরং এর স্থলাভিষিক্ত হবার মত কোন সম্পদ আমাদের নাগালের মধ্যে নেই। প্রতিযোগিতামূলক দামের ভিত্তিতে পাট চাষ করা বর্তমানে অপরিহার্য। এখন উত্তম চাষোপকরণ ও ব্যবস্থাপনায় অধিক ফলনের জন্য পাট চাষ প্রয়োজন"।

পাট চাষীদের জন্যে পরিমিত ঋণ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া পাট উৎপাদনে রয়েছে অনেক সমস্যা। যেমন, উন্নতমানের বীজের অভাব, বীজ সরবরাহ ত্রুটিপূর্ণ কিংবা অপর্যাপ্ত চাষীদের মধ্যে সার বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম, কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি ঋণ যথাযথ বিতরণ ও ব্যবহার হচ্ছে না।

পাট উৎপাদনের উন্নতিকল্পে নিবিড় পাট চাষ পরিকল্পনা গৃহীত হলেও অনেক বৎসর পর্যন্ত এ ব্যাপারে তেমন কিছু করা হয়নি। বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে নির্দিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণ পাট উৎপাদনই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। মাত্র গত কয়েক বছর পূর্ব থেকে এ তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিবিড় পাট চাষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে পাট চাষীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি অপরিহার্য। পাট চাষীদের সাহায্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিয়োজিত করতে হবে। চাষের আওতায় জমির পরিমাণ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। নিবিড় পাট চাষ প্রকল্পের অধীনে ১৩ লক্ষ একর জমির পরিমাণ থেকে ১৫ লক্ষ

একরে উন্নীত করা দরকার। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে ধান ও পাট সুষম করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ অপরিহার্য। তাহলেই ভারসাম্যপূর্ণ জাতীয় অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব হবে এবং দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাট শিল্পের সাফল্য ও সমস্যাবলী

বাংলাদেশে পাট চাষে জমির পরিমাণ, একর প্রতি উৎপাদন এবং মোট উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ অনুমান সাপেক্ষে। এখন পর্যন্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও পর্যালোচনার কোন সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরশীল ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পাট সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের অব্যবস্থা ও বিভ্রান্তিমূলক ব্যবস্থার ফলে সবার অজ্ঞাতসারে লাভবান হচ্ছে দালাল, ফড়িয়া, বেপারী এবং চতুর রপ্তানিকারকগণ। পাটের কম সরবরাহজনিত বা কৃত্রিম উচ্চ মূল্যের জন্য পাট কলের কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ লাভবান হচ্ছে। শুধু ক্ষতির শিকার হচ্ছে পাট চাষীরা এবং দেশবিদেশের পাটকলসমূহ। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্বে পাট শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। কাঁচা পাটের অত্যধিক মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, শ্রমিকদের উচ্চ মজুরী, অর্থের অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহের অনেক মিল বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভারতেও অনেক বন্ধ রয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জুট মিলগুলো অনেক বাধা বিপত্তি ও দুর্বলতা থাকাসত্ত্বেও চালু রয়েছে

তালিকা – ১

পাটের উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)

বৎসর	উৎপাদন
১৯৭৭–৭৮	৯৫৭
১৯৭৮–৭৯	১১৫০
১৯৭৯–৮০	১০৬৫
১৯৮০–৮১	৮৯৭
১৯৮১–৮২	৮৪২
১৯৮২–৮৩	৮৮৬
১৯৮৩–৮৪	৯৪৬
১৯৮৪–৮৫	৯২৮
১৯৮৫–৮৬	১৫৭১

সূত্র ঃ বি. বি. এস.

তালিকা – ২

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি ও স্থানীয় বিক্রয়

	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
রপ্তানি			
হেস্যিয়ান	১.৪৫	১.৪১	[illegible]
স্যাকিং	১.২০	০.৭৯	[illegible]
সি. বি. সি	০.৬২	০.৬৫	[illegible]
অন্যান্য	০.০৩	০.০৫	[illegible]
মোট (পরিমাণ)	৩.৩০	২.৯০	[illegible]
মূল্য	৪৫৫.১৬	৪৬৮.৩৮	[illegible] ([illegible])
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	[illegible]
স্থানীয় বিক্রয়			
হেস্যিয়ান	০.০৪	০.০৬	[illegible]
স্যাকিং	০.১৮	০.১৭	[illegible]
সি. বি. সি	০.০১	০.০১	---
অন্যান্য	০.০২	০.০৩	[illegible]
মোট (পরিমাণ)	০.২৫	০.২৭	[illegible]
মূল্য	৩২.১০	৩৯.৬৮	[illegible]

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ –১৯৮৪–৮৫, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা উইং, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পৃষ্ঠা–২১ ও ৬২, ৬৩।

তালিকা – ৩

বৎসরওয়ারী পাটের আভ্যন্তরীণ ভোগ এবং তার মূল্য

সন	পরিমাণ (টন হিসাবে)						মূল্য (মিলিয়ন টাকা হিসাবে)					
	হেসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	কার্পেট	অন্যান্য	মোট	হেসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	কার্পেট	অন্যান্য	মোট
১৯৭১–৭২	১২৬৮৮	২৬৫৯০	+	+	৬২৮৭	৪৫৫৬৫	এন. এ	এন. এ	এন. এ	এন. এ	এন. এ	এন. এ
১৯৭২–৭৩	৮৩৭২	১৯২৩৮	+	+	৩৪৪৩	৩১০৫৩	"	"	"	"	"	"
১৯৭৩–৭৪	৩২৮২	২১৪৬৮	+	+	৩৮৬৬	২৮৬১৬	"	"	"	"	"	"
১৯৭৪–৭৫	৪৪৭৯	৩৩১৫৫	+	+	৭৬১৩	৪৫২৪৭	"	"	"	"	"	"
১৯৭৫–৭৬	৫১১১	২৭৪৯৩	+	+	৮১৬৯	৪০৭৭৩	"	"	"	"	"	"
১৯৭৬–৭৭	৫০৭৬	২১৯৩০	৮৯৮	+	৬৩৮২	৩৪৫৮৬	৪৩.৮	১৪৯.৭	৭.১	"	৩৭.৭	২৩৮.৩
১৯৭৭–৭৮	৬২৯২	৩০৭৫২	১০৮৬	+	৭৩০৯	৪৫৪৩৯	৭৬.২	২৪৪.০	৭.১	"	৩০.৪	৩৫৭.৭
১৯৭৮–৭৯	৫১১৪	২৯১৫২	৭১৯	+	৩৭৪৩	৩৮৭২৮	৬১.৯	২১১.৮	৫.৪	"	২৪.৬	৩০৩.৭
১৯৭৯–৮০	৬১২০	৩১৪০০	৭৬৮	+	৩০২৬	৪১৩১৪	১১০.৩	৩১৮.৪	৮.৩	"	২৫.৬	৪৬৫.৬
১৯৮০–৮১	৭২০৬	৩৩২৮৪	১২০৯	+	২১৭৭	৪৩৮৭৬	১৪৫.৩	৩৫৬.৫	১৬.৩	"	২৫.১	৫৪২.৯
১৯৮১–৮২	৭৩১৩	২৩৯২০	৭৬০	২৩০	১৬১৩	৩৩৮৩৬	১৪৪.৫	২৫৮.৯	৯.৪	১০.৭	১৪.৬	৪৪১.১
১৯৮২–৮৩	৭৫৮৬	২৫৬০৪	৯৭২	২০৪	২৬৬৭	৩৭০৩৩	১৫৩.৭	২৮৫.৫	১৩.০	১০.০	২৬.০	৪৮৮.২
১৯৮৩–৮৪	৯৪৬০	২৭৯৫৮	১৩১৮	২০২	৩০২১	৪১৯৫৯	১৯১.৫	৩৪৪.৫	১৮.০	১০.৪	৩৪.৫	৬০১.৯
১৯৮৪–৮৫	৯৬৬২	৩৫০০১	৪৪৬	১৯৮	১১৮৩	৪৬৪৯০	২৮০.৯	৬২৭.২	১০.২	১০.৯	২১.৪	৯৫০.৬

তালিকা - ৪

আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের পাটের তথা পাটজাত দ্রব্যের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তার একটা বৎসরওয়ারী বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

সন	পরিমাণ (টন হিসাবে)						মূল্য (মিলিয়ন টাকা হিসাবে)					
	হোসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	কার্পেট	অন্যান্য	মোট	হোসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	কার্পেট	অন্যান্য	মোট
১৯৭০-৭১	১৭৫৪১৪	১৪৮৪২১	+	+	৬৪২২২	৩৮৮০৫৭	৩০২.০	২০২.৫	+	+	১৩৩.৩	৬৩৭.৮
১৯৭১-৭২	৭৭৯৮০	১০২১০৮	+	+	৪৪৪৬০	২২৪৫৭৮	১৬০.৬	১৪৭.৫	+	+	১২২.৫	৪৩০.৬
১৯৭২-৭৩	১৬৫৭৬৮	১৭২৪৮৩	৬৬০৫৭	+	১৩৮৪৪	৪১৮১৬২	৪৪৩.০	৬৩৪.১	৩৩৩.০	+	৩০.০	১৪৪০.১
১৯৭৩-৭৪	১৪৭২২০	২০৯৩৬১	৫৫০৪১	+	৩৩২৭৯	৪৪৫২০১	৮৩২.৩	৫৮১.২	২৬০.১	+	৭৪.০	১৭৫২.৬
১৯৭৪-৭৫	১০৪৭৭৩	১৮৪২৬১	৪১৬০০	+	৭০১৩০	৩৯৪৭৬৪	৭৩৩.৭	৭৫৫৩	২১৫.৭	+	৮১.৩	১৭৮৫.৭
১৯৭৫-৭৬	১৬১৮০২	২০১৩৪৭	৬৩৩৯০	+	১৯৬৫৩	৪৪৬১৯২	১০৫৭.৬	১০০১.০	৫১১.০	+	৬৮.৮	২৬৩৮.৪
১৯৭৬-৭৭	১৫৪০৫৬	২১১৭০০	৭২৮৯২	+	২২১৭৮	৪৬০৪২৬	১০১৯.০	১০০৫.৬	৫৬৩.৫	+	৯৮.১	২৬৮৬.২
১৯৭৭-৭৮	১৮৭০০০	২৪৫১৮৩	৭৮১২২	+	২০৪৫২	৫৩০৭৫৭	১৪৭৫.৮	১৪৬৭.৭	৬৭৮.৫	+	১১১.২	৩৭৩৩.২
১৯৭৮-৭৯	১৭৮৬০৩	২০২৭৬১	৭৫১০০	+	৯২৮৫	৪৫৫৭৪৯	১৭৭৯.১	১৫০১.২	৮০৫.৫	+	৭৩.২	৪১৯৯.০
১৯৭৯-৮০	১৬৯৯৮২	২১০৪১৪	৬১৬৩২০	+	৫৬৭৪	৪৪৭৭০২	২৭১৩.৪	২১৯০.২	৯৯৭.৭	+	৪৮.৭	৫৯৫০.০
১৯৮০-৮১	১৮২৭৮২	২৩৮৬৭৬	৭৬২৪৪	৫৭	৩৬৭৭	৫০১৪৩৬	২৪৭৫.৯	২৩৪৪.৫	৯৮২.০	০.৭	২৮.৫	৫৮৩৫.৬
১৯৮১-৮২	১৮৮৫৮২	২৯৭৯১২	৫৪৩০৬	২২১	১৩৫৪	৫৬৭০৫৫	২২৬৪.০	২৬০৪.২	৭৩০.৮	১৯.৪	১৭.৯	৫৬৭৯.৩
১৯৮২-৮৩	২২৪৫৯৯	১৯৫৯৬১	৯০৭৫০	৬৯৭	২১০৯	৫১৪১৬	৩৩৬১.২	২১১৮.১	১৪২৯.১	৩৬.৮	৩৭.১	৭০৪৮.৩
১৯৮৩-৮৪	২১৪০৯৭	১৬২২৩৪	৯৪১৯৯	২০৬	৪৬০৩	৪৭৫০৬১	৩৭৩৮.৭	২০৫৫.৫	১৬৫৮.৯	১০.১	৮৩.২	৭৫৩৯.৪
১৯৮৪-৮৫	১৮৪৪৬১	১৭৬৯৪৫	৭২৬০০	২১৩	৪০৭৪	৪০৮২৯৩	৪৫৫৮.৩	২৯৩৩.০	১৬৯৬.৪	১২.১	৯৫.৫	৯২৯৯.৯

[জুট গুড্স স্ট্যাটিসটিক্স, পৃষ্ঠা - ৪, ভলিউম - ৫০ জানুয়ারী-মার্চ-১৯৮৫-৮৬]
বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন, আদমজীকোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

তালিকা - ৫

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৎসরওয়ারী পাট উৎপাদনের পরিমাণ (একশত টনে)

দেশ	গড় ১৯৪৬-৪৭ হতে ১৯৪৮-৪৯	গড় ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৫১-৫২	গড় ১৯৫২-৫৩ হতে ১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৯-৬০	১৯৬১-৬২	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
বাংলাদেশ	৯০৭	৯৪৮	৭২৭	১,০১৫	১,০০১	১,০০৪	১,০০৮	১,২৬৪	১,০৫৪	৯৭০	১,১৮৯	১,১৪০	১,২৭০	১,০২৮	১,২২৪
ভারত	৩৮৬	৬৭০	৬৭২	৭৫১	৭৭৮	৭২২	৮৩৫	১,১৫১	১,০৪০	৯০০	৮২৬	৯৪৮	১,১৪০	৫,৪৯	১,০১৭
চীন	১০	৪১	৪৪	৮২	৮৫	১০০	১০৯	১০০	১১৬	১৩০	১৪০	১৫০	১৬৫	১৭০	১৭৫
ব্রাজিল	৮	১৬	১৮	২৪	৩২	৩৩	৩৩	৪০	৬৩	৬৫	৬৫	৬৪	৪০	৫১	৫২
তাইওয়ান	৬	৯	১২	১৮	১৭	৯	২৪	১৪	১৬	১৬	১৫	২০	১০	১১	১৭
থাইল্যান্ড	২	২	১	৩	২	৩	৪	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০
বার্মা	—	—	১	—	১	২	৬	১২	১৫	১৪	১২	১৫	১৬	২১	২২
নেপাল	৭	৫	৫	৭	৭	৭	৭	৭	২০	১৮	৩৭	৮০	৪০	৩৩	৩৫
অন্যান্য	১	১	১	১	১	১	১১	১১	৭	৮	১০	১	৯	১২	১৫
মোট	১,৩২৭	১,৬৯১	১,৪৬১	১,৯৫১	১,৯২৪	১,৯১১	২,৩০৫	২,৬২০	২,৩৪৬	২,১৭০	২,৩১৪	২,৪০১	২,৭০০	১,৮৮২	২,৫৬৭

[এ হ্যান্ডবুক অফ বাংলাদেশ জুটঃ ডঃ এ. আলিম, পৃষ্ঠা, ১৯৮]

তালিকা – ৬

অঞ্চল ও দেশভিত্তিক পাটজাত দ্রব্যের চার বৎসরের রপ্তানি তালিকা (টন হিসাবে)

বৎসর	অস্ট্রেলিয়া	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	আমেরিকা বাদে দেশসমূহ	সোভিয়েট ইউনিয়ন	সেন্ট্রাল প্ল্যান কান্ট্রিজ	ই.ই.সি কান্ট্রিজ	ইউরোপ বাদে দেশসমূহ	নর্থ আফ্রিকা	ইস্ট আফ্রিকা	ওয়েস্ট আফ্রিকা	মিডল ইস্ট	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	পাকিস্তান	বাকী বিশ্ব	মোট
১৯৮১-৮২	৩৩২০১	৭২৪৯৮	১১১২২	১৮৪৭৯	৭৩০৭	৪১০৮৯	১৪০৯	২৮৩৮৯	১০৭৪১৯	২৮৩৭৮	১১৫২৭২	২৫১৬৬	৩৯০৮৪	১১৬৫২	৫০৭৩৫৫
১৯৮২-৮৩	২৩৫৬৬	১০০৯৭৭	১১২৫৫	৩৫৩১৯	১৩৫২৯	৪৭৬৩৩	২২০৫	৬৪৪৪৩	৩৩৮৮২	১৩২৬১	১২৫২৬৩	১২৫২৬০	২৫২৫২	১৩৩৩৩	৪১৪১১৮
১৯৮৩-৮৪	৩৩১০৬	৯৪২৬৭	১১৬৫৭	৩৭৫	৪৯২১	৭২১৫৮	৪৪০২	৪১৭৫৯	২৩৪০৯	৯৪৫৮	১৪০৭৮৮	১৪০৭৮৮	২৫৫৪	১৭৫৬৭	৪৭৫৩৬৯
১৯৮৪-৮৫	১৭৯৩১	৬৭৪৫৮	১০১২৫	৩১৮৩৯	৩২৪১	৮৬৭৯০	২০৪৫	২৩০১৮	৩১২৯১	১৭৭৩৭	১০৫৭১২	১০৫৭১২	৬৯৮২	২৫১৭২	৪০৮৭৯৩

[জুট গুডস স্ট্যাটিসটিক্স, পৃষ্ঠা, ১৪]

বর্তমান ব্যবস্থাপনায় পূর্বেকার তিনটি কর্পোরেশন যথাঃ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন (জে. টি. সি), জুট প্রাইস স্টেবিলাইজেসান কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের (বি. জে. সি) বিলোপ সাধন করে তাদের কার্যাবলী কেবলমাত্র বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে যেখানে উন্নতজাতের বীজের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে পাট মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বি. জে. আর. আই), সেখানে সেই বীজের ব্যবহার ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অন্য একটি মন্ত্রণালয় তথা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি ডিরেক্টরেটের উপর। পাটের ঘরে যা কিছু ঘটছে যেমন পাট উৎপাদন, বাণিজ্য ও রপ্তানি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং পাট চাষীরা বারংবার ন্যায় সঙ্গত মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে, এ সবের জন্য একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে বেঁচে যাওয়ার অবকাশ পাচ্ছে। যার ফলে নিজ নিজ দায়িত্বের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পরিবর্তে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। এমন কর্তৃতার আশু পরিবর্তন সাধন করা প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন দেশের বৃহত্তম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যার অধীনে রয়েছে ৩২টি জুট মিল, ২টি কার্পেট ফ্যাক্টরী এবং ২টি যন্ত্রাংশ প্রস্তুত কারখানা। ক্রেতা দেশসমূহের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তন করে তাদের পছন্দসই দ্রব্যাদি উৎপাদন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার প্রধান উপায়। উৎপাদন ক্ষেত্রে অপচয় রোধ, দক্ষতার মান উন্নীত করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের মান সুপ্রতিষ্ঠিত করা, রপ্তানি বাজার সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারিত করা, শ্রমিক সহযোগিতা, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরিচালনা ব্যবস্থাপনা আরও সংহত, দক্ষ ও গতিশীল করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। শিল্পে কৃতকার্যতা অর্জনের গোড়ার কথা হলো, 'যন্ত্রের চেয়ে মানুষটি বেশি মূল্যবান'। তাই শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বার বার নানা রকম প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

পাট বাণিজ্য, পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং রপ্তানির উন্নতি কিংবা অবনতির তাৎপর্য নিছক নয়। কেবল এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে পাট চাষী পরিবারবর্গ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীবৃন্দ, শ্রমিক মজুর, অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, পরিবহণ এবং গোটা দেশের মানুষ। তাই প্রত্যেক নাগরিকের বিবেচনায় পাটই হচ্ছে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা অবনতির প্রকৃত পরিমাপ। অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই তোতা পাখির বুলির মত বলে থাকেন যে, পাট হচ্ছে "স্বর্ণ সূত্র" দেশের প্রধানতম ও বেশিরভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বস্তু। স্বাধীনতার ১৫টি বছর পর আজ আর পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি, বাহবা দাবি বা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করে বৃথা সময় নষ্ট করলে চলবে না। সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ মোকাবিলার প্রস্তুতি পন্থা নির্ধারণই হতে হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

পাট শিল্পের বিপণন গবেষণা ও বাণিজ্যের উন্নয়ন

পাট শিল্পের বিপণন গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কেননা বিকল্প দ্রব্যাদির মোকাবিলা এবং বন্ধ্যা বাজারের উজ্জীবনের জন্য সক্রিয় বিক্রয় সম্প্রসারণ অভিযান অত্যাবশ্যক। গবেষণা ক্ষেত্রের মতই পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন সুষ্ঠু চেষ্টা বাংলাদেশে করা হয়নি। পাটজাত দ্রব্যের সফল বাজারজাতকরণের জন্য পাটের সুবিধাগুলোকে কার্যকর বিজ্ঞাপন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যবহারকারী দেশসমূহের কাছে তুলে ধরা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কৃত্রিম বিকল্পের চেয়ে পাটের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বহুমুখী, এর স্থায়িত্ব বেশি। পাটজাত দ্রব্য পুনঃপুন ব্যবহার করা চলে। পরিবেশকে কলুষিত করে না এবং এতে ধুলাবালি ময়লা মিশে যায়, কৃত্রিম দ্রব্যাদির এসব গুণ নাই।

বিকল্প দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মুখে পাট শিল্প মন্দাভাবের সম্মুখীন। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্য ৫০ দশকে সমগ্র বিশ্বে পাটের ব্যবহার ছিল ২০.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। মধ্য ৬০ দশকে তা বেড়ে ৩০.৪০ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌছায়। কিন্তু এর পরই মধ্য ৭০ দশকে কিছু হ্রাস পেয়ে ৩০.২০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। বস্তুত শিল্পোন্নত দেশসমূহে এই হ্রাসের পরিমাণ দেখা যায়। বাংলাদেশ পাট উৎপাদনকারী দেশ এবং বিশেষ করে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিজাত উপার্জনের উপর খুবই নির্ভরশীল বিধায় এই পরিস্থিতি অবশ্যই অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারী দেশগুলো যদি পাট ও বিকল্পের সহ অবস্থানের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে আগামী বছরগুলোতে কৃত্রিম দ্রব্যাদির কাছে পাটজাত দ্রব্যাদি আরো বেশি বাজার হারাতে পারে। পাট বিরোধী আগ্রাসী প্রচারণা এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক পাটজাত দ্রব্য আমদানির উপর শুল্ক – বহির্ভূত বিধি-নিষেধ আরোপের ফলেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটজাত দ্রব্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত হচ্ছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী দুটি বৃহৎ দেশ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের রয়েছে আর্থিক সীমাবদ্ধতা। এজন্যে সুচারুরূপে গবেষণা উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণের কার্যকর প্রচেষ্টা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইউ. এন. সি. টি. এ. ডি (আংট্যাড)-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে পাট উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশসমূহের সম্পদের সমাবেশ করা দরকার।

পাটজাত দ্রব্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক হওয়া সত্ত্বেও বিকল্প দ্রব্যাদি বাজার বেশি পাচ্ছে অতীতে পাটজাতদ্রব্যের বাজার হারানোর মূলে রয়েছে সরবরাহের অনিশ্চয়তা, মূল্য নয়। আংট্যাড এর সুপারিশক্রমে পাটজাতদ্রব্য ব্যবহারকারী দেশগুলোর স্থান বিশেষ বাফার স্টক বা জরুরী মজুদ গড়ে তুলতে পারলে সরবরাহে বিশৃঙ্খলতা এড়ানো যাবে এবং স্বল্পকালীন নোটিশে ব্যবহারকারীদের কাছে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত হবে। আর্থিক দায়িত্ব গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যবহারকারী দেশসমূহ যদি আন্তর্জাতিক স্টক গড়ে তোলার ব্যাপারে

তালিকা – ৭

বিশ্ব পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ

১৯৭২-৭৪	৭৪-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩
৫২.৫৩%	৪১.০৪%	৩৫.৭৫%	৩৭.০০%	৪২.১৩%	৪২.৫৮%

সূত্র : এনুয়াল রিপোর্ট ১৯৮২-৮৩, বি. জে. এম. সি. পৃষ্ঠা–২২

বাংলাদেশের পাট শিল্প হচ্ছে রপ্তানিমুখী শিল্প। আমাদের উৎপাদিত পাট শিল্পের ৯০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৭টি পাট কল আছে, যার মধ্যে ৩২টি বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে চলছে এবং বাকিগুলো বেসরকারী খাতে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী খাত হতে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া মিলগুলোর অবস্থার কোন পরিবর্তন এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। বিগত দিনের পাট বাণিজ্যে তাদের কার্যকলাপ আশানুরূপ হচ্ছে না বরং অতীতের দেনা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের প্রচুর ঋণ অপরিশোধিত রয়েছে যার ফলে বিরাট অংকের অর্থ পুনঃলগ্নীকরণ সম্ভব হচ্ছে না। পাট শিল্পে আরও অর্থ যোগান দেয়া একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতীয় জুট মিলগুলোর তুলনায় আমাদের প্রায় সবগুলো মিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু খুচরা যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি ও স্টোর উপকরণের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে, যেখানে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের বেশ কয়েকটি মিলে যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা ও দুরবস্থার জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্ষতি হচ্ছে, ফলে কাজের দক্ষতা কমে যাচ্ছে। আমাদের কিছুসংখ্যক মিলের ব্যালেন্সিং মর্ডানাইজেশন এবং রিপ্লেসমেন্ট (বি. এম. আর) অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে কিন্তু বি এম আর করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বিশ্বব্যাংক এবং জুট মিল মেশিনারী তৈরির স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছুসংখ্যক দাতা দেশ পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসাড় যুক্তির অবতারণা করছে। প্রলিপ্রপেলিন (পিপি) নামক কৃত্রিম বিকল্প দ্রব্যের আবির্ভাবের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার আশংকা ও তাদের মনে কাজ করছে। ঋণ প্রদান করলে তা সঠিক ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হতে হবে।

বি. এম. আর হচ্ছে একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কয়েকটি মিলের বি. এম. আর সম্পন্ন করার পর হয়তো দেখা যাবে আরো কয়েকটি মিলের বি. এম. আর দরকার হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে কয়েকটি মিল বন্ধ করে দেয়ার আশঙ্কাকে আমরা অমূলক আশঙ্কা বলে মনে করি। আমাদের পাট শিল্পের শ্রমিকগণ গ্রামভিত্তিক ও অনভিজ্ঞ। ঘন ঘন তারা কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে যায় এবং দুই ঈদের সময় তারা বেশ কিছু কাল কাজ করে না। বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (বি. এম. ডি. সি) ১৯৭৪–৭৫ সনে শ্রমিক অনুপস্থিতি সম্পর্কে জরিপে (জার্নাল, অক্টোবর–ডিসেম্বর ৭৫ সংখ্যা) বলা হয়েছে, "মিলে বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই এমন

তাঁতীদের অনুপস্থিতির হার ২০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ। ফসল বোনা এবং কাটার মওসুমে এদের অনুপস্থিতির হার ৩৫ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়।" শিল্পে শ্রমিকদের গড় হাজিরা বা অনুপস্থিতির সংখ্যা আমাদের পাট শিল্পের বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি বিদ্যুৎ বিভ্রাট কিংবা লোড শেডিং এর সমস্যা পাট শিল্পের নিত্য সাথী হয়েছে যার দরুন কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। উপরন্তু শ্রমিক অসন্তোষ, পাট শিল্পের অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, পাট বাণিজ্যে অসদুপায় অবলম্বন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু পাট নীতির অভাবে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। উপরিউক্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের জন্য পাট এবং পাট শিল্পের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। "আমাদের দ্বিধা বিভক্ত পাটের ঘর" এর একত্রীকরণের মাধ্যমেই আমরা সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান আনতে সক্ষম হব বলে আশা করা হয়।

নিম্নে একটা পুনর্গঠিত প্রশাসনিক কার্যালয়ের ছক দেওয়া হলো

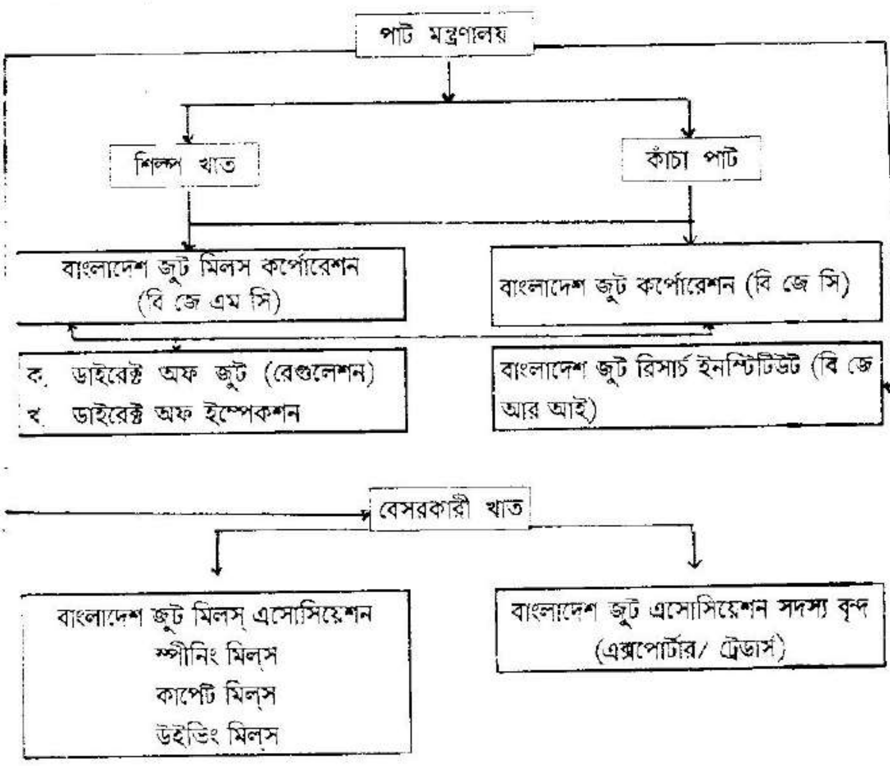

চিত্রঃ পাট প্রশাসন

বিঘ্নিত হয় তবে হাভানা, কায়রো, রটারডেম প্রভৃতি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে আমাদের নিজ উদ্যোগে সাধারণভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির স্টক গড়ে তুলতে হবে স্বল্পকালীন নোটিশে অব্যাহতভাবে পাটজাতদ্রব্য সরবরাহে আমরা ব্যর্থ হলে কৃত্রিম বিকল্প দ্রব্যাদি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্রমান্বয়ে পাটজাতদ্রব্যের বাজার হাত করতে থাকবে।

সুপরিকল্পিতভাবে বাজার উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট তহবিল প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যকারী সংস্থাসমূহের কাছে আবেদন জানাতে হবে। পাট ও পাটজাত দ্রব্যকে আরো প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার এবং বর্তমান বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গবেষণা উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার বিষয় আংট্যাড এর পণ্যসমূহের সমন্বিত পরিকল্পনা (ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর কমোডিটিস) সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈঠকেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিল্পোন্নত দেশ হতে পাওয়া আর্থিক সাহায্য পাটের কল্যাণের জন্য আমাদের যথাযথ কাজে লাগানো দরকার। ব্রাসেলসে ও মেলবোর্নের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, বিজেএমসি, এর বৈদেশিক দপ্তর খোলা হয়েছে এবং নিউইয়র্ক ও কায়রোতে অতি সত্বর অফিস খোলা দরকার। পাটজাত দ্রব্যের বাজারসমূহের ব্যাপক জরিপ, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারী দেশ সম্পর্কে নথি তৈরির জন্য একটি বাজার সম্প্রসারণ গবেষণা সেল সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পাট বিপণনের সমস্যাবলী

বাংলাদেশে পাট বিপণনে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিম্নে সমস্যাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১ **কৃষকদের অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা।** আমাদের দেশের অধিকাংশ পাট চাষী খুবই দরিদ্র তারা পাট মৌসুমে দারিদ্র্যের টানা পোড়েনে কম মূল্যেই পাট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় পাট থেকে উপার্জিত টাকায় তাদেরকে খাদ্য দ্রব্য, কাপড় ও অন্যান্য পারিবারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী খরিদ করতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এসব কারণে তারা অধিক দিন যাবত পাট সংরক্ষণ করে রাখতে পারে না। ফলে কম মূল্যে পাট বিক্রি করে দিতে হয়। এর ফলে তারা ন্যায্য দাম পায় না।

২ **মধ্যস্থকারবারীর অসাধু তৎপরতা।** পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত বেপারী, ফড়িয়া, আড়তদার, দালাল প্রমুখ মধ্যস্থকারবারীরা বিভিন্ন উপায়ে পাট চাষীদের পাট ক্রয়কালে প্রতারণা করে থাকে। পাট ব্যবসায়ীরা যে সব অসাধু পন্থা অবলম্বন করে উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(ক) **ত্রুটিপূর্ণ ওজন।** বিভিন্ন অঞ্চলে ওজন ও মাপে তারতম্য করা হয়। যদিও এখন দেশে মেট্রিক প্রথা চালু হয়েছে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা নিজেদের খেয়াল খুশিমত পুরাতন মাপগুলোই অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে।

(খ) **বিভিন্ন প্রকার চার্জ ধার্য।** ফড়িয়া, আড়তদার, পাইকার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী পাট ব্যবসায়ীরা অন্যায়ভাবে পাটচাষীদের নিকট থেকে পাট কেনার সময় বিভিন্ন প্রকার চার্জ যেমন, তেলা, কাইয়ালী, কাবরী, হালি ইত্যাদি ধার্য ও আদায় করে থাকে।

(গ) **মিশ্রণ ও ভেজাল।** মধ্যস্থকারবারীরা নিজেদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করার জন্যে নিম্নমানের পাট উঁচু মানের পাটের সাথে মিশ্রিত করে বণ্টন প্রণালীতে চালু করে থাকে এতে বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

(ঘ) **পানি মিশ্রণ।** অসাধু ব্যবসায়ীরা পাটের ওজন বাড়ানোর জন্যে পানি মিশ্রণ করে থাকে।

(ঙ) **কাছার।** অনেক প্রাথমিক বাজারে বেপারী ও ফড়িয়ারা পাট কেনার সময় প্রতি সের পাট থেকে তাদের কাছার হিসেবে বাদ দিয়ে থাকে। এ ধরনের অবৈধ কর্তিত পাট চাষীদের প্রবঞ্চনারই নামান্তর।

৩. **অপ্রতুল পরিবহণ সুবিধা।** উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা দক্ষ বিপণনের পূর্বশর্ত আমাদের গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাটে প্রায়ই গাড়ী চলাচলের অনুপযোগী। কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ী দিয়ে কিংবা চাষীরা মাথায় কাঁধে করে নিজেদের উৎপাদিত পাট বাজারে বিক্রীর জন্য নিয়ে যায়। পরিবহণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা উৎপাদন মূল ও স্থানীয় বাজারের মধ্যে পাট চলাচলে অস্বস্থিকর অসুবিধার সৃষ্টি করে। বিপণনেও এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে।

৪. **যৌথ দরকষাকষির অভাব।** পাট উৎপাদকদের সংগঠিত কোন সমিতি নেই বলে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাটের ন্যায্য মূল্য আদায়ের জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে দরকষাকষি করতে পারে না।

৫. **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।** পাটের বাজারজাতকরণে অনেক মধ্যস্বত্বভোগীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদের দৌরাত্ম্য শুধু পাট চাষীদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, পাটের বিপণনেও অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ পাট বিপণনে প্রায় সাত প্রকারের বিভিন্ন মধ্যস্তকারবারী নিয়োজিত রয়েছে। তারা সবাই ক্রীত পাটের সাথে মুনাফার অংশ যোগ করে পুনরায় বিক্রী করে। এতে বিপণন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৬. **প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণের ত্রুটি।** রপ্তানি বাণিজ্যে ভাল বাজার পেতে হলে উন্নত মানের প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকরা পাটের

...করে না। তারা খোলা পাট বাজারে বিক্রী করে দেয়। চূড়ান্ত গাঁইট দক্ষ পাটের ...করে থাকে। কিন্তু তারা গ্রেডিং এর জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তাও বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভাল গ্রেডিং-এর অভাবে বাংলাদেশী পাটের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

৭. **কৃষকদের সিদ্ধান্ত বিষয়ক সমস্যা।** আমাদের দেশের কৃষকগণ পাট চাষ করবে না ধান চাষ করবে এরূপ সিদ্ধান্তমূলক সমস্যা সর্বদাই মোকাবেলা করে থাকে। বিশেষ করে বর্তমানে পাটের মূল্যের চেয়ে ধান চাউলের আপেক্ষিক মূল্য অধিক হওয়ায় এবং বছর বছর পাটের মূল্যের অপ্রত্যাশিত উত্থান-পতনের ফলে চাষীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দো-মনভাবের উদ্ভব হয়। চাষীদের সঠিক পথের নির্দেশ দেবার মত কোন সরকারী এজেন্সী বা সংগঠন নাই।

পাটের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি (১৯৮৭)

আমাদের পাট বিক্রি মৌসুম প্রতি বছরের মত এবারও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় থেকে শুরু হয়েছে। বেশি পরিমাণ পাট বাজারে বিক্রির জন্য চাষীরা আনতে শুরু করেছে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। বাংলাদেশের সর্বত্র এ সময়ে পাট বিক্রির জন্য বাজারে এসে গেলেও সরকার কর্তৃক পাট নীতি ঘোষিত হয়নি। অনেক পাট ক্রয়কেন্দ্র তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান ক্রয় কেন্দ্রগুলো পাট কিনছে না। ফলে সর্বত্র পাট কেনা-বেচার বাজারগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং ক্রেতার অভাবে পাটের বাজার মন্দা হয়ে গেছে। বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে পাট বাজারে ফড়িয়া ব্যাপারীগণ এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে ৫০ থেকে ৮০ টাকায় কিছু কিছু পাট ক্রয় করে গুদামজাত করছে।

"পাট, পাট চাষী ও পাটনীতি" বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাট বাংলাদেশ অর্থনীতির জীবন শোণিত এবং আজ পর্যন্ত পাটই এ দেশের স্থায়ী, নির্ভরশীল ও সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের উৎস। কিন্তু আজঅবধি পাট উৎপাদন ও পাট চাষী কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে পাট বিক্রি বিগত তিন-চার দশকের মতই সমস্যাহীন চলছে। অনেকের মতে সুষ্ঠু পাটনীতির অভাব এবং সরকারের অপরিকল্পিত পাট ব্যবস্থাপনাই এ ব্যর্থতার কারণ। মজার ব্যাপার এই যে, প্রতিটি পাট চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার লগ্নে সরকারী-বেসরকারী সকল মহল থেকে ঢোল-সহরৎ যোগে বেশি জমিতে পাটের আবাদ এবং বেশি বেশি পাট উৎপাদনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করার ধুম লেগে যায়। কিন্তু চাষীরা যখন বাজারে পাট আনতে আরম্ভ করেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে এক বাক্যে, এক তালে চারদিকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠতে থাকে কম পরিমাণ জমিতে আবাদ, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি অজুহাতের সুর। এ ধরনের পরিস্থিতির ফলে সামগ্রিকভাবে পাট সেক্টরে স্পেকুলেশন ও মজুতদারীর সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট মহল বাংলাদেশের পাট শিল্পের এ দুরবস্থাকে ব্যবহার করে

ব্যক্তিস্বার্থে এবং পরিণতিতে কেবল বাংলাদেশের অর্থনীতিই নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের পাট শিল্পের ভাগ্য হয়ে ওঠে অনিশ্চিত।

সব মহলই এবার আশা করেছিল যে, বাজারে নতুন পাট বিক্রির জন্য আসার শুরুতেই অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পাটের বাজারে হতাশার ভাব যেন দেখা না দেয় সেজন্য আগে থেকেই সুষ্ঠু পাটনীতির মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এবারও পাট চাষীদের জন্য একই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সোনালী আঁশ পাট এবারও পাট কৃষকদের গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে ক্রেতা না থাকায় এবং আমন ধান না ওঠা পর্যন্ত বেঁচে থাকার তাগিদে আমাদের নিরুপায় কৃষকেরা দালাল ও ফড়িয়াদের কাছে তাদের দেওয়া দামেই, ৫০–৭০ টাকায় প্রতি মণ পাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু সরকারী পাটনীতির দেখা নেই।

পাট বাজার ও পাট চাষীর দুরবস্থার খবর প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, সাতক্ষিরা, লক্ষ্মিপুর, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল এবং অন্যান্য স্থান থেকে পাটের বাজারের এই মন্দাভাব ও পাট নিয়ে কৃষকদের দুর্গতির কথা ছাপা হয়েছে। এ খবরগুলো সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ভাবনাচিন্তার কারণ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে গত বছরের পাটই কৃষকদের ঘরে পড়ে আছে। কুড়িগ্রামে গতবারের প্রায় ৫ লাখ মণ পাট অবিক্রিত অবস্থায় এখনও কৃষকদের ঘরে। সরকারী মিল কর্পোরেশনগুলোর গুদামে ও গত বছরের প্রচুর পাট মজুত পড়ে আছে। তারা এখনও নতুন মৌসুমের পাট কেনা শুরু করেনি। হয়তো অপেক্ষা করছে সরকারী নীতি ঘোষণার। বেসরকারী মিল মালিক, ফড়িয়া বেপারীদের গুদামেও গত বছরের প্রচুর পাট আটকা পড়ে আছে। সরকারী হিসেবে পাটের উৎপাদন ব্যয় ২২৫ টাকার মত, সেখানে ৬০–৮০ টাকা দরে কৃষকরা পাট বিক্রি করে দিচ্ছে। স্বাধীনতার ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর আজও সরকার পাট উৎপাদন, পাট বাণিজ্য এবং কাঁচা পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি বিষয়ে একটি "পাঁচশালা পাটনীতি পরিকল্পনা" প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। এটা আমাদের বিশেষ করে পাট চাষীদের দুর্ভাগ্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া কখনই শুভ হতে পারে না।

এ অবস্থার অবসানকল্পে সুষ্ঠু পাটনীতি ও পাটের বাজারের স্থিতিশীল উচ্চ মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা এবং চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা মনে রেখে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। এক বছর পাটের মূল্য বেশি হলে পরের বছর যে উৎপাদনের ঢল নামে তা লক্ষ্য রেখে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। উন্নতমানের পাট উৎপাদন, পাটের বহুমুখী ব্যবহার, কাঁচাপাট রপ্তানি ও পাটজাত দ্রব্যাদির বিশ্ববাজার এবং পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্যে পাট বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে

দেশের বর্তমান পাট সমস্যা মূলত এর উৎপাদন ও মূল্যের সমস্যা। আমরা মনে করি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা নিরূপণ করে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন নয়। কাম্য পরিমাণ পাট উৎপাদনের জন্য পাটের একটা স্থিতিশীল মূল্যও নির্ধারণ করা উচিত। পাটের উৎপাদন ব্যয় ও অন্যান্য বিকল্প ফসলের সাথে এর মূল্যের সামঞ্জস্য রাখতে হবে। দুঃখের বিষয়, পাটের উৎপাদন ও মূল্যের স্থিতিশীলতা বিধানের জন্য কোন পরিকল্পিত পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। ফলে কোন বছরে পাটের দর চড়ে যাচ্ছে 'পাঁচ'শ টাকায়, আবার পরের বছরই নেমে আসছে দেড়'শ দুই'শ টাকায়। এক বছর উৎপাদন ৮০ লাখ বেল পরের বছর তা নেমে আসছে চল্লিশ/পঞ্চাশ লাখ বেলে। এর কোনটাই ভালোর লক্ষণ নয়। দাম ও উৎপাদনে গত দু'তিন বছর ধরে যে চরম অস্থিতিশীলতা চলছে তা রোধ করতে না পারলে বাংলাদেশ পাটের বিশ্ব বাজার হারাতে থাকবে। এর ফলে একদিন পাট চাষ সত্যি সত্যি নীল চাষে পরিণত হতে পারে। সেটি কাম্য না হলে সরকারকে সকলের সাথে আলোচনা করে সুসমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাটের বিধিবদ্ধ ন্যূনতম দর বেঁধে দিয়ে কৃষকদের কোন লাভ হয় না—এ যুক্তিতে কয়েক বছর আগে এ ব্যবস্থাটি তুলে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল এ ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। তার চেয়ে খোলা বাজারি ব্যবস্থাতেই কৃষক ভাল দর পাবে, মিল কর্পোরেশনগুলোকেও অনর্থক দুর্নীতির কড়ি গুনতে হবে না। যুক্তি হিসাবে অকাট্য, কিন্তু তাতে করে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হয়েছিল কি? হয়েই যদি থাকবে তাহলে গত বছর আবার বিধিবদ্ধ ন্যূনতম দর পুনঃপ্রবর্তন করতে হলো কেন? এবারই কি পরিস্থিতির এমন কিছু উন্নতি হয়েছে যাতে বলা যায় ন্যূনতম দর বেঁধে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার জন্য বিধিবদ্ধ ন্যূনতম দরটা উৎপাদন পর্যায়ে পুরোপুরি পৌছানো যায় না এটা ঠিক আছে। সরকারী মিল কর্পোরেশনের ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা মন্দার বাজারে চাষীদের বঞ্চিত করে কোটি কোটি টাকা হস্তগত করে এটাও ঠিক। তেমনি বেসরকারী খাতের ব্যবসায়ী, মিল মালিকরাও কম দামে পাট কিনে বিধিবদ্ধ দরের সুযোগে বেশি দাম দেখিয়ে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তথাপি অভিজ্ঞতা বলে যে, ন্যূনতম দরটা বেঁধে দেয়া থাকলে বাজারের দর অন্তত তার কাছাকাছি পৌঁছায়। অন্যথায় অধিক উৎপাদনের বছরে কৃষকের দর কষাকষির কোন ভিত্তি বা অবলম্বনই থাকে না। এ কারণেই ন্যূনতম দর নির্ধারণের উপর জোর দেয়া হয়ে থাকে। পাট ও পাটচাষীকে বাঁচাতে তাই অবিলম্বে বিধিবদ্ধ ন্যূনতম দরসহ পাটনীতি ঘোষণা করা দরকার। এ ব্যাপারে কালক্ষেপণের অর্থ হবে বাংলাদেশের গরীব পাটচাষীদের চরম সর্বনাশ।

পাটের সমস্যাটা অবশ্য খুবই জটিল সন্দেহ নেই। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার অনেকখানি নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক চাহিদা ও দরের উপর যেখানে আমাদের কোন হাত নেই। বিগত মৌসুমে পাটের উৎপাদন বেশি হওয়ায় বিপুল পরিমাণ, ৩০/৪০ লাখ বেল, পাট উদ্বৃত্ত রয়ে

গেছে। এবারও পাটের উৎপাদন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ বেলের চেয়ে বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কাজেই শুধু ন্যূনতম দর ঘোষণা করে দিলেই সমস্যার সুরাহ হবে না। কৃষকের কাছ থেকে উৎপন্ন সমুদয় পাটটা ন্যায্য দরে কিনে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এটাই আশু মুখ্য করণীয়। সরকারী ও বেসরকারী পাটগুলোকে নয়া মৌসুমের পাট কেনার পরিমাণ ও সময়সূচী নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং সে ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরির ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্বৃত্ত পাটের গতি না হওয়া পর্যন্ত বাফার স্টক বা এ ধরনেরই অন্য কোন ব্যবস্থা মারফত মজুত করে রাখতে হবে।

এগুলো অবশ্যই স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি পাট সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে একটা সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণের কাজও আর ফেলে রাখা যায় না। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং সম্ভাব্য দরের ভিত্তিতে উৎপাদন, বিপণন, মূল্য স্থিতিশীলতা বিধান প্রভৃতির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক, পরিকল্পিত উদ্যোগ। উৎপাদন পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ততা বা বিপণন পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত খোলা বাজারী নীতি অনুসরণের কোন অবকাশ নেই, কেননা পাট শুধু কৃষকেরই বাঁচা-মরার সমস্যা নয় জাতীয় অর্থনীতিরও জীয়নকাঠি, মরণকাঠি।

পাট বিপণনে সমস্যা সমূহ সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের পাট বিপণন সমস্যাবলী দূর করার জন্য নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

১. সরকার কৃষি ব্যাংক বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে পাট চাষীদের ঋণ প্রদান করতে পারে, যাতে চাষীরা পাট তোলার মৌসুমে অভাবের তাড়নায় কমমূল্যে পাট বিক্রি না করে তা সংরক্ষণ করতে পারে এবং মৌসুম শেষে ন্যায্য মুল্যে তা বিক্রি করতে পারে

২. স্টাণ্ডার্ড ওজন ও পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। সনাতনী, সের, মণ জাতীয় ওজন প্রথা তুলে দিয়ে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা অত্যন্ত জরুরী আশার কথা যে, সরকার ইতিমধ্যেই সমগ্র দেশে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন চালু করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন।

৩. প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের জালিয়াতি ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য অন্ততপক্ষে প্রতি থানার পাট কেনার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পাট চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাবে এবং তারাও পাট উৎপাদনে উৎসাহী হবে। অবশ্য আমলাতন্ত্রের খপ্পরে পড়ে সরকারী ক্রয় কেন্দ্র যাতে দুর্নীতির বিষাক্ত রাহু প্রবেশ না করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

পাট বিপণনে দক্ষতা অর্জন করতে হলে পল্লী এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে কিংবা বিদ্যমান রাস্তাঘাটের সংস্কারসাধন করে সেগুলোর যথাযোগ্য উন্নয়ন সাধন করতে হবে সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তম পরিবহণ ব্যবস্থা উত্তম বিপণনের অন্যতম পূর্বশর্ত। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী হলে সহজে এবং কম খরচে উৎপাদন স্থল থেকে স্থানীয় বাজার কিংবা পাট কলে পাট আনা নেওয়া সম্ভব হবে।

পাট ব্যবসায়ে অদক্ষতা অপসারণ করতে হলে উন্নয়নমূলক কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্যাংকের মত সরকারী সংস্থা গড়ে তাদের উপর বিষ ফোড়ার মত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বাহুল্যতার সৃষ্টি করতে হবে। যেমনটি হয়েছিল স্বাধীনতার পর কয়েকটি বছর ধরে। বর্তমানে পাট শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে কয়টি সংস্থা কাজ করছে যেমন, বাংলাদেশ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

পাটের বিপণনের উন্নয়ন সাধনের জন্য গবেষণা

পাটের বিপণনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাজার গবেষণা চালানো যেতে পারে ;

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাট শিল্পের প্রয়োজন নির্ধারণ করার জন্য গবেষণা চালানো যায়, এ ধরনের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করে তদনুযায়ী পাটের উৎপাদন ও বিপণনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভবপর। তবে এজাতীয় গবেষণা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিনামে এর থেকে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে।

পাটের উৎপাদন ও বন্টনে সহায়তা করার জন্য পণ্যের সম্ভাব্য বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। পাটের গ্রাহক, বিক্রয় অঞ্চল, কেনা কাটার সময় ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সর্বদাই বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

পাটের বিকল্প সিনথেটিক এখন বিশ্ব বাজারে ছেয়ে গেছে। ফলে পাটের চাহিদা ভবিষ্যতে বিপুলভাবে হ্রাস পেতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত গবেষণা চালিয়ে কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করা আবশ্যক।

তাছাড়া বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশে মিশনের কমার্শিয়াল এটাচীদের মাধ্যমে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের সংগঠন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক

কার্যাবলী হাতে নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ বিদেশের মাটিতে পাট বিপণনের উপর শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়।

পাটের উৎপাদনের পরিমাণ এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

বাংলাদেশ বরাবরই পাট উৎপাদনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। ১৯৮৩–৮৪ সালে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার মেট্রিকটন পাট উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৮৪–৮৫ সালে ৪৯ লক্ষ ৩৯ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৮৫–৮৬ সালে সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে ৭৬.০১ বেল পাট উৎপন্ন হয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশের সঠিক উন্নয়ন সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা গঠিত হয়েছে। তাই, ঢাকা, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সাধারণ গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পাটের কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন। তাছাড়া পাটের সার্বিক কাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের জন্য দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, নিম্নে এর লক্ষ্যমাত্রা এবং সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করা হলো ঃ

ক ১৯৭৯–৮০ সালে ৫.৯২ লক্ষ টন হতে উৎপাদন বাড়িয়ে ৮৪–৮৫ সালে ৭.৩৬ লক্ষ টন উন্নতিকরণ। আর এইভাবে বার্ষিক গড়ে শতকরা ৬.৭৬ ভাগ উন্নয়ন হার অর্জন

খ পরিকল্পনা কালে পাট দ্রব্যের রপ্তানি ৭৮–৭৯ সালের ৪.৫৮ লক্ষ টন হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪–৮৫ সালে ৬.১০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে এবং এভাবে গড়ে বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ উন্নয়ন হার অর্জিত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

দশকের অভিজ্ঞতা এবং চাহিদা ও গন্তব্যের অনুগিত নীতি অনুযায়ী পরিবর্তনসমূহের ভিত্তিতে পাটজাত দ্রব্যের অনুমিত চাহিদার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

তালিকা - ৮
পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা

বছর	হেসিয়ান	স্যাকিং	সি.বি.সি.	অন্যান্য	মোট
৭৯-৮০	১৯৫	২১০	৯০	২০	৫১৫
৮০-৮১	১৯৫	২১০	৯০	২৫	৫২০
৮১-৮২	১৯৮	২১২	৯৩	২৭	৫৩০
৮২-৮৩	২০০	২১০	৯৫	৩০	৫৫৩
৮৩-৮৪	২০৫	২১৫	৯৫	৩০	৫৪৫
৮৪-৮৫	২১০	২১০	৯৫	৩৫	৫৫০

প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে আলোচ্য খাতে যে লক্ষ্যমাত্রা উপরে দেখানো হয়েছে তা অর্জন করা অসম্ভব হবে না। আশাবাদী অনুমানের ভিত্তিতে ১৯৮৫ সালের জন্য পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ৬.১০ লক্ষ টন ধার্য করা যায়। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে কর্মসূচী বাস্তবায়নের কারণে পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়েছে। এ সব বিবেচনা করে ১৯৮৫ সালের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৭.৩৬ লক্ষ টন ধার্য করা হয়েছে।

পাটের রপ্তানি বাণিজ্য

এ উপমহাদেশে পাট সর্ব প্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থান লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন ১৭৯৩ সালে গ্রেট বৃটেন থেকে প্রথম পাট কেনার প্রস্তাব আসে। এরপর ধীরে ধীরে পাটের ব্যবসার সম্প্রসারিত হতে থাকে। কালক্রমে পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক শিল্পের কাঁচামালে পরিণত হয়। বাংলাদেশে পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য চলে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য নিয়ে। তবে পাট শিল্পের বিকাশের আগে এদেশ থেকে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হতো না।

বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাপকভাবে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি শুরু হয়। তবে বিভিন্ন কারণে কাঁচা পাটের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার এবং স্থানীয় পাটকলগুলোতে কাঁচাপাটের ব্যবহারের দরুন রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে

৮০.৫৫ লক্ষ গাঁইট এবং ১৯৬৭-৭০ সালে ৩৫.০৮ লক্ষ গাঁইট কাঁচা বেল রপ্তানি কর
১৯৭০-৭২ সালে মাত্র ১৯.৭১ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানি করা হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের শুরু থেকে বাংলাদেশ সরকার কাঁচা রপ্তানি বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করেন। এ সময়ে রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পাট রপ্তানি স্থাপন করা হয়। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রস উদ্দেশ্যে সরকার পাট ব্যবসায়ে নিয়মকানুন শিথিল করেন এবং পাট সংস্থা ও বেস ব্যবসায়ীদের বিদেশী ক্রেতাদের সাথে পাট বিক্রয়ের জন্য আলাপ আলোচনা চালানো ও সম্পাদনের নিমিত্তে অনুমোতি দান করেন। ১৯৮০-৮১ সালে ২২ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট করা হয়। রপ্তানি চাহিদার সাথেই পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন নির্ভরশীল। অর এ পাটজা উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে ৭০টি পাটকল।

১৯৮১-৮২ সনে ৪১,০৮৯ মেট্রিকটন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ১৯৮২-৮৩ সালে হয়েছে ৪৭-৬৩৩ মেট্রিকটন। যা আগের বছরের তুলনায় ১৬% বেশি। ১৯৮৩-৮৪ সালে হয়েছে ৭২,১৫৬ মেট্রিকটন এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ৮৬,৭১০ মেট্রিকটন।

স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশ সরকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির সমস্ত বৈদেশিক বাতিল ঘোষণা করেন। তারপর নতুন দামে ও শর্তে চুক্তিগুলো পুনরুজ্জীবিত কর ১৯৭২-৭৩ সালে পাটজাত দ্রব্যের বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অংশ ছিল ৩৩ শতাংশ ৮১ সালে বাংলাদেশ থেকে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ শ উন্নীত হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটজাত পণ্যের ৯২% রপ্তানি করে।

তালিকা - ৯
বাংলাদেশের পাট রপ্তানি

বছর	রপ্তানির পরিমাণ (মেট্রিকটন হিসেবে)
১৯৮১-৮২	৪১,০৮৯
১৯৮২-৮৩	৪৭,৬৩৩
১৯৮৩-৮৪	৭২,১৫৬
১৯৮৪-৮৫	৮৬,৭১০

সূত্রঃ বি. বি. এস.

উপসংহার

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশ সাধারণত বিশ্ব চাহিদার প্রায় ৭০% সরবরাহ করে। এবং তা হতে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তা দেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ১৪%। এ বৎসর (৮৬–৮৭) উৎপাদনকারী দেশসমূহে উৎপাদন কম হওয়াতে আশা করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ বিশ্বের মোট চাহিদার প্রায় ৮০% হতে ৯০% পূরণ করবে। অতএব; দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পাটের একটি আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বেচাকেনা আঁশের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর ভিত্তি করে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর নির্ভর করে। আবার এ সকল চুক্তি পাটের বিভিন্ন গ্রেড অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং এ গ্রেডই পাটের আঁশের গুণ ও প্রকার নির্দেশ করে। সুতরাং চুক্তি ব্যাপারে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তদুপরি বৈদেশিক বাজারে পাট রপ্তানি করবার জন্য তার গুণাগুণের উপর ভিত্তি করেই নমুনা প্রস্তুত করা হয়, যাতে কোন চুক্তিতে পাটের গুণগত দিক হতে কোন ভ্রান্ত ধারণা না হয়। সেজন্য সুষ্ঠু গ্রেডিং ব্যবস্থার প্রয়োজন। জানা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের গ্রেডিং এর ব্যাপারে তেমন কোন সমস্যা নেই। তবে আভ্যন্তরীণ গ্রেডিং–এর ব্যাপারে যথেষ্ট সমস্যা আছে, কেননা সরকার বা সেকশনাল কমিটি পাটের গ্রেডিং –এর মান নির্ধারণ করে নিলেও বেপারী বা ফড়িয়া শ্রেণী কৃষকদের ঠকাচ্ছে। কেননা, অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত হওয়ায় পাটের গ্রেডিং সম্বন্ধে তাদের তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। যদিও আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন উৎপাদনকারী দেশসমূহে উৎপাদিত পাটের গ্রেডের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করার জন্য পাটের বর্তমান গ্রেডিং–এর সংশোধনের কথা বলা হয়েছে, তবুও গ্রেডিং–এর দৃষ্টিকোণে পাটের বাজারে বর্তমানে কোন বড় সমস্যা নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডাল

আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকার প্রায় নিয়মিত একটি উপাদান হচ্ছে ডাল [illegible] প্রধানত 'তরকারী' হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। এদেশে গড়পড়তা মাথাপিছু দিনে ডাল [illegible] পরিমাণ মাত্র ৮ গ্রাম। ভারতবর্ষে এই পরিমাণ ৪৫ গ্রাম। বাংলাদেশে ডাল ফসলের [illegible] ফলনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। গত দশ বছর ধরে এই ধারা লক্ষ্য করা [illegible] অন্যতম কারণ ধান এবং গমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া। ডালের জমিতে [illegible] বোরো ধান, তুলা ও তামাকের চাষ বেড়ে যাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল [illegible] ডালের দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯[illegible] সালে [illegible] মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে পাঁচ কোটি টাকার ডাল আমদানির জন্য টি.সি.বি.কে [illegible]

খাদ্য হিসেবে ডাল ঃ বাংলাদেশের খাবারে ডালের গুরুত্বের কথা খুব একটা [illegible] দেয়া হয় না। যদিও ডাল থেকেই সবচেয়ে সস্তায় প্রোটিন পাওয়া যায় [illegible] প্রোটিনের পরিমাণ ২২%। ডালের প্রোটিনের পরিমাণ ভাত বা গমের রুটি থেকে [illegible] ডালে "লাইসিন" নামের অ্যামিনো এসিড অনেক বেশি থাকে। তাই সুস্থ ও সবল [illegible] ভাতের সাথে ডালের বিশেষ প্রয়োজন। ১নং তালিকায় ডালের রাসায়নিক বিশ্লেষণ [illegible]

মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও বাংলাদেশের সবশ্রেণীর [illegible] বিভিন্নভাবে ডাল খেয়ে থাকে। এটা সিদ্ধ করে ডাল (Soup) ও ভর্তা (Paste) হিসে[illegible] ভেজে চানাচুর ও পাঁপড় বানিয়েও খাওয়া হয়।

গবাদি পশুর খাবার হিসেবেও ডাল ফসলের গুরুত্ব আছে। ডালের গাছে এবং [illegible] বেশ পরিমাণে প্রোটিন আছে। সেই সঙ্গে ডালের অন্যান্য খাদ্যমান [illegible] গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

খাদ্যে ডালের পুষ্টিকর ভূমিকা ছাড়াও এই ফসলের আর একটি বিশেষ [illegible] মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোজন করে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানো। বাংলাদেশে [illegible] ফসলগুলো "রাইজোবিয়াম" নামের ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রতি হেক্টরে [illegible] নাইট্রোজেন সংযোজন করে।

যদিও ডাল মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী তবুও 'ল্যাথিরিজম' নামক [illegible] একাধারে অতিমাত্রায় 'খেসারী' ডাল খাওয়ার মধ্যে গবেষকরা সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন [illegible]

তালিকা-১
ডালের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

ডাল	আহারযোগ্য প্রোটিন %	পানি %	প্রোটিন %	চর্বি %	খনিজ পদার্থ %	আশ %	কার্বহাইড্রেট %	শক্তি ক্যালরি
[illegible]	১০০	৯.৮	১৭.১	৫.৩	৩.০	৩.৯	৬০.৯	৩৬০
[illegible]	১০০	৯.৯	২০.৮	৫.৬	২.৭	১.২	৫৯.৮	৩৭২
[illegible]	১০০	১০.৯	২৪.০	১.৪	৩.২	০.৯	৫৯.৬	৩৪৭
[illegible]	১০০	১০.০	২৮.২	০.৬	২.৩	২.৩	৫৬.৬	৩৪৫
[illegible]	১০০	—	—	—	—	—	—	—
[illegible]	১০০	১৬০	১৯.৭	১.১	২.২	৪.৫	৫৬.৫	৩১৫
[illegible]	১০০	১৩.৪	২২.৩	১.৭	৩.৫	১.৫	৫৭.৬	৩৩৫
[illegible]	১০০	১০.৪	২৪.০	১.৩	৩.৫	৪.১	৫৬.৭	৩৩৪
[illegible]	১০০	১০.১	২৪.৫	১.২	৫.৫	০.৮	৫৯.৯	৩৪৮
[illegible]	১০০	১২.৬	৮.৫	০.৬	০.৯	—	৭৭.৪	৩৪৯

সূত্র ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ডালের অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ বাংলাদেশের সব পরিবারই কমবেশি ডাল খেয়ে থাকে। [illegible] সালের হিসাব অনুযায়ী মোট আবাদী জমির মাত্র ২.৪% জমিতে ডালের চাষ করা হয়। [illegible] দেশে যে পরিমাণ ডাল উৎপন্ন হয় তা দেশের সার্বিক প্রয়োজন মেটায় না। কিন্তু [illegible] কর্তৃক এই ঘাটতি পূরণের জন্য ডাল আমদানি করা হয় না বললেই চলে। স্বাধীনতা [illegible] এই ঘাটতি প্রবল আকার ধারণ করার প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সাল নাগাদ মোট দুইবার [illegible] আমদানি করা হয়েছে। তবে দেশে ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। বর্তমানে ৮,৩০,০০০ [illegible] জমিতে ডাল চাষ করা হয়। ডাল চাষের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য [illegible] হতে পারে এর চাষ পদ্ধতি অতি সহজ এবং কম খরচে বেশি লাভজনক। কিছু কিছু ডাল [illegible] বিনা খরচে এবং স্বল্প শ্রমে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। অন্য কোন ফসলের [illegible] উপযোগী নয় এমন কিছু উচুনিচু জমিও অড়হর ও কালাই এর মত ডাল চাষে [illegible] হতে পারে. ভালভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে যে আগামী পাঁচ বছরে ডালের ফলন [illegible] বাড়াতে হবে, তা না হলে মাথাপিছু ডালের পরিমাণ ৮ গ্রাম থেকে আরও কমে যাবে।

ডালের উৎপাদনঃ বাংলাদেশের প্রধান ডাল ফসল হচ্ছে খেসারী, মসুর, মু মাশকালাই এবং ছোলা। সাধারণত শীত মৌসুমেই এদের চাষ হয়ে থাকে। তবে এদের ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল ও নোয়াখালী জেলাতেই বেশি থাকে। ২নং তালিকায় ১৯৮৪-৮৫ বর্ষে বিভিন্ন জাতের ডালের চাষ এবং উৎপাদনের পরি দেখানো হলো।

তালিকা-২

বাংলাদেশে ডাল চাষ ১৯৮৪-৮৫

ডালের নাম	ডাল চাষকৃত ভূমি (একর)	উৎপাদন (টন)
ছোলা	১২২৯৫০	[illegible]
অড়হর	৭৩০০	[illegible]
মসুর	১৭৪৮৫০	[illegible]
মটর	২৪৯৪০	[illegible]
মুগ	৩৭৮৮৫	[illegible]
মাস	৮৩১৩০	[illegible]
খেসারী	১৯০৪৯০	[illegible]

সূত্র ঃ বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সংস্থা

যে সমস্ত এলাকায় পুরুষাণুক্রমে ডাল ফসলের চাষাবাদ হয়ে আসছে সেখান থেকে চাষ কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে গত কয়েক বৎসর ধরে গম ও বোরো ধানের চাষের বৃদ্ধি গেছে। কারণ এ সকল ফসলের চাষ অধিক লাভজনক। কাজেই রবি মৌসুমে ডাল ফসলের বাড়ানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে অনেক জায়গাতেই আউশ মৌসুমে [illegible] এর চাষ বাড়ানো যেতে পারে।

প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ ঃ আমাদের দেশে ডালের প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকর উপর খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। কারণ ডাল আমাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্য নয়। রপ্তানি পণ্যের মানে প্রমিতকরণ প্রয়োজন হয়। তবুও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবসায়ীগণ ডা সাধারণত দু'টি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনটি ভাগে প্রমিতকরণ করে থাকে।

যে কোন ডালেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর যে কোন একটি কণাকে মাঝ থেকে দুই ভাগ দু'টি সূক্ষ্ম আকৃতির কণায় পরিণত করা সম্ভব। তাই আমাদের দেশে যে কোন প্রকার "গোটা বা আস্ত" এবং "অর্ধেক ভগ্নাংশ বা আধাভাগ" এই দুইভাগে বিক্রি হয়। [illegible]

দাম বেশি কারণ এর সাথে কোনরূপ ভেজাল থাকে না আর এর আকৃতিও যথেষ্ট সতর্কতার সাথে রক্ষা করা হয়। ডাল আর এক প্রকার মানে বিক্রি হয় যার কণাগুলো বিভিন্ন আকারে হয় এটা ডালের সবচেয়ে নিম্নমান এবং এর সাথে বিভিন্ন রকমের ডালের কণা, খোসা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। তাই এই মানের ডালের দাম হয় সবচেয়ে কম এবং সাধারণত এদেশের দরিদ্র শ্রেণী এবং পশুখাদ্যের ক্রেতারা এই ডাল কিনে থাকে।

বণ্টন পদ্ধতিঃ উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যকার দুরত্ব, ভোগের পূর্বে প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা, পরিবহণ ব্যবস্থা, উৎপাদনকারীর সংখ্যা ও দরকষাকষির সমর্থ্য ইত্যাদি অনুসারে ডালের বণ্টন প্রণালী বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মসকালাই যেহেতু দেশের অসংখ্য উৎপাদনকারী উৎপাদন করে থাকে এবং ভোগের পূর্বে প্রক্রিয়াজত করে ডালে রূপান্তরিত করতে হয়, তাই এর ব্যজারজাতকরণে বহু মধ্য ব্যবসায়ী নিয়োজিত আছে।

উৎপাদনকারী সরাসরিভাবে অথবা 'আড়তদার' বা 'কমিশন এজেন্টের' মাধ্যমে বেপারীদের কাছে কলাই বিক্রি করে। বেপারীগণ এগুলো সংগ্রহ, একত্রিকরণ ও পরিবহণের মাধ্যমে বণ্টন অথবা ভোগের জন্য বাজারে নিয়ে যায়। বণ্টন বাজারে আড়তদারদের মাধ্যমে কল মালিক অথবা পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করা হয়। কল মালিক এবং পাইকারী ব্যবসায়ীগণ কলাইকে ডালে রূপান্তর করে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতাগণ আবার তা ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। আড়তদারগণ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহের ও বণ্টনের বাজারে বেপারীদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে বেপারীদের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। নিম্নে চার্টের মাধ্যমে ডালের বন্টন প্রণালী দেখানো হলো।

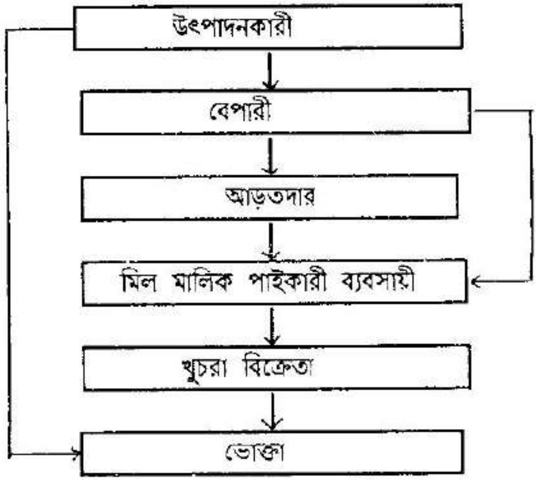

ডালের বন্টন প্রণালী

উৎস: বাংলাদেশে পণ্য বিপণন ব্যবস্থা, ডঃ আব্দুল্লাহ ফারুক

ডালের দর ঃ বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে ডাল ফসলের বেশির ভাগ চাষ হয়। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে ডালের দাম অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু সর্বত্র ডালের দাম দিন দিন বেড়েই চলছে। ডালের মূল্যের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

প্রথমত ঃ বিভিন্ন জাতের ডালের মধ্যে মুগ এর দাম সর্বাপেক্ষা বেশি এবং খেসারী সর্বাপেক্ষা কম। তবে গত দুই বৎসর যাবত মসুর ডালের মূল্য সময় সময় মুগের ডালের মূ অতিক্রম করতে দেখা গেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ ফসল কাটার সময় ডালের দাম একটু কম থাকে। কিন্তু ফসল কাটা হওয়ার পর থেকেই আবার দাম বাড়তে থাকে, এর অন্যতম কারণ কৃষকের ফসল ধরে ক্ষমতার অভাব সংরক্ষণের ব্যয় এবং বিনিয়োগকৃত পুঁজির জন্য ব্যয়। অধিক সংরক্ষণ অসুবিধার কারণে কৃষক ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে ডাল বিক্রি করে দেয়। সরবরাহ বৃদ্ধিজনিত কারণেও মূল্য অস্বাভাবিক পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে

তৃতীয়তঃ গোটা ডাল ও মাড়াই করা ডালের দামের মধ্যে সব সময় একটা প্রভেদ যায়। কারণ মাশকালাই ডালে খোসা আলাদা হয়ে যায় বলে যে পরিমাণ কলাই ভাঙ্গা সেই পরিমাণ ডাল পাওয়া যায় না। হিসাব করে দেখা গেছে ভাঙ্গানো হলে মাশকলা প্রকারভেদে ৬৭.৫% থেকে ৭০% ডাল পাওয়া যায়।

[illegible]ত দশ বছরের এক হিসাবে দেখা গেছে যে কোন কোন ডাল যেমন মুগ, ছোলা, অড়হর [illegible]র দর ৩–৪ গুণ বেড়ে গেছে। ডাল বাজারজাতকরণ ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে [illegible], কুলিখরচ, প্যাকেট খরচ, ভাঙ্গানো, আড়তদারী, ঘাট খাজনা, ব্যবসায়ীদের মুনাফার [illegible] স্বাধীনতা উত্তরকালে ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। তালিকা ৩–এ গত দশ বছরের [illegible] প্রকারের ডালের গড় দর দেখানো হলো ঃ

তালিকা–৩

বিভিন্ন প্রকার ডালের গড় পাইকারী দর।
(মণ প্রতি টাকায়)

ডাল [illegible]	মাস	খেসারী	ছোলা	মুগ	মটর	মসুর	অড়হর
[illegible]	১৪১	৯৮	২৫৩	২০৩	১৩৯	১৭৩	১১৬
[illegible]	১৬২	১০১	১৩৫	১৯৯	১৩৫	১৪৪	১৩৯
[illegible]	২২৬	১৪১	১৭৩	৩১৫	১৯২	১৪২	২২৪
[illegible]	২৪৯	১৩৩	২১১	৩৩৫	১৯৫	২৬৭	২৪৯
[illegible]	২৫৭	২০৬	২৮৫	৩৬৫	২৫৩	৩২৫	২৫৬
[illegible]	২৯৪	২৬১	৩৩৭	৫০৯	৩৩৮	৪৩১	৩০৭
[illegible]	২০৯	২০০	৪১৯	৪৮৪	৩১৮	৪১৩	৩১২
[illegible]	৩৪৯	২৭৬	৪১৪	৪৬৭	৩৫৮	৩৯৩	৩৫৮
[illegible]	৪৪৮	২৭৪	৪২৮	৫৮৬	৩৪০	৪১৬	৪১০
[illegible]	৪৬৩	২১৪	৪৯০	৫৮৬	৩৩৪	৪৩৫	৪২৪

সূত্র ঃ কৃষি বাজার বিভাগ

[illegible]র ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির জন্য টাকার মূল্যের অধোগতি ছাড়াও অপর কারণ হচ্ছে [illegible] বেড়ে গেছে ব্যাপক কিন্তু উৎপাদন বাড়েনি, বরং কমেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা [illegible] বহুল ব্যবহৃত মসুর ডালের ৯১৭৭–৭৮ সালে চাষের এলাকা ও উৎপাদন এর পরিমাণ ছিল [illegible] একর এবং ৫০৫৬৫ টন। কিন্তু ১৯৮৪–৮৫ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে [illegible] একর এবং ৪৯২২০ টন। একই সময় ডাল এর ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার চাহিদা

বেড়েছে ব্যাপক। ১৯৭৭ সালে একমণ মসুরের পাইকারী দাম ছিল ১৪৪ টাকা ... দাঁড়িয়েছে ৪৩৫ টাকা। অবশ্য এর পিছনে অন্যান্য আরো অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে

কৃষিজাত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে যে সকল সমস্যা বিদ্যমান ... পরিবহণ, সংরক্ষণ, আড়তদার তথা মধ্যস্থ কারবারীদের দৌরাত্ম্য, অর্থসংস্থান প্রভৃতির সমস্যা ডালের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। ডালের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির পরও উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ডালকে এক সময় 'সস্তায় আমিষ' বলা হতো। ডালের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির কারণে এখন এ ... প্রযোজ্য নয়। ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। প্রয়োজনীয় ডালের সরবরাহ ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য এ মুহূর্তে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

পরিবারের প্রোটিন সংগ্রহের অন্যতম উপায় হিসেবে ডাল গ্রহণ কোন রকমে ... থাকলেও এর ব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে মাথাপিছু দৈনিক ডাল গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২৮ গ্রাম, ১৯৭৫-৭৬ সালে ২৪ গ্রাম এবং ১৯৮১-৮২ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৮ গ্রাম -এ। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ডালের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ... কমে যাওয়া। একদিকে আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে অপর দিকে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৮১-৮২ সালে ডালের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ২৯%। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট ডাল চাষকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৯.২ লক্ষ একর। ১৯৮১-৮২ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ... লক্ষ একর। ১৯৮২-৮৩ সালে এই পরিমাণ আরো কমে দাঁড়ায় ৭.৪ লক্ষ একরে। একর প্রতি উৎপাদন এখনো স্বাধীনতা পূর্বকালের উৎপাদনের নিম্নে রয়ে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আলু

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ফসলের মধ্যে আলু অন্যতম। উৎপাদনের দিক থেকে ধান ও গমের পরেই এর স্থান। আলু আমাদের দেশে এখনও একটা গুরুত্বপূর্ণ সবজি। উন্নত দেশসমূহের অনেক দেশই আলুকে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে।

আলু রবিশস্য এবং আমাদের শীতকালীন ফসলের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে দুই ধরনের আলু উৎপন্ন হয়। যেমন গোল আলু ও মিষ্টি আলু। গোল আলুই বেশি জমিতে উৎপন্ন হয় ও ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের গোল আলু আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। যথাঃ (১) হল্যাণ্ডীয় (২) ইণ্ডিয়ান এবং (৩) দেশী। এসবের মধ্যে হল্যাণ্ডীয়কে উচ্চ ফলনশীল আলু বলা যায়। বাংলাদেশ সরকার উচ্চ ফলনশীল জাতের তথা হল্যাণ্ডীয় আলু চাষের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়াছেন। কেননা এই মুহূর্তে আমাদের দেশে কম জমিতে বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন দরকার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের খাদ্য সমস্যার সমাধানের এছাড়া আর কোন উপায় নাই। ফলে সরকারকে উচ্চফলনশীল জাতের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে।

উৎপাদনের সময় ও পদ্ধতিঃ আলু শীতকালে আবাদ করা হয়। এজন্যে যে ধরনের আবহাওয়ার প্রয়োজন তা অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মার্চ পর্যন্ত থাকে। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আলু বীজ বপণ করা হয়। ডিসেম্বরের শেষ থেকে আলু তোলা শুরু হয় এবং তা মার্চ-এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত তোলা হয়।

আলু উৎপাদনের জন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়া প্রয়োজন। বেলে মাটি এর জন্য খুবই উপযোগী। আলু চাষের জন্য জমি খুব সুন্দর করে তৈরি করতে হয়। জমি তৈরি শেষে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপণ করা হয়। পরবর্তীতে চারা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চারার গোড়ার মাটি উঁচু করে দিতে হয়। আলু মাটির নীচে জন্মে বলে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসময় অন্যান্য আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। জমিতে সঠিকভাবে ও পরিমাণ মতো সার দিতে হয়। খুব বেশি পানি দেয়ার দরকার হয় না। তবে খরার সময় পরিমাণ মতো পানি সরবরাহ করতে হয়।

উৎপাদনের জমির ও ফলনের পরিমাণ

ফসলের অধিনস্ত জমি ও উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করার নির্ভুল প্রক্রিয়া এখনো আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিবছর নমুনায়নের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ফসলের অধিনস্ত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন ক্রমেই বেড়ে চলছে। যদিও এ বৃদ্ধির হার খুব বেশি নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে আলু আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় উৎকৃষ্টমানের অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়

বিদেশ হতে আমদানি করে। ফলে বেশি পরিমাণ ফলন পাওয়া যায়। আলুর উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

নীচের তালিকা-১ থেকে বাংলাদেশে আলুর চাষের অধিনস্ত জমি, উৎপাদন ও ফলনের পরিমাণ দেখা যায়, ১৯৬৯–৭০ থেকে ১৯৮৩ – ৮৪ পর্যন্ত ঃ

তালিকা-১

বাংলাদেশে আলুর চাষ ও উত্তপাদন

বছর	জমির পরিমাণ (১০০০ হেক্টর)	উৎপাদন (১০০০ টন)	ফলন হেক্টর প্রতি টন
১৯৬৯–৭০	৭৫.২৭	৮০৩	১০.০২
১৯৭১–৭২	৭৯.৭২	৭০০	৯.৯৪
১৯৭৩–৭৪	৯৩.৮৮	৭১৯	৯.৯৭
১৯৭৫–৭৬	৭৭.২৯	৮৮৮	৯.৩৯
১৯৭৭–৭৮	৯৬.৭২	৮৪৯	৯.৫৭
১৯৭৯–৮০	৮০.৯৩	৯০৩	৯.৪০
১৯৮০–৮১	১০২.৪০	৯৮৩	৯.৬৩
১৯৮১–৮২	১০৬.০২	১০৬৭	১০.১৬
১৯৮২–৮৩	১১০.১২	১১৩১	১০.২৮
১৯৮৩–৮৪	১১০.১৯	১১৬৬	১০.৫৮

সূত্রঃ বি. বি. এস

আলুর জাত ও বিভিন্ন জাতের উৎপাদনের পরিমাণ

বাংলাদেশে সাধারণত দুই শ্রেণীর আলু উৎপাদন করা হয়। দেশী ও বিদেশী বা উন্নত জাতের। দেশী জাতগুলো আসলে অনেক পূর্বে এদেশে এসেছিল। এগুলো উৎপাদনের জন্য তেমন যত্ন নিতে হয় না। এর ফলন কম কিন্তু স্বাদ ভাল। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় ৬/৭ মাস সংরক্ষণ করা যায়। বিদেশী জাতের আলু উচ্চফলনশীল। উচ্চফলনশীলতার কারণে এগুলো বেশি সমাদৃত হয়েছে

বিভিন্ন জাতের আলু উৎপাদনের পরিমাণ তালিকা-২ এ দেখান হলো ঃ

তালিকা-২

বিভিন্ন জাতের আলুর উৎপাদন

আলুর প্রকার	উৎপাদনে পরিমাণ	মোট জমির (একর হিসাবে)	মোট উৎপাদন (০০০ মেট্রিক টন)	একর প্রতি উৎপাদন (মন হিসাবে)
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১. দেশীয়	১,০৯,৬৪৫	১,০৫,৪৭৫	৮৫.২৮	৮৪.৭৫
২. হল্যাণ্ডীয়	১,৫৮,৭০০	১,৬৫,৮৩৫	১৩৫.১৪	১৩১.৭২
৩. ভারতীয়	৩,৯৫৫	৩,৬৭০	৭২.৬২	৭৫.০১

সূত্রঃ বি, বি, এস.

অঞ্চল ভিত্তিতে আলুর উৎপাদন ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে পরিমাণ আলু গত ১৯৮[illegible] - ৮৪ ও '৮৪-'৮৫ সালে উৎপাদন হয়েছে তা তালিকা-৩ এ দেখান হলো ঃ

তালিকা-৩
বাংলাদেশে আলু উৎপাদন (জেলা ভিত্তিক)

জেলা	১৯৮৪ - ৮৫		১৯৮৪-৮৫	
	জমির পরিমাণ (একর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	জমির পরিমাণ (একর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)
১. বান্দরবন	৬৪০	২,৭২৫	৭৪০	[illegible]
২. চট্টগ্রাম	৭,৩৩৫	৩৪,০৬৫	৭,৩২৫	[illegible]
৩. কুমিল্লা	৪১,৫৩৫	২,৩১,৩৬৫	৪১,৭২০	[illegible]
৪. খাগড়াছড়ি	২০০	৫০০	৩১৫	[illegible]
৫. নোয়াখালি	২,৪৬৫	৯,৯৫৫	২,৬৭৫	[illegible]
৬. রাঙ্গামাটি	২৬৫	৬৪৫	২৬০	[illegible]
৭. সিলেট	১০,৬১০	৫২,৭৪০	১১,৩৯৫	[illegible]
৮. ঢাকা	৪৮,৩০৫	২,৯২,৭২৫	৪৭,৪৭৫	[illegible]
৯. ফরিদপুর	১,৮৬০	৬,৭১৫	১,৮২৫	[illegible]
১০. জামালপুর	৫,১১০	১৭,২৭০	৫,১৮০	[illegible]
১১. কিশোরগঞ্জ	১৪,১২৫	৫৬,৬৫৫	১৪,৩৯৫	[illegible]
১২. ময়মনসিংহ	৮,৯৭৫	২১,১৮০	৯,০৭০	[illegible]
১৩. টাঙ্গাইল	৫,৮২৫	১৬,৯৭৫	৬,১৯০	[illegible]
১৪. বরিশাল	১,২৫৫	১১,৫৯৫	৩,৫০০	[illegible]
১৫. যশোহর	৪,২০০	২৫,৩৬০	৫,৮৪০	[illegible]
১৬. খুলনা	৭,৪০২	৩৫,৪২০	৭,৭৭৫	[illegible]
১৭. কুষ্টিয়া	২,৩৫৫	৯,৮৫০	২,৭৫০	[illegible]
১৮. পটুয়াখালী	৪০০	১,৩৩৫	৪০৫	[illegible]
১৯. বগুড়া	২৭,৪৬০	৮৫,৬১৫	২৬,৩৪৫	[illegible]
২০. দিনাজপুর	২২,১৮৫	৭৭,০২৫	২৩,৭৭০	[illegible]
২১. পাবনা	৮,৬১৫	২৪,৮৪৫	৮,৭২০	[illegible]
২২. রাজশাহী	২৮,১৫৫	৭৫,৩০৫	২৭,২৭০	[illegible]
২৩. রংপুর	২১,১০০	৭৭,০৬০	২০,০৪০	[illegible]
বাংলাদেশ	২,৭২,৩০০	১১,৬৬,১৬৫	২,৭৪,৯৮০	[illegible]

সূত্রঃ বি.বি.এস.

বিভিন্ন দেশে আলু খাওয়ার পরিমাণ

বিভিন্ন দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু আলু খাওয়ার পরিমাণ তালিকা ৪ এ-দেখান হলো ঃ

তালিকা-৪

বিভিন্ন দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু আলু গ্রহণ

দেশ		পরিমাণ
১.	পোলাণ্ড	২৫০ কিলোগ্রাম
২.	পূর্ব জার্মানী	২২০ ,,
৩.	বেলজিয়াম	১০০ ,, এর বেশি
৪.	পেরু	১০০ ,, " ,,
৫.	পশ্চিম জার্মানী	১০০ ,, " ,,
৬.	স্পেন	১০০ ,, " ,,
৭.	ফ্রান্স	১০০ ,, " ,,
৮.	বাংলাদেশ	১০ ,, " কম

সূত্রঃ বি. এ. আর. সি.

এ তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে আলু খাওয়ার পরিমাণ অত্যন্ত কম। উন্নত দেশসমূহে আলুকে প্রধান খাদ্যের বিকল্প হিসাবে নেয় কিন্তু আমাদের দেশে আলুকে সব্জি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, ফলে গ্রহণের পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

আলুর পুষ্টিমানঃ আলুতে যথেষ্ট পুষ্টিমান রয়েছে। অন্যান্য দামী ফসলের চেয়ে আলুতে আমিষ ও খাদ্যপ্রাণ কম থাকলেও অন্যান্য খাদ্যগুণ রয়েছে। যা চাল বা গমে নেই বললেই চলে। প্রধান খাদ্য হিসাবে আলু খেলে শুধুমাত্র আলু দিয়েই ভিটামিন 'সি' -এর অভাব পূরণ করা সম্ভব।

পর্যায়িতকরণ ও মান নির্ধারণ ঃ বাংলাদেশে আলুর চাষ বর্তমানে যদিও ব্যাপকতা লাভ করেছে তথাপি এখানে পণ্যের সুষ্ঠু মান নির্ধারণ ও পর্যায়িতকরণের অভাব সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়। আমাদের কৃষককূল নিরক্ষর বিধায় তারা পণ্যের মান নির্ধারণের ব্যাপারে পটু নয়। তাছাড়া ক্রেতারাও মান নির্ধারণ করা পণ্যের জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় না। ফলে উল্লেখিত ক্ষেত্র অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এজন্যই কৃষককূল তাদের পণ্যের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না এবং চাষের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সঠিক ভাবে পর্যায়িতকরণ ও মান নির্ধারণ করা হলে যেমনটি কৃষককূল প্রকৃত মূল্য পাবে, ঠিক তেমনি ভোক্তাবৃন্দ সঠিক মূল্যে পণ্য পাবে।

আলু সংরক্ষণ

শীতের সময় আলু চাষ ও উত্তোলন করা হয়। ক্ষেত হতে আলু তোলার পর উষ্ণ তাপমাত্রার জন্য যে সব আলু হিমাগার ছাড়া বাইরে সংরক্ষণ করা হয় সেগুলোর একটা বিরাট অংশ নষ্ট

হয়ে যায় যথাযথ ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে। সুষ্ঠু গুদামজাতকরণের অভাবে দেশে উৎপাদিত আলুর আনুমানিক প্রায় শতকরা ২০ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়।

অহিমায়িত অবস্থায় সাধারণত চাষীরা ঘরে, বৈঠকখানায় বা যে কোন চালা ঘরে আলু তোলার ২/৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে থাকে। তবে যে ঘরে সর্বদা বাতাস চলাচল করে এবং ঠাণ্ডা থাকে এমন ঘরেই আলু রাখা প্রয়োজন। ছনের ছাউনী ও বাঁশের বেড়াযুক্ত ঘরই সবচেয়ে ভাল।

হিমাগারঃ মার্চ মাসের পর হতে চাষীরা তাদের আলু হিমাগারে রাখা আরম্ভ করে। দেশে যে পরিমাণ আলু উৎপাদন হয় তার সবটা সংরক্ষণ করা না গেলেও বর্তমানে এর অধিকাংশই হিমাগারে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্যোগে কয়েকটি হিমাগার এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে কিছু হিমাগার স্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা ১০০০ মেট্রিক টন থেকে ২৫০০ মেট্রিক টনের মধ্যে।

১৯৮৬ সালের জুন পর্যন্ত দেশে মোট ১৬৪টি হিমাগার গড়ে উঠেছে। এগুলোর আলু ধারণক্ষমতা ৩,৬৯,১১০ মেট্রিক টন। তালিকা ৫ এ দেশে কোন জায়গায় কয়টি হিমাগার, ধারণক্ষমতা ও '৮৫, '৮৬ সালের সংরক্ষণের পরিমাণ দেয়া হলো ঃ

তালিকা-৫

বাংলাদেশে হিমাগারের ধারণক্ষমতা

জেলা	হিমাগারের সংখ্যা	ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন)	১৯৮৫ সালে সংরক্ষণ (মণে)	১৯৮৬ সালে সংরক্ষণ (মণে)
১. ঢাকা	৬৬	১,৫৭,৯৬০	৩২,৭৯,৯৪৩	৩০,২৭,২১৫
২. কুমিল্লা	২	৭৩,১০০	১৬,১৩,৫৭১	৯১৬,৯৬৬
৩. সিলেট	৭	১৩,৭০০	১,৮৭,০১০	১,০৪,৬৩৬
৪. চট্টগ্রাম	৫	৬,২০০	৯৫,১৪০	৭৫,৪০৫
৫. নোয়াখালী	৩	৪,৫০০	৯৪,৪০০	৯১,৯৪৮
৬. কিশোরগঞ্জ	২	২,০০০	৫৫,০০০	৪৩,৩৬৮
৭. বগুড়া	৯	১৬,৬৩০	৩,৬১,৮৪৭	৩৪,৬৬৪
৮. রাজশাহী	৮	১৬,০০০	২,৫৭,৩৮৮	২,৭৬,১৫৫
৯. রংপুর	১২	২৯,১০০	৪,৬৬,৩১৮	৩,৯৫,৯৫৮
১০. দিনাজপুর	৬	১২,৬৫০	২,৩৫,৩৯১	২,৩৩,৯০৭
১১. খুলনা	৮	১৯,৪৪০	২,৯৫,২৬৫	২,১৩,৬১২
১২. যশোহর	৪	৭,০০০	১,৪৯,৪৩২	১,১২,৬২৫
১৩. পাবনা	৪	৯, ৭৩০	১,৭৩,২৩৫	৫৭,১১৪
১৪. অন্যান্য	৩	৩,০০০	৪৯,৪২২	৪৬,৯৬৬

সূত্রঃ বি. বি. এস.

এসব হিমাগারে সাধারণত খাবার আলু এবং বীজ একই সঙ্গে সররক্ষণ করা হয়। দেশে বর্তমানে হিমাগারের যে সংরক্ষণ ক্ষমতা আছে, তাতেই বর্তমানে দেশের সমস্ত বীজ আলু সংরক্ষণ করে প্রায় ১,৭০,০০০ টন খাবার আলু সংরক্ষণ করা সম্ভব। শুধুমাত্র আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে সবজি হিসাবে খাবার আলু ব্যবহার করা হলে, বীজ আলু হিমাগারে সংরক্ষণে সমস্যাও দূরীভূত হবে। তাই উৎপাদিত বাড়তি খাবার আলু, আলু তোলার ৩/৪ মাসের মধ্যে খাওয়া সম্ভব হলে দেশে আপাতত আর হিমাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

হিমাগারে সুনির্দিষ্ট চার্জের ভিত্তিতে মজুত রাখা হয়। মার্চ মাস থেকে সংরক্ষণ শুরু হয় এবং আগস্টের দিকে সরবরাহ শুরু হয়। মার্চ থেকে নভেম্বর সংরক্ষণের মৌসুম বলা হয়। হিমাগার মালিকদের নিজস্ব পণ্য পরিযান নেই; ফলে কৃষককে তাহার নিজস্ব পরিবহণের মাধ্যমে আলু হিমাগারে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হয়। হিমাগারসমূহ পরিচালনায় সমন্বয়ের জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ হিমাগার মালিক সমিতিই নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ ঠিক করে দেয়। যাতে হিমাগারসমূহের ভাড়ার মধ্যে সমতা থাকে। এই সমিতি ১৯৮৩-৮৪ সালে সংরক্ষণ খরচ নির্ধারণ করে প্রতি মণে ৪০ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালে তা নির্ধারণ করা হয় মণ প্রতি ৬০ টাকা প্রতি মৌসুমে।

মালিকরা যখন তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে তখন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সুবিধাজনক দাম নির্ধারণ করে থাকে। '৮৬ সালে ৬০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে ৪৫ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে মালিকরা আলু সংরক্ষণ করছে।

অনেক সময় হিমাগারের মালিকগণ চাষীদেরকে ঋণ দেয়। তবে তা কোন মতেই মণ প্রতি ১০ টাকার কম ও ৪৫ টাকার বেশি হয় না। হিমাগারসমূহের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এর মধ্যে খুচরা যন্ত্রাংশের সমস্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ইত্যাদি অন্যতম।

আলুর বাজারজাতকরণ ঃ যে কোন পণ্যেরই বাজারজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উৎপাদিত পণ্যের লাভক্ষতি নির্ভর করে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের উপর। আলুর ক্ষেত্রে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আলু সারা বৎসর ব্যবহারোপযোগী অথচ পচনশীল। তাই অন্য কাঁচামালের চেয়ে আলুর বাজারজাতকরণ বেশ জটিল, ব্যয়বহুল এবং সমস্যা সংকুল। আলু সংগ্রহ করার পর থেকে ব্যবহারকারীর নিকট পৌছতে যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করতে হয় তার সবটাই বাজারজাতকরণের অর্ন্তভুক্ত।

খাবার আলু বাজারজাতকরণে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুসারে তা বাজারজাতকরণ করা হয়ে থাকে। বাজারে চাহিদা থাকায় উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জন্য চাষী আগাম মৌসুমে অপরিপক্ব আলু তুলে বিক্রি করে। এতে ফলন খুব কম হলেও উচ্চমূল্য থাকায় চাষীর খুব লাভ হয়। কেননা কোন কোন এলাকায় চাষীগণ আগাম আলু তুলে ঐ জমিতে আবার দ্বিতীয়বার বীজ বপণ করে।

স্বাভাবিক ফসল উঠার পর বাজারে আলুর মূল্য কম থাকলেও অধিকাংশ চাষী অর্থাভাবে তা সাথে সাথে বিক্রয় করে থাকে। অল্প সংখ্যক ধনী চাষী, হিমাগারের মালিক ও মহাজন আলু ক্রয় করে হিমাগারে রাখেন। পরে চাহিদা ও মূল্য বিবেচনা করে বাজারে সরবরাহ করে। অবশ্য

মাঝারি ও ক্ষুদ্র চাষীগণও যেখানে হিমাগারের সুবিধা আছে সেখানে তাদের নিজের প্রয়োজনীয় বীজ হিমাগারে সংরক্ষণ করে।

আলু বাজারজাতকরণের স্তরগুলো

আলুর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বিবিধ স্তর আছে যার মাধ্যমে উৎপাদিত আলু উৎপাদকদের কাছ থেকে ভোগকারীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। নিম্নে তা দেখান হলো ঃ

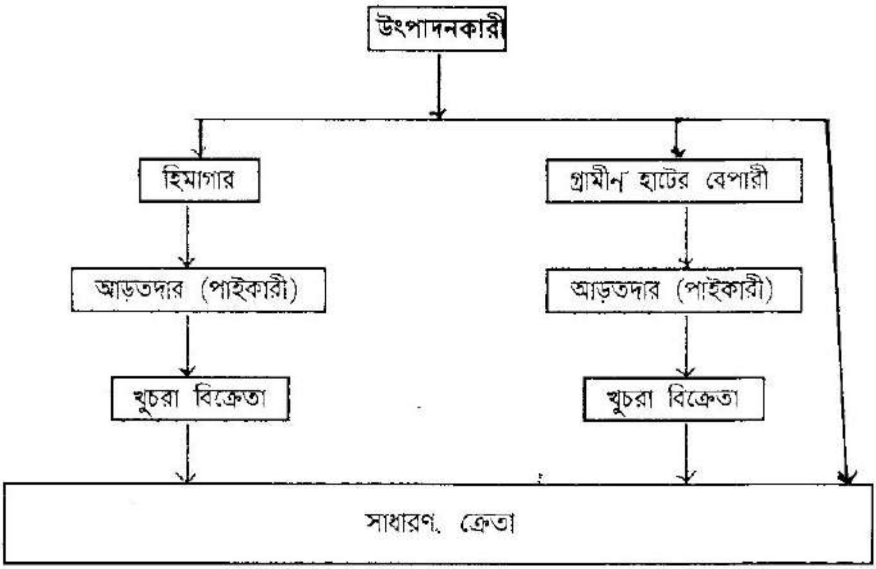

চিত্রঃ আলুর বণ্টন প্রণালী

উপরের চার্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে একজন উৎপাদনকারী তার নিজের পণ্য উৎপাদনের পর হিমাগারে সংরক্ষণ করতে পারে। পরবর্তীতে তার সুবিধামত মূল্যে বা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পেলে সে পণ্য আড়তদারের (যারা পাইকারী ব্যবসায় নিয়োজিত) কাছে বিক্রি করে থাকে। আড়তদার আবার খুচরা কারবারীর কাছে পণ্য বিক্রি করে। পরবর্তীতে সাধারণ ক্রেতা তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে থাকে।

আবার উৎপাদনকারীগণ তার আলু গ্রামীণ হাটের ব্যাপারীর কাছে উৎপাদনের পরপরই বিক্রি করতে পারে। যে সব স্থানে এটা হয় সেখানে হিমাগারের সুবিধা কম বা উৎপাদকদের পুঁজির অভাব আছে। হাটের বেপারীদের আলু আবার আড়তদারের কাছে এবং সেখান থেকে খুচরা বিক্রেতার কাছে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে তা সাধারণ ক্রেতাগণ সংগ্রহ করে থাকেন।

বাজারজাতকরণ সমস্যাসমূহ

১. **ঋণের সুবিধা ঃ** জরিপে দেখা গেছে ঋণের উৎস প্রধানত আত্নীয়, বন্ধু-বান্ধব, মহাজন অন্যান্য কৃষক, ব্যাংক ইত্যাদি। মহাজনের ঋণের সুদ খুবই বেশি। আর ব্যাংক ঋণ নেয়া সাধারণ কৃষকদের জন্য খুবই দুরুহ ব্যাপার। বাংলাদেশে আর পাঁচটি ফসলের মত আলু চাষের জন্য ঋণ সুবিধা নেই বললেই চলে। দরিদ্র গ্রামীণ কৃষকদের প্রধান সমস্যা পুঁজি বা মূলধন। সরকারীভাবে আলু চাষের জন্য কোন ঋণ দেয়া হয় না। আর আমাদের দেশে সরকারী (অল্পকিছু) ছাড়া অন্য সকল ঋণের টাকা শোধ করতে হয় প্রত্যেক ফসলের মৌসুমে। অথচ সেই ফসল মৌসুমের সময় ফসলের দাম থাকে খুবই কম, এতে কৃষকদের ঋণ শোধ করতেই সব ফসল বিক্রি করতে হয় বলে, খুবই কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়। আবার এর উপরে আছে ফসল যে কোন কারণে নষ্ট হওয়া। এরজন্য কৃষি নির্ভরশীল কৃষক ঋণ শোধ করতে পারে না। ফলে বাড়তে থাকে ঋণ ও সুদের বোঝা। এক সময় জমি বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে হয়। শুধু আলু চাষ নয় সব ফসলের ঋণ ব্যবস্থাকে আরো সহজতর করতে হবে ও সাধারণ মানুষের জন্য ঢেলে সাজাতে হবে।

২. **বাজার দর ঃ** আলু চাষের অন্যতম প্রধান অন্তরায় বাজার দর। বহু কষ্টে ফসল উৎপন্ন করে মৌসুমে যদি ঠিকমত দাম না পাওয়া যায় তা হলে কৃষককে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাটের দাম না পেয়ে আগুন দিয়ে পোড়ানোর সত্যতাই আমাদের কৃষি বাজারের কাঠামোগত ত্রুটি প্রমাণ করে। যেবার আলুর দাম ভাল থাকে, তার পরের বার অনেকেই আলু আবাদ করে কিন্তু ঠিক সে বৎসরেই আবার আলুর দাম অনেক কমে যায়। ফলে আলু চাষের জমির পরিমাণ খুবই কম বেশি হয়ে থাকে। স্থানীয় বাজারে আলুর মূল্য স্থিতিশীল করতে না পারলে যেমন আলু চাষ বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ব্যবস্থা না করতে পারলে আলু বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। বাজারের মন্দাভাব দূর করার জন্য আলু রপ্তানি খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। দেশের কোথায়ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য কেনা বা সংরক্ষণ করা হয় না। ফসল উঠার সময় বা মৌসুমে বাজার দর নিশ্চিত করতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. **হিমাগার সমস্যা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ** আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দেশে যে সমস্ত হিমাগার আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যেমন কম, তেমনি সংসরক্ষণ খরচও খুব বেশি। এজন্য সাধারণ কৃষকদের পক্ষে আলু সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। বড় বড় ব্যবসায়ী ও হিমাগার মালিকরাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মৌসুমে আলু কিনে সংরক্ষণ করে। এর থেকে তারা সমস্ত বছর আলু, বীজ আলু বিক্রি করে এবং এতে করে সাধারণ চাষীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে আলু চাষে। দেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন হিমাগারের সাথে সরকারী হিমাগারের যেমন প্রয়োজন তেমনি সংরক্ষণ খরচও ন্যূনতম করতে পারলে সাধারণ কৃষকরাও আলু সংরক্ষন করে লাভবান হতে পারে।

৪. **সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য যানবাহনের অভাবঃ** সংরক্ষণ তথা হিমাগারে সংরক্ষণের জন্য এবং পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য অবশ্যই আধুনিক ও সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা

তথা প্রয়োজনীয় যানবাহনের প্রয়োজন। যাতে সহজেই বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটা প্রায় অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা এখানে যানবাহন ও রাস্তা-ঘাটের অব্যবস্থার দরুন আলু সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুষ্ঠুভাবে সম্ভবপর হচ্ছে না।

রপ্তানি বাণিজ্যঃ বাংলাদেশ সরকার ইদানীং আলু রপ্তানির জন্য চিন্তাভাবনা করছেন। গত ১৯৮৩-৮৪ সালে ২০০ মেট্রিক টন আলু মালয়েশিয়াতে রপ্তানি করা হয়। এছাড়া বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কিছু পরিমাণ আলু মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। তবে এটা তেমন বেশি কিছু নয়। তাছাড়া বর্তমান উৎপাদন অবস্থায় রপ্তানিও তেমন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভবিষ্যতের জন্য T. C. B এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো যৌথভাবে কিছু করার কথা চিন্তা ভাবনা করছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে আলু কেবল সবজী হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই আলু মানুষের প্রধান খাদ্যের ভূমিকা পালন করছে। ইউরোপের অনেক দেশেই এটা প্রধান বা অন্যতম প্রধান খাদ্য। আলুর এমন কতিপয় গুণ রয়েছে যার জন্য প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে কোনই অসুবিধা নেই। কেননা সষ্যের মত এটাও একটা স্টার্চ জাতীয় প্রধান খাদ্য। আলুতে পুষ্টির উপাদানসমূহ সুষম অবস্থায় বিদ্যমান। আলুর প্রোটিনের জৈব মূল্য অর্থাৎ দেহে এটার আত্মীকরণের যোগ্যতা চাল ও গমের প্রোটিন অপেক্ষা বেশি। যদিও আলুতে পানির পরিমাণ বেশি কিন্তু এটা পাককরা চালের প্রায় কাছাকাছি। তাই প্রধান খাদ্য হিসাবে আলু গ্রহণ করলে একদিকে যেমন পেট ভরে খাওয়ার তৃপ্তি পাওয়া যায় অপরদিকে তেমনি কোন পুষ্টি সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া স্বাদের দিক দিয়ে আলু সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য।

আমরা যদি আমাদের খাদ্যাভ্যাস সামান্য পরিবর্তন করে অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে আলুকে গ্রহণ করতে পারি তাহলে এটা আমাদের দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্যসমস্যা লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একাধিক কারণে আমাদের এ সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

যেহেতু ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য স্বাভাবিকভাবেই ধান উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রবর্তন, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদির ফলে ইদানিং কালে এদেশে ধানের উৎপাদন ও ফলন যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খরা, বন্যা, শিলাবৃষ্টির কারণে বাংলাদেশে ধান ফসল সব সময়ই অনিশ্চিত। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছরই কোন কোন এলাকায় ধানের ফসল মারা যায়। ফলে শত চেষ্টা করেও আমরা ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার নিশ্চয়তা পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প ফসলের চিন্তা করতে হবে যেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই এখানে গম ও আলুর কথা চলে আসে। রবি মৌসুমে চাষ হয় বলে এই দুটি ফসলই মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ইতিমধ্যেই গম চাষের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। গমের সাথে সাথে বিকল্প খাদ্য হিসাবে আলুও একাধিক কারণে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

প্রথমতঃ বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুব কম এবং জনসংখ্যার চাপে এটা দিন দিন আরো কমে যাচ্ছে। এজন্যে আমাদেরকে এমনসব ফসলের উপর জোর দিতে হবে যেগুলোর চাষ করে অধিক পরিমাণ খাদ্যবস্তু পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে আলুর জুড়ি নেই।

দ্বিতীয়তঃ কৃষকদের জন্য আলু একটি লাভজনক ফসল। এদেশে আলু চাষ করতে ৯০ থেকে ১০৫ দিন সময় লাগে। কোন জাত মাত্র ৭৫ দিনেও তোলা যায়। যদিও আলুর উৎপাদন খরচ (প্রধানত বীজের কারণে) একটু বেশি, তবুও কৃষকরা এর চাষ করে অন্যান্য ফসল অপেক্ষা বেশি মুনাফা করতে পারেন। ফলন বৃদ্ধি করতে পারলে এর দাম আরো কমে আসবে। আলু অন্যান্য ফসলের সাথে মিশ্র ফসল বা অন্তঃফসল হিসাবেও জন্মানো যায়।

প্রধান খাদ্য হিসাবে আলুকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে দুটি শর্ত পুরণ করতে হবে।

প্রথমতঃ এর খুচরা বিক্রয় মূল্য (মোট শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে) চাল অপেক্ষা কম হতে হবে। অর্থাৎ টাটকা ওজনের ভিত্তিতে এক কেজি আলুর দাম এক কেজি চালের দামের এক চতুর্থাংশের বেশি হবে না।

দ্বিতীয়তঃ আলু তোলার সময় থেকে ২/৩ মাস আলুকে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। স্থূল ও পচনশীল হওয়ার কারণে আলু সংরক্ষণ ব্যয়বহুল। যদিও আজকাল হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিন্তু হিমাগারে রক্ষিত আলুর দাম স্বভাবতই অনেক বেশি যে কারণে প্রধান খাদ্য হিসাবে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে আমরা যদি মার্চ – মে, এই তিন মাস প্রধান খাদ্য হিসাবে আলু গ্রহণ করি তাহলে একদিকে ক্রেতারা যেমন সস্তায় পাবে, অপর দিকে বিক্রেতারাও তেমনি এর বাজারজাতকরণজনিত সমস্যা থেকে রেহাই পাবে। আলু সহজেই তিন চার মাস ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

প্রধান খাদ্য হিসাবে গৃহীত না হলেও বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে কোন কোন বৎসর ফসল তোলার মৌসুমে আলুর দাম এতো কমে যায় যে উৎপাদনকারীরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। এমতাবস্থায় যদি আলুর ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহলে এদের উৎপাদন খরচ কমে আসবে এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি করেও উৎপাদনকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। তাছাড়া মাথাপিছু ব্যবহার সমান থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আলুর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ণিত চাহিদা মেটাতে হবে। এতে উৎপাদনকারী ও ক্রেতা উভয়ই লাভবান হবে। দেশে আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতা বিবেচনা করে সবচেয়ে কম পরিমাণ জমি থেকে বেশি পরিমাণ আলু উৎপাদন করা যেতে পারে। যাতে জমির ব্যবহার সর্বাধিক হবে এবং সামগ্রিকভাবে ভোক্তাবৃন্দ স্বল্পমূল্যে পণ্য পেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

শাক-সব্‌জী

ভূমিকাঃ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যেমন উন্নয়ন ঘটেছে মানব আচরণের তেমনিভাবে শিখেছে খাদ্যদ্রব্য ভোগের উন্নত কলা-কৌশল এবং সে সকলের উৎপাদনের এবং ব্যবহারের বিবিধ প্রক্রিয়া। আদিম সমাজ খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার বিবেচনা না করেই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করত, কিন্তু বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগের সচেতন মানুষ এলোমেলোভাবে অপ্রোয়জনীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে সম্মত নয়। তারা খাদ্যদ্রব্যের মান-নিয়ন্ত্রণ করে উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী আমাদের শরীরে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের যোগান দেয় শাক-সব্‌জী এদের মধ্যে প্রধান।

বাংলাদেশ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই এখানে সর্বদিকে যেমন কারিগরি দক্ষতা সূচিত হয়নি তেমনিভাবে কৃষিক্ষেত্রেও রয়েছে অনুন্নত। কৃষিজাত পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে শাক-সব্‌জী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশে অন্যান্য কৃষিজপণ্য যেমন- চা, পাট, গম ইত্যাদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয় তেমনিভাবে শাক-সব্‌জীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি তার কারণ কারিগরি দক্ষতার স্বল্পতা, পরিবহণের স্বল্পতা, মানুষের অনুন্নত জীবনযাত্রা প্রণালী এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত মৌসুমী অঞ্চল হিসাবে এখানকার মাটি কৃষিকাজের জন্যে বিশেষভাবে উপযোগী। দেশের সর্বত্রই অনেক শাক-সব্‌জী উৎপাদিত হয়, তবে কিছু কিছু জেলা আছে যেখানে ভৌগোলিক কারণে কোন কোন শাক-সব্‌জী একটু বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত নিজেদের প্রয়োজন ও ভোগের জন্য বিশেষভাবে শাক-সব্‌জীর উৎপাদন করে। কেবলমাত্র আলুই কিছুটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাহারা শাক-সব্‌জীর জন্য আলাদা খামার করতে পারে না। তাই অনেক সময় বাড়ীর আনাচে কানাচে শাক-সব্‌জীর চাষ করা হয়। এতে যা উৎপাদন হয় তাতে অনেক সময় নিজেদের প্রয়োজনও মিটে না। আর যদি বেশি হয় তাহলে কৃষক প্রতিবেশীকে দেয় এবং গ্রামের হাটে বিক্রি করে। গ্রামের হাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্য এককগুলো বেপারী কর্তৃক শহুরে ভোক্তার জন্য আনীত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষক মৌসুম ভিত্তিক শাক-সব্‌জী উৎপাদন করে। যে সমস্ত জমি উঁচু অর্থাৎ যেখানে পানির অভাবে ধানের কিংবা গমের চাষ হয় না, যেসব ক্ষেত্রে শাক-সব্‌জী চাষ করা হয়।

কৃষক উৎপাদিত বিপণনযোগ্য শাক-সব্‌জী স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দেয় এবং যদি উৎপাদনের পরিমাণ অধিক হয় দূরে শহরাঞ্চলে কিংবা চাহিদা যেখানে বেশি, যেমন ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামের মত বড় শহরে চালান দেয়। বর্তমানে কৃষকদের মধ্যে আরেকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা

যায়, তা হলো কৃষক নিজের শাক-সবজীর সাথে অন্যান্য কৃষকদের শাক-সবজী কিনে লট ভর্তি করে চালান দেয়।

আবার কিছু কিছু লোক অবসর সময়ে মুনাফা লাভের আশায় কৃষকদের বাড়ীতে কিংবা ক্ষেতে গিয়ে ক্ষেতেই শাক-সবজী কিনে ফেলে (কুমিল্লা অঞ্চলে হচ্ছে) এবং পরবর্তীতে সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লাভ করে।

কিন্তু গ্রামের একদল লোক আছে যারা বেপারী নামে পরিচিত, তারা কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহগুলো নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত করে এবং পরবর্তীতে সেগুলো দূরবর্তী শহরগুলোতে রপ্তানি করে। বাংলাদেশে মাথাপিছু যতটুকু শাক-সবজী খাওয়া প্রয়োজন তা খাওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ বাৎসরিক মোট ভোগের জন্য যা প্রয়োজন সে তুলনায় উৎপাদন কম হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ শাক-সবজীর উপর তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। শহরাঞ্চলের কতিপয় লোক ছাড়া অন্যরা উচ্চ দামের জন্য শাক-সবজী নিয়মিত খেতে পাচ্ছে না। কারণ শহরাঞ্চলে শাক-সবজী আসতে আসতে খরচ বৃদ্ধি পায়।

কোন কোন ভূমি মালিক অন্যান্য কাজকর্মের সাথে জড়িত থাকে বলে তারা অধিকাংশ শাক-সবজীর জমি গরীব চাষীদের মধ্যে বর্গা ভিত্তিতে দিয়ে দেয়। শাক-সবজী উৎপাদনের পর চুক্তি অনুযায়ী বন্টন করা হয়। শাক-সবজী চাষ করতে প্রচুর শ্রমিক ও প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে একটি গ্রামীণ প্রবাদ আছে যা হলো "বাপ পুত তের নাতি তার লাইগ্যা পাতা খেতি"। অর্থাৎ যার পরিবারে অধিক সংখ্যক কর্মক্ষম লোক রয়েছে শাক-সবজীর চাষ তার জন্য উপযুক্ত। মূলধনের জন্য অনেক সময় কৃষকরা কৃষি সমবায় সমিতির শরণাপন্ন হয় এবং তা থেকে দাদন গ্রহণ করে শাক-সবজীর চাষ করে।

বাংলাদেশে উৎপন্ন শাক-সবজীর প্রকারভেদ ঃ বাংলাদেশে উৎপন্ন শাক-সবজীকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. শীতকালীন শাক-সবজী
২. বছরের অন্যান্য সময়ে প্রাপ্ত শাক-সবজী
৩. সারা বৎসর প্রাপ্ত শাক-সবজী

১. **শীতকালীন শাক-সবজীঃ** শীতকালেই সাধারণত অধিক পরিমাণে শাক-সবজী উৎপন্ন হয়ে থাকে। এবং শীতকালীন শাক-সবজীই একমাত্র টাটকা ও অকৃত্রিমভাবে পাওয়া যায়। শীতকালে উৎপাদিত শাক-সবজীর মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুটি, পালংশাক, লালশাক, লাউ, ঝিংগা, শশা, গাজর, টমেটো, শালগম, মূলা, শিম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২. **বৎসরের অন্যান্য সময়ে প্রাপ্ত শাক-সবজীঃ** বৎসরের অন্যান্য সময় পাওয়া যায় এমন শাক-সবজীর মধ্যে পটল, ঢেঁড়শ, মিষ্টি আলু, কচু, কুমড়া, বরবটি, চিচিংগা, কাকরোল, শসা, পুঁইশাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. **সারা বৎসর প্রাপ্ত শাক-সবজীঃ** বাংলাদেশে এমন কিছু শাক-সবজী আছে যা সারা বৎসর উৎপাদিত হয় সেগুলোর মধ্যে পেঁপে, করলা, বেগুন, কাঁচকলা প্রধান।

উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহঃ বাংলাদেশের সকল জায়গায়ই কম বেশি শাক-সবজীর চাষ করা হয়। তবে কিছু কিছু অঞ্চল আছে সেখানে প্রাকৃতিক কারণে বিশেষ বিশেষ শাক-সবজী বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়। সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত বেগুনের জন্য ময়মনসিংহের গফরগাঁও খ্যাতি অর্জন করেছে। পটল পাবনা জেলায়; মুখী কচু চট্টগ্রাম ও সিলেটে ; সীম ও কাকরোল বরিশালে; পেঁপে, কাঁচকলা যশোরে; বেগুন, লাউ, ঢেঁড়স ফরিদপুরে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া শশা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, লাউ, সীম, পুঁইশাক ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়।

পিয়াজ, ক্ষীরা, বরবটি, চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, ঝাল মরিচ, ঝিংগা, চিচিংগা, পালংশাক লাল-শাক, ডাটা, টমেটো ইত্যাদি প্রায় সকল জেলাতেই কমবেশি উৎপাদিত হয়।

তালিকা - ১

"বাংলাদেশের শাক-সবজীর উৎপাদন" (আলু অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি)

(হাজার টন)

শাক-সবজী	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩
কুমড়া	৫৯	৫৬	৫৭	৫৯	৬২
বেগুন	১৭৬	১৭৯	১৭৫	১৮২	১৮১
ঢেড়শ	৮	৭	৭	৭	৮
ঝিংগা	১৪	১৩	১৪	১৬	১৭
করলা	১৫	১৩	১৩	১৪	১৫
কচু	৪৬	৪৪	৪৯	৪৯	৫৬
পুঁইশাক	৬	৭	৮	১০	১১
চিচিংগা	১০	১০	১০	৯	৯
শশা	১২	১২	১২	১২	১২
বাঁধাকপি	৪৯	৫১	৫৪	৫৭	৫৭
ফুলকপি	৪১	৪৩	৪৬	৫১	৫১
লাউ	৩৬	৩৪	৪০	৪৪	৪৬
টমেটো	৬৪	৬৫	৬৪	৬৪	৬৯
মূলা	৯৮	৯৯	১০৫	১০৫	১১৩
সীম	২৬	২৭	২৬	১২৭	১২৮
পটল	১৮	১৮	২০	২১	২১
অন্যান্য	৫৪	৮৫	৮৬	১০৩	১০৫
মোট	৭২৮	৭৮৫	৮৭৩	৮১৬	৮৬৩

সূত্রঃ বি. বি. এস.

বাংলাদেশের শাক-সব্জীর বন্টন প্রণালী

সাধারণত গ্রামাঞ্চলেই শাক-সব্জীর উৎপাদন হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষ সেগুলো নিজস্ব উদ্যোগে শহরে নিয়ে আসে। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বন্টন প্রণালীতে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শাক-সব্জী উৎপাদকগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত পণ্য গ্রামের হাটে নিয়া যায় এবং স্থানীয় ভোক্তারা তা কিনে নেয়। অন্যদিকে কিছু কিছু বেপারী আছে যারা একসাথে অনেকগুলো শাক-সব্জী কিনে এবং শহরাঞ্চলের বাজারে শহুরে খদ্দেরদের নিকট অধিক দামে বিক্রি করে। আবার অন্যদিকে গ্রাম থেকে যে সমস্ত কৃষক শহরাঞ্চলে শাক-সব্জী অধিক মূল্য পাবার জন্যে নিয়ে আসে সেগুলো সাধারণত আড়তদারদের গদীতে পাইকারী দরে বিক্রি করে। এবং পরবর্তীতে সেগুলো আড়তদারদের নিকট থেকে পাইকারী দরে স্থানীয় ব্যাপারীরা কিনে নেয় এবং শহরের উল্লেখযোগ্য বাজারে অধিক দামে বিক্রি করে।

অন্যদিকে আড়তদারগণ দুই দিক থেকে কমিশন পেয়ে থাকে, প্রথমত কৃষক, ব্যাপারী কিংবা বিক্রেতার নিকট থেকে দ্বিতীয়ত ক্রেতা বা ব্যাপারীর নিকট থেকে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের কাঁচামালের ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে যাদের প্রধান কাজ হলো শাক-সব্জী উৎপন্ন হবার পর পরই তা কিনে ফেলা এবং পরবর্তীতে অধিকমূল্য পাবার জন্য ভিন্ন জেলায় লট ভর্তি করে চালান দেয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা থেকে চট্টগ্রাম জেলায় ফুলকপি, বাঁধাকপি লট ভর্তি করে চালান দেয়া হয়। যা কিনা বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলের শাক-সব্জীর বন্টন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। নিম্নে গ্রাম ও শহরে শাক-সব্জীর বন্টন প্রণালী সংক্রান্ত একটি ছক প্রদান করা হলো ঃ

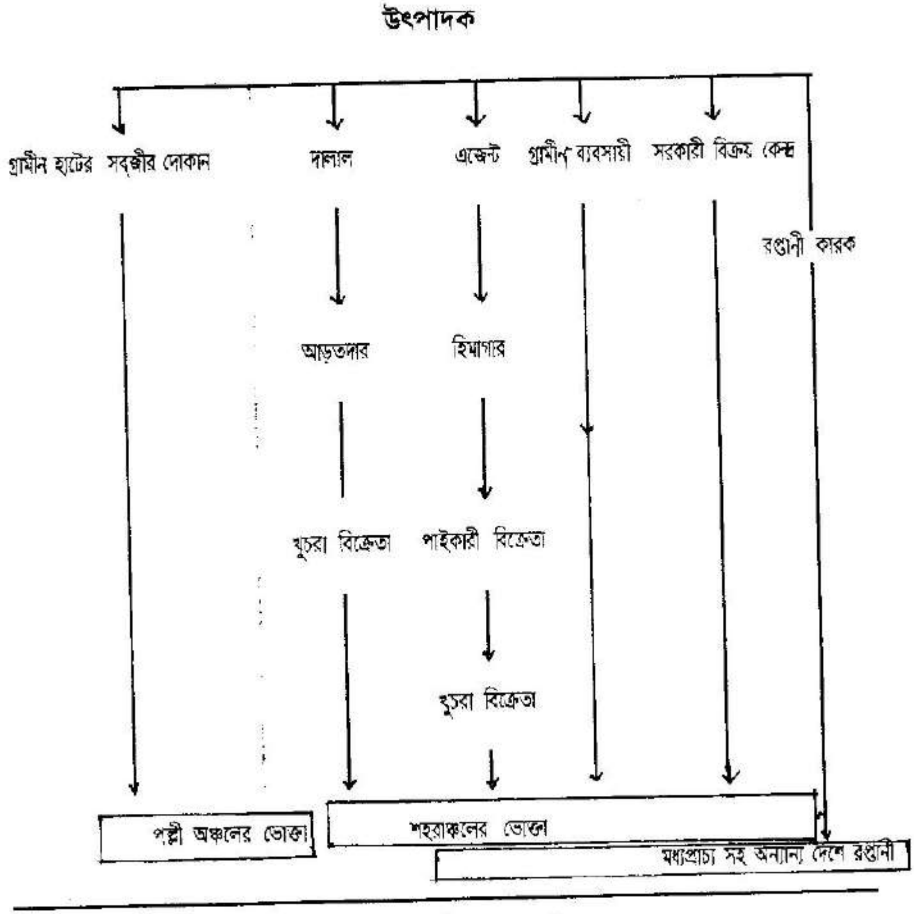

চিত্রঃ শাক-সবজীর বণ্টন প্রণালী

শহরে শাক–সবজির বণ্টনে বেশ কিছু মধ্যস্বত্বভোগী দেখা যায়। শহরে মধ্যস্থ কারবারীর মাধ্যমে ভোক্তার নিকট শাক–সবজী পৌছে। আর গ্রামীন ব্যবসায়ীরা শহরের নিকটস্থ এলাকা থেকে নিজে মাথায় করে কিংবা রিক্সাযোগে শহরে শাক–সবজী নিয়ে আসে। ভোক্তারা প্রাতঃকালীন বা সন্ধ্যাকালীন সময়ে এ সমস্ত শাক–সবজী ক্রয় করে থাকে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে খুচরা ব্যবসায়ীরা সরাসরি ক্রয় করে ভোক্তার নিকট বিক্রি করে। শাক-সবজীর বাজারজাতকরণে উৎপাদনকারীর নিজের সরাসরি বিক্রয় বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত।

বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্য

শাক-সবজীর বাজারজাতকরণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধানঃ

১. **সরবরাহের উঠানামা ঃ** মৌসুম ভেদে সব্জীর সরবরাহের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদনের বিভিন্নতার দরুন শীতকালে শাক-সব্জীর সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং গ্রীষ্মকালে হ্রাস পায়। মজার ব্যাপার হলো শীতকালে শাক-সব্জীর সরবরাহ বেশি থাকলেও দাম বেশি থাকে। সব্জী তখন টাটকা ও ভালো স্বাদের হয় বলে এরূপ হয়ে থাকে। এক সমীক্ষার বিবরণে জানা যায় যে, গ্রীষ্মকালে শাক-সব্জী তেমন একটা টাটকা থাকে না। এবং এগুলোর স্বাদও শীতকালের মত থাকে না। তাই গ্রীষ্মকালে শাক-সব্জীর সরবরাহ কম থাকাসত্ত্বেও দাম কম থাকে।

২. **মূল্যের তারতম্য ঃ** প্রাকৃতিক কারণ ও সঠিক বাজার তথ্যের অভাবের দরুন পাইকারী বাজারে শাক-সব্জীর মূল্য উঠানামা কম বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু সব্জীর ভোগ চাহিদা প্রায় একই পর্যায়ে থাকে বলে মূল্য সরবরাহের সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পায়।

৩. **পরিমাপ পদ্ধতি ঃ** পাইকারী বাজারে সব্জী বিক্রয়ে তিন রকমের পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যথাঃ

ক. লটে বিক্রয়

খ. গননা এবং আঁটির মাধ্যমে বিক্রয়

গ. ওজন দিয়ে বিক্রি।

তবে স্থানীয় নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করেই শাক-সব্জী বিক্রি বেশি হয়ে থাকে।

৪. **দাদন ঃ** বাংলাদেশে সব্জী উৎপাদনে আড়তদারগণ সাধারণ কৃষকদেরকে মৌসুম ভিত্তিক (আড়তদারদের গদিতে মাল দেয়ার প্রেক্ষিতে) দাদন দিয়ে থাকে। (এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা রাজগঞ্জ বাজারের আড়তদার মোহাম্মদ আলী ও সুলতান মিয়ার অভিমত হলো দাদনের ফলে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের নিজের পায়ে দাড়াবার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।)

৫. **ধারে বিক্রি ঃ** বাংলাদেশে আড়তদারী ব্যবসায়ে ধারের প্রথা চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদেরকে আড়তদারগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে শাক-সব্জী সরবরাহ করেন তবে এতে আড়তদার তার কমিশনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন।

৬. **মূল্য নির্ধারণ ঃ** শাক-সব্জী মূল্য সাধারণত পাইকারী এবং খুচরা উভয় বাজারেই দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। শাক-সব্জীর মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি এর সরবরাহের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির কারণেও শাক-সব্জীর মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে ; সকালে বিকালে মূল্যের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

৭. পানি ছিটানো ঃ শাক-সবজীকে সতেজ রাখার জন্য ব্যবসায়ীরা সাধারণত পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। পানি নিয়মিত না ছিটালে শাক-সবজী শুকিয়ে নষ্ট হয় যেতে পারে।

বাজারজাতকরণ ব্যয়

বাংলাদেশে শাক-সবজীর দাম স্বাধীনতার পর থেকে প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত শাক-সবজীর মূল্যে একটি উর্ধ্বগতি ভাব পরিলক্ষিত। জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের আয়ের বন্টন পরিবর্তিত হয়েছে। সে হিসাবে মানুষ আগের তুলনায় অধিক শাক-সবজী ভোগ করছে। ফলে শাক-সবজীর দাম ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। সাধারণত শীতকালে শাক-সবজীর দাম বেশি থাকে এবং গ্রীষ্মকালে কম থাকে।

যে কোন সবজীর জন্য ভোক্তা যে মূল্য প্রদান করে, এর কতভাগ উৎপাদক পায়, কতভাগ ফড়িয়া ও দালাল শ্রেণী পায় আর কতভাগ খুচরা ব্যবসায়ী পায় তার সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কৃষিবাজার বিভাগ কর্তৃক সত্তর দশকে বাংলাদেশে শাক-সবজীর উপর যে জরিপ চালানো হয়েছিল তাতে দেখা যায় (ফুলকপি, বেগুন) ভোক্তারা যে মূল্য দেয় তার ৩৪ থেকে ৭১ শতাংশ কৃষক উৎপাদক পেয়ে থাকে। অন্যদিকে শাক-সবজী বাজারজাতকরণে বেপারী, পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়তদার, গুদামঘর, পরিবহণ সংস্থার অংশ হলো ৫ থেকে ৩০ শতাংশ। দেশে প্রত্যেক বৎসর কৃষি উপকরণ যেমন সার, বীজ, ঔষধের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যান্য বাজারজাতকরণ আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর ব্যয় যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু শাক-সবজী বাজারজাতকরণে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে অনবরত।

শাক-সবজীর বাজারজাতকরণে সরকারী সংস্থার ভূমিকাঃ বাংলাদেশে শাক-সবজী বাজার-জাতকরণের জন্য আলাদা কোন সরকারী সংস্থা নেই তবে কৃষিপণ্যের সাথে শাক-সবজী বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশে চারটি বিভাগে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিজস্ব খামারে বিক্রয়কেন্দ্র চালু আছে। ১৯৬৮ সাল থেকে এগুলো কৃষিপণ্যসহ শাক-সবজী বাজারজাত করে আসছে। তাছাড়া ঢাকায় কর্পোরেশনের তিনটি (ঢাকা কলেজের বিপরীত পার্শ্বে, শ্যামলী ও গুলশানে) বিক্রয়কেন্দ্র কৃষিপণ্য বিক্রির কাজে লিপ্ত।

এই সকল বিক্রয় কেন্দ্রে কৃষি পণ্যের মধ্যে যে সকল শাক-সবজী বিক্রি হয় তার মধ্যে ডাল, পিয়াজ, পেঁপে, পটল, বেগুন, ঢেঁড়শ, শশা, বরবটি, কুমড়া, চিচিংগা, করলা, লাউ প্রভৃতি প্রধান।

বিক্রয়কেন্দ্রের শাক-সবজী সাধারণত কর্পোরেশনের নিজস্ব খামার বা স্থানীয় পাইকারী বাজার (কাওরান বাজার) হতে সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পণ্যের বিক্রিমূল্য নির্ধারিত হয় প্রতিদিনের বাজার দর বিবেচনা পূর্বক। সাধারণত প্রতিদিনের পাইকারী মূল্যের সাথে ১০% হতে ১৫% যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়।

নিম্নে কতিপয় শাক-সবজীর সরকারী এবং বেসরকারী মূল্য প্রদান করা হল। যা ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংগৃহীত হয়েছে (মূল্য-টাকায়; ওজন কেজি প্রতি)

তালিকা - ২

শাক-সবজীর মূল্য (কে. জি প্রতি)

শাক-সবজীর নাম	সরকারী মূল্য	বেসরকারী মূল্য
লাল শাক	৫.২৫	৫.০০
কচুর লতি	৫.১৭	৪.৬৮
মিষ্টি কুমড়া	৪.১৪	৩.৫০
বরবটি	৮.৪৩	৭.৫০
করলা	১০.৬৭	৯.১৮
পটল	৯.২৯	৮.৫৩
কাঁচা পেঁপে	৬.২৯	৫.৪৬

উৎসঃ মার্কেটিং সমস্যা ও সম্ভাবনা "জাতীয় মার্কেটিং সেমিনার ৮৫"
মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খোলা বাজারে শাক-সবজী যেখানে সেখানে বিক্রি হয়ে থাকে। এ সকল পণ্যের ওজন ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং দ্রুত পচনশীল। সাধারণ বিক্রেতারা এগুলো বিক্রয়ের পূর্বে অহরহ পানি ছিটানো বা ওজনের কারচুপি করে থাকে। কাজেই অসাধু ব্যবসায়ীদের পণ্য কম মূল্যে বিক্রয় করলেও লোকসান হয় না। পক্ষান্তরে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে এ ধরনের পানি ছিটানো ও ওজনের কারচুপি অনুপস্থিত।

তাছাড়া শাক-সবজীর বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থার বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো ঃ

১. নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে সংরক্ষণাগার তৈরি করে শাক-সবজীর দ্রুত পচনশীলতা রোধ করা।

২. বিশেষ মোড়কীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৩. এবং বিদেশে শাক-সব্জী রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা।

বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ

শাক-সব্জী বাজারজাতকরণে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

১. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের মৌলিক সমস্যাসমূহ
২. আনুষঙ্গিক সমস্যাবলী

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের মৌলিক সমস্যাসমূহ

ক. চাহিদা পূর্বানুমান ঃ শাক-সব্জীর বাজারজাতকরণে কৃষকের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে ভবিষ্যতে উৎপাদিত শাক-সব্জীর চাহিদা কিরূপ হবে তা নিরূপণের ব্যর্থতা।

খ. ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ঃ শাক-সব্জী যেহেতু একটি কৃষিজাত পণ্য তাই এর বাজারজাতকরণেও উক্ত সমস্যাটি প্রকট। শাক-সব্জীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় যে পরিমাণ মুনাফার আশায় বিনিয়োগ করা হয় সে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয় না। এর অন্যতম কারণ উৎপাদন খরচ বেশি এবং উৎপাদন সময় দীর্ঘস্থায়ী।

আনুষঙ্গিক সমস্যাবলী

১. **পরিবহণ সমস্যা ঃ** বাংলাদেশে যে কোন সামগ্রী বাজারজাতকরণে পরিবহণ সমস্যাকে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। শাক-সব্জী পচনশীল পণ্য তাই এগুলোর উৎপাদনের স্থান থেকে ভোগের স্থানে প্রেরণ করার জন্য সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা আবশ্যক। বাংলাদেশে অধিকাংশ কৃষিপণ্যই নৌ-পথে পরিবাহিত হয়, কিন্তু এদের অনুন্নত কার্যপ্রণালীই শাক-সব্জী বাজারজাতকরণের সমস্যা। তাই ইঞ্জিন চালিত নৌকার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা যেতে পারে। কতিপয় অঞ্চলে অবশ্য ট্রাকও ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট শাক-সব্জী চালানে ট্রাক ব্যবহার করা হয়। সব্জী বাজারজাতকরণে প্রচুর সময় লাগে। ফলে বিভিন্ন ঝুঁকিও বিদ্যমান থাকে।

২. **হিমাগারের অপ্রতুলতা ঃ** সব্জী তরতাজা রাখার জন্য এবং পচনশীলতা থেকে রক্ষা করার জন্য হিমাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শাক-সব্জী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে তেমন কোন বিশেষায়িত হিমাগার নেই। যাও দুই/একটি আছে তাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট লেগেই থাকে।

৩. **পর্যায়িতকরণ ঃ** বাংলাদেশে দরিদ্রতা ও অশিক্ষার দরুন শাক-সবজীর পর্যায়িতকরণ ব্যবস্থার সঠিক উন্নয়ন ঘটেনি। সবজীর পর্যায়িতকরণ বা গ্রেডিং এর সুযোগ না থাকায় সবজী উৎপাদকরা তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন আকার ও গুণাবলীর সবজী ভালো হোক আর মন্দ হোক একই দরে বিক্রি করা হয়। তাই কোন ব্যবসায়ী বেশি মুনাফা পায় আবার কেউ কম মুনাফা পায়। তাই সবজীর গ্রেডিং বাজারজাতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

৪. **সেলামী ঃ** গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে সবজী আনার পথে বিভিন্ন বেপারী বা আড়তদারকে চেক পোস্ট ইত্যাদি জায়গায় সেলামী (টাকা) দিতে হয়। এই পন্থায় ব্যবসায়ী এবং সবজীর মালিক উভয়কে হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয়, ফলে শাক-সবজীর দামের উর্ধ্বগতি ও তারতম্য ঘটে।

৫. **পরিমাপে গলদ ঃ** শাক-সবজী পরিমাপ করার অনুমোদিত কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং প্রতারণার শিকার হয়।

৬. **অনুন্নত বাজার ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশে কতিপয় শহরে পৌর বাজার ছাড়া তেমন কোন বাজার নেই। তাছাড়া শহরাঞ্চলের অধিকাংশ বাজারই অনুন্নত। দেশের কোথাও নীলামে সবজী বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে উৎপাদক বিক্রেতা আড়তদার প্রভৃতির মাধ্যমে সবজী বিক্রি করে। বৃষ্টির দিনে বাংলাদেশের বাজারগুলোর অবস্থা করুন হয়ে যায়, প্যাক, কাঁদায় সমস্ত পরিবেশ একেবারে দুর্বিসহ হয়ে উঠে, যার ফলে ভদ্র ক্রেতাগণ বাজারে প্রবেশ করে না। অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবজির জন্য স্থায়ী কোন দোকান নেই। মূল্য তালিকা নেই, প্যাকেট প্রথা চালু নেই ফলে ক্রেতাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বর্তমানে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টন শাক-সবজীর প্রয়োজন। অথচ এখানে উৎপাদিত হয় মাত্র ১৭ লক্ষ টন। সুতরাং দেখা যায় যে, আমাদের মোট প্রয়োজনের তুলনায় শাক-সবজীর ঘাটতির পরিমাণ ৬৬%। অন্য এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায় ১৯৭৮-৭৯ সালে ৩ লক্ষ একর জমিতে মোট শাক-সবজী উৎপাদিত হয়েছে ৭.৭২ লক্ষ টন। ১৯৮০-৮১ সালে ৪ লক্ষ একর জমিতে মোট উৎপাদিত শাক-সবজীর পরিমাণ ছিল ৮.৩২ লক্ষ টন।

২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে শাক-সবজীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ শাক-সবজী পুষ্টিহীনতা দূর করে এবং মানব দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪টি জেলায় আলু সংরক্ষণের জন্য ৯১টি এবং অন্যান্য পণ্যের ১৯টি হিমাগার আছে। প্রয়োজনের তুলনায় এটা অত্যন্ত সীমিত। তাই হিমাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। দ্রুত পচনশীলতা রোধকল্পে ট্রেনে হিমায়িত ওয়াগান ব্যবস্থা করলে শাক-সবজীর গুণাগুণ বজায় থাকে এবং তা বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লাভ করা যায়।

ঢাকা শহরে এক জরিপে দেখা গেছে যে শতকরা ৫জন ক্রেতা সরাসরি বাজারজাতকরণ, ৮৫% খুচরা দোকানের মাধ্যমে এবং ৫% আড়তদার এবং বেপারীর মাধ্যমে ক্রয় করে থাকে। ঢাকা শহরে ৬০টি খুচরা কাঁচামালের বাজার আছে এবং ১০টি শাক-সবজীর পাইকারী বাজার আছে। ঢাকার শাক-সবজীর সবচেয়ে বড় বাজারগুলো হলো শ্যামবাজার, কাওরান বাজার, সদরঘাট ও যাত্রাবাড়ী।

বাংলাদেশে মৌসুমী বায়ু উপযোগী আবহাওয়া এবং উর্বর মৃত্তিকা ও পানি সেচের সুব্যবস্থার দরুন এখানে শাক-সবজীর উৎপাদন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। উপযুক্ত কারিগরি দক্ষতা সূচীত হলে ভবিষ্যতে শাক-সবজীর নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর পরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।

সারমর্ম

উপরিউক্ত আলোচনা, সমালোচনা ও তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শাক-সবজীর উৎপাদন বন্টন, বাজারজাতকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা বাংলাদেশে এখনো তেমন সমৃদ্ধি লাভ করেনি। অধিকন্তু উৎপাদনে অমনোযোগিতা, বন্টন ও ভোগে অনুন্নত কলা-কৌশল এবং বাজারজাতকরণে রয়েছে বিবিধ সমস্যা।

বাংলাদেশে শাক-সবজীর প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, কারণ বেঁচে থাকতে হলে আমাদের দেহে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। তার প্রধান অংশই শাক-সবজী থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রতিদিন সকলেরই প্রয়োজন অনুযায়ী শাক-সবজী খাওয়া উচিত।

বাংলাদেশের কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত। একদিকে দারিদ্র্যতার দরুন সঠিকভাবে শাক-সবজীর উৎপাদন করতে পারছে না, অন্যদিকে অশিক্ষার দরুন শাক-সবজীর গুরুত্ব অনুভব করতে পারছে না। তাই এই উভয় সমস্যা থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে হবে। তার জন্য চাই মানুষের মনোভাব ও রুচির পরিবর্তনসহ কৃষকদের সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এবং এতেই সফলতা নিশ্চিত। তাছাড়া শাক-সবজী পচনশীল হওয়ায় কৃষক অল্প পরিমাণে উৎপাদন করে এবং দর কষাকষির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কম মূল্যে শাক-সবজী বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তাই তাদেরকে সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য চালানোর ও বাজারজাতকরণ করার সুপারিশ করা যেতে পারে। শাক-সবজীর বাণিজ্যিক ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। ঢাকা শহরে ৮০% শাক-সবজী আসে নৌকা ও লঞ্চ যোগে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকায় শাক-সবজী আসতে সময়

লাগে ১৫ ঘন্টা থেকে ৫দিন। তাই উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার একান্ত দরকার। উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা শাক-সবজীর বাণিজ্যিক ক্ষেত্র প্রসার করতে পারে।

শাক-সবজীর আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করার জন্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে সহজ শর্তে ঋণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাকে শাক-সবজী প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে। শাক-সবজীর পাইকারী বাজারের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে এবং খুচরা বাজার ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং তার জন্য সরকার এবং জনসাধারণ উভয়কে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

শাক-সবজীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের জন্য শহরাঞ্চলের বাজারগুলোর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে সংস্কার করতে হবে, বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

শাক-সবজীর উপর প্রামান্য চিত্র তৈরি করে এর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণ প্রণালী গ্রামগঞ্জের মানুষের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। খোলা বাজারে শাক-সবজী বাজারজাতকরণে কারচুপি প্রতিরোধ করতে হবে। পরিমাপ ব্যবস্থার আধুনিক নিয়ম পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে।

মোট কথা এই যে, দেশের জনগণের দারিদ্র্যতার কারণে পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বল্প ব্যয়ে কিছুটা উদ্যোগ নিলে একদিকে শাক-সবজীর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিহিনতাজনীত সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে এবং অন্যদিকে তা কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, যদি কৃষকরা সমবায় ভিত্তিতে বর্ধিত শাক-সবজীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ফল ও ফলজাত দ্রব্য

ভূমিকাঃ বাংলাদেশে বার মাসেই বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপন্ন হয়। ফল উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু উপযোগী। কিন্তু অধিকাংশ ফল যদিও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভব তথাপি আমাদের দেশের কৃষকরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই মূলত ফল উৎপাদন করে থাকে। অথচ আমাদের দেশে ফল উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। চাহিদার তুলনায় কৃষকরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে অধিক ফল উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। সুখের বিষয় এই যে, বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা কিছু কিছু ফল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করার চেষ্টা করছে কিন্তু বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য তারা ন্যায্য মূল্য পায় না। বিপুল পরিমাণ ফল পচে নষ্ট হয়। তাই তারা উৎপাদনে উৎসাহ পায় না।

আমাদের দেহের পুষ্টির জন্য দৈনিক মাথাপিছু ৩ আউন্স ফলমূল গ্রহণ করা দরকার। সেই তুলনায় খুব কম পরিমাণ ফলমূল আমরা গ্রহণ করতে পারি। ১৯৮০-৮১ সালে মোট ৩.৫০ লক্ষ একরে মাত্র চৌদ্দ লক্ষ টন ফলমূল উৎপাদিত হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রায় ৩০০ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ১২.৫০ লক্ষ টন ফলমূল উৎপাদিত হয়। অথচ আমাদের বাৎসরিক চাহিদা ১৬-১৮ লক্ষ টন।

বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা ও খুলনা জেলাতে আম বেশি উৎপাদিত হয়। সিলেটের শ্রীমঙ্গল ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎকৃষ্ট আনারস উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া দেশের সব অঞ্চলেই কমবেশি আনারস উৎপাদিত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁঠাল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাতে উৎপাদিত হয়। ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় লিচু ভাল উৎপাদিত হয়। ঢাকার মুন্সিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও বরিশাল জেলাতে কলার চাষ ভাল হয়। তাছাড়া পেঁপে সব জেলাতেই উৎপাদিত হয়। কমলা সিলেটে ভাল উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সব জেলাতেই কমবেশি বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ফল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশীয় জনগণের পুষ্টির অভাব পূরন্ ও বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। ১৯৮৫-৮৬ সনে বাংলাদেশ কোন কোন দেশে, কি কি ফল ও ফলজাত দ্রব্য রপ্তানি করেছে তার একটি হিসাব নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

তালিকা – ১

বাংলাদেশের ফল ও ফলজাত দ্রব্যের বৈদেশিক ক্রেতা

ফলের ও ফলজাত দ্রব্যের নাম	দেশের নাম
টাটকা ফল, আচার, চাটনী, চাক চাক করে কাটা ফল, ফলের রস, জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, মার্মালেড, কাসুন্দি, সস, ভিনেগার।	সৌদিআরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, কাতার, ওমান, যুক্তরাজ্য, ফেডারেল জার্মানি, সুদান।

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

১৯৭৮–৮৬ পর্যন্ত কি পরিমাণ টাটকা ফল বিদেশে রপ্তানি হয়েছে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো :

তালিকা – ২

(০০০ টাকা)

ফল রপ্তানি থেকে আয়

সন	১৯৭৮–'৭৯	'৭৯–'৮০	'৮০–'৮১	'৮১–'৮২	'৮২–'৮৩	'৮৩–'৮৪	'৮৪–'৮৫	'৮৫–'৮৬ জুলাই–ডিসেম্বর
রপ্তানি	২৭২	৬২৫	৪৯৮	১৫৬০	৪৩৫৮	৫৪৩৫	৭৯৩৪	১৩৩৫৯

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভিন্ন ধরনের ফলমুল উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়ক বলে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালালে ভবিষ্যতে এর রপ্তানি থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আশা করা যায়। যা আমাদের অর্থনীতিকে আরও জোরদার করতে সহায়তা করবে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ফলের উৎপাদন, পুষ্টি, বিপণন ব্যবস্থা, বিপণন সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আম

ভূমিকা : বাংলাদেশের অর্থকারী ফল আম। আমকে ফলের রাজা বলে। এটা একটি সুস্বাদু ফল। জনৈক ফরাসী পর্যটক বলেছেন, "আমের চেয়ে কোন মিষ্টান্ন সুস্বাদু নয়।" আম মৌসুমী ফলের অন্তর্গত। আমের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম "ম্যাংজিফেরা ইণ্ডিকা" (Mangifera indica)। চীনা ভাষায় ম্যাংকো।

ভারতবর্ষের পশ্চিম বঙ্গের মালদহ অঞ্চলের এবং মুর্শিদাবাদে আমের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। আমাদের দেশে রাজশাহী, নবাবগঞ্জকে আম উৎপাদনের আদি অঞ্চল বলে। সারা পৃথিবীতে ১৪টি দেশে প্রায় ৪ হাজার জাতের আম পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ৬ হাজার ৮০ একর জমিতে প্রায় ৩ লক্ষ টন আম উৎপাদিত হয়। প্রতি বৎসর আমরা আম হতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। আম উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশ হলো ভারত, পাকিস্তান, ব্রাজিল, মেক্সিকো, জাভা, বার্মা, হাওয়াই, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ আম উৎপাদনে ভাল অবস্থানে আছে। আমাদের দেশে আমের প্রচুর চাহিদা ও উৎপাদনের সম্ভবনা থাকাসত্বেও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলোর দিকে আমরা সচেতন নই। যদি আম চাষের প্রতি আমরা গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি দেই তবে ভবিষ্যতে এর আন্তর্জাতিক বাজার আরও প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা যায়।

আমের ব্যবহারিক গুরুত্ব

খাদ্যমানের দিক দিয়ে আম উচ্চমানের ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম আমের মধ্যে ভিটামিন "সি" ৩০ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়মে ১০ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৫ মিলিগ্রাম আছে। ইহা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

আমের চাষ পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধারণা

আমাদের দেশে প্রধানত ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঘরের পার্শ্বে বা বাড়ির পিছনে গৃহস্থগণ আমের গাছ রোপণ করে। তবে কয়েকটি জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও আমের চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত মাঘের শেষে আমের ফুল হয়। আম উৎপাদনের জন্য বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ২৪-২৭ সেলসিয়াস প্রয়োজন। নিম্নে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে গড় তাপামাত্র দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৩

অঞ্চলভিত্তিক গড় তাপমাত্রা

পশ্চিমাঞ্চল	সেলসিয়াস	পূর্বাঞ্চল	সেলসিয়াস
রাজশাহী	২৬.০°	সিলেট	২৪.৭°
যশোর	২৫.৮°	চট্টগ্রাম	২৫.০°
দিনাজপুর	২৫.৫	কুমিল্লা	২৫.৫°

উপরিউক্ত সূচী থেকে দেখা যায় রাজশাহী অঞ্চল আম চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত অঞ্চল।

বিভিন্ন জাতের আম

ফলনের সময় অনুসারে আমকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিম্নে সেগুলো দেয়া হলো ঃ

১. **আগামজাত ঃ** গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাত, ক্ষুদিঁখিরসা, অমৃত ভোগ।

২. **নাবীজাত ঃ** ফজলি, আশ্বিণা, কুমাপাভারী, ভাদ্রী, মোহনভোগ।

৩. **মধ্যমজাত ঃ** ল্যাংড়া, বোম্বাই, খিরসা, বোম্বাই গোপালভোগ।

জেলাভিত্তিক আমের উৎপাদন

বাংলাদেশের সকল জেলাতেই কমবেশি আম উৎপাদিত হয়। তবে রাজশাহীর নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়, পাবনা, খুলনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলাতেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম উৎপাদিত হয়। রাজশাহী জেলায় সবচেয়ে বেশি ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম উৎপাদিত হয়। নিম্নে জেলাওয়ারী আমের চাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ৪

আম চাষের জমি ও উৎপাদন

জেলা	সন (১৯৮৩-৮৪)	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
রাজশাহী	১৯৮৩-৮৪ ইং	২৩,১৬০ একর	২২,১৩৪ টন
চট্টগ্রাম	,,	৪,৯৯০ ,,	১০,৬৩৯ ,,
পার্বত্য চট্টগ্রাম	,,	৩,২১৫ ,,	৩,৬৯০ ,,
কুমিল্লা	,,	৩,৭৩০ ,,	৩,০৮৫ ,,
নোয়াখালী	,,	৩,৭৪০ ,,	৩,২৯৭ ,,
ঢাকা	,,	৬,৯৭০ ,,	১১,৬০৮ ,,
সিলেট	,,	৫,৭৭০ ,,	১০,৮১১ ,,
ফরিদপুর	,,	৩,১৬০ ,,	১,০৭৩ ,,
জামালপুর	,,	৩,১২০ ,,	৬,৩২৮ ,,
কিশোরগঞ্জ	,,	২,২০০ ,,	৪,৩৫৫ ,,
ময়মনসিংহ	,,	২,৫৩৫ ,,	৪,৭৫৮ ,,
টাঙ্গাইল	,,	৫,১০৫ ,,	৫,৫১৬ ,,
বরিশাল	,,	৫,৯৭০ ,,	১২,৯৭১ ,,
খুলনা	,,	৩,৩৪০ ,,	৬,১৫১ ,,
কুষ্টিয়া	,,	২,৪২৫ ,,	৩,৫১৮ ,,
পটুয়াখালী	,,	১,০৮০ ,,	৪৩৭ ,,
বগুড়া	,,	৩,৫৬০ ,,	৬,৪৫১ ,,
পাবনা	,,	৪,৭৯০ ,,	৯,৪৩৭ ,,
যশোর	,,	৫,১৩০ ,,	৫,২৭০ ,,

সূত্রঃ বি, বি, এস

আমাদের দেশে আম বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

অধিকাংশ আম বাগানের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর মুকুল অবস্থায়ই স্থানীয় বেপারী, ফরিয়া বা আড়তদারের নিকট বাগান বিক্রি করে দেয়া হয়। বেপারী বা আড়তদার ফল পরিণত বয়স্ক হলে পেড়ে বাজারে বিক্রি করে। এভাবে মুকুল অবস্থায় বাগান বিক্রি হলে কৃষকরা খুব কম মূল্য পায় এবং আমের ফলন ভাল হলে ক্রয় মূল্যের পাঁচগুণ পর্যন্ত বেপারীদের লাভ হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বেপারীদের যথেষ্ট ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। যাদের উৎপাদন কম তারা আম পাকার সময় হলে বিক্রির উদ্দেশ্যে স্থানীয় বেপারী বা আড়তদারের নিকট নিয়ে আসে। এক মৌসুমে একটি আম বাগান ২–৩ বার হাত বদল হয়। ৫% মুকুল ফোটার সময় বিক্রি হয়। ৪০% মুকুল থেকে গুটি হওয়ার সময় বিক্রি হয়। ৫৫% ভাগ আম পাকার সময় বিক্রি হয়। অধিকাংশ বাগানের মালিক ধনী ও শহরবাসী বলে তারা রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকের ভয়ে মুকুল অবস্থায়ই বাগান বিক্রি করে ঝুঁকি এড়ায়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গাছ হতে আম পেড়ে রেল, নৌকা বা ট্রাক যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে খুচরা বা ফেরীওয়ালাদের নিকট বিক্রয়ের জন্য চালান দেয়া হয়। নিম্নোক্ত কারণে মালিকরা মুকুল অবস্থায় বাগান বিক্রি করে ফেলে ঃ–

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি বাগানের ক্ষতি হয় তবে আর্থিক লোকসান এড়ানো সহজ হয়।
২। আম বড় হলে রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব।
৩। মালিকদের পক্ষে খুচরা বিক্রি ও পরিবহন করা ঝামেলা।
৪। অর্থের আগাম পাওনার সুবিধা ভোগে আগ্রহী।

সাধারণত বৈশাখ মাসে বাজারে প্রচুর কাঁচা আম পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় মাসে পাকা আমে বাজার ভর্তি থাকে। গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাত, ল্যাংড়া ইত্যাদি জাতের আম এ সময় বাজারে বিক্রি হয়। আশ্বিন মাসে আশ্বিনা আম পাওয়া যায়। নিম্নে আম বাজারজাতকরণের বিভিন্নস্তর দেখানো হলো।

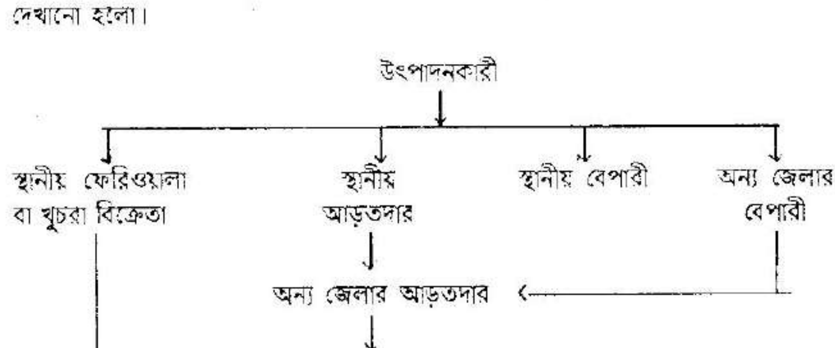

চিত্র ঃ আমের বন্টন প্রণালী

আমের বাজার দর

যেহেতু আম উৎপাদন আবহাওয়া নির্ভর সেহেতু বেপারী ও আড়তদারদের অনেক সময় প্রচুর লোকসানও হয়। তাই বাজারে আমের মূল্য খুব বেশি উঠানামা করে। পাইকারীতে ১০০ হিসাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। নিম্নে ১৯৮০–৮৬ পর্যন্ত ঢাকা ও নবাবগঞ্জের আমের বাজারদর দেখানো হলো (প্রতিশ টাকায়)

তালিকা – ৫

আমের গড় বাজারদর

বৎসর	আমের নাম	গড় বাজার (প্রতি'শ)	
		চাপাই নবাবগঞ্জ	ঢাকা
১৯৮০	গুটি আম	৮০	২০০
	গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাত	২৪০	৬০০
	ল্যাংড়া	২৭০	৭০০
	ফজলী	৫০০	১৫০০
[illegible]	ঐ	৫৫	১৬০
		১৮০	৩০০
		২০০	৫০০
		৪৫০	১,০০০
১৯৮২	ঐ	৭৫	১০০
		২১৫	৫০০
		২৫০	৭০০
		৫৮০	১৮০০
১৯৮৩	ঐ	৪৫	১৫০
		১৮০	৫০০
		২২০	৭০০
		৫০০	২,০০০
১৯৮৪	ঐ	১২৫	৬০০
		২৯৫	৮০০
		৩৫০	১,০০০
		৬০০	২,২০০
১৯৮৫	ঐ	১৩৫	৪০০
		২৭০	৭০০
		৩০০	৮০০
		৭২৫	২৫০০
১৯৮৬	ঐ	১৪০	৩০০
		২৫০	৭০০
		৩০০	৭৫০
		৫৫০	২,৫০০

সূত্র ঃ কৃষি বাজার বিভাগ

এখানে উল্লেখ্য যে, নবাবগঞ্জের বেপারী, ফড়িয়া বা আড়তদাররা ঢাকার তুলনায় কম লাভ করে। কারণ, ঢাকায় পরিবহন, সংরক্ষণ ও স্থানান্তর খরচ ও ঝুঁকি বেশি থাকায় খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বেশি দামে বিক্রি করে। নবাবগঞ্জ ঢাকার বাজার মূল্যের ৪০% কম পায়। ঢাকার আড়তদাররা ১০% কমিশন রেখে বেপারীদের নিকট আম বিক্রি করে দেয়।

আমের বিক্রয় ব্যয়

আমের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় পরিবহন ব্যয়, হাত বদল ব্যয়, আড়তদারের কমিশন, পচন বাবদ ছাড়, ব্যবসায়ীর লাভ ইত্যাদি ব্যয় হয়ে থাকে। যেমন রাজশাহী হতে ঢাকায় নৌকা, রেল বা ট্রাক যোগে আনা হয়। সাধারণত নৌকা ভাড়া, ট্রাক ও রেলের ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক। তাছাড়া নৌকায় আনলে আম ভাল থাকে। কিন্তু এতে সময় লাগে বেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ডাকাতি ইত্যাদির ঝুঁকি অধিক। নিম্নে আমের বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে মূল্য বিস্তারের তালিকা দেয়া হলো।

তালিকা - ৬

আমের মূল্য বিস্তার

সংখ্যা	বিবরণ	শতকরা গড় হার
১।	উৎপাদনকারীর প্রাপ্য মূল্য	৪৮.৯
২।	আম পাড়ার ব্যয়	১.৪
৩।	প্যাকিং ও পরিবহন ব্যয়	১৩.৬
৪।	আড়তদার কমিশন, নগর শুল্ক ও ঘাট খাজনা	১০.৯
৫।	পেবারীর লাভ	১১.০
৬।	খুচরা বিক্রেতার লাভ	১৪.২
৭।	ঢাকার বাজারে খুচরা মূল্য	১০০.০০

সূত্র : কৃষি বাজার বিভাগ

আমের পচননিরোধ

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের খাদ্য জীবাণুতত্ত্ব শাখা উষ্ণ পানির সাহায্যে আমের পচন নিরোধ পন্থা উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৭০ ভাগ আমের (গড়ে) পচনরোধ সম্ভব হয়। আম পাকার সময় হলে পেড়ে পরিষ্কার

পানিতে ধুয়ে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ৫৫° সেঃ তাপ প্রদান করে তাতে ৫ মিনিট রেখে খোলা বাতাসে শুকাতে হবে। এভাবে আমের পচননিরোধ করা যায়।

আমজাত দ্রব্যসমূহ

বাজারে কাঁচা আমের মোরব্বা, পাকা আমের আমসত্ব ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাছাড়া আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস লিঃ, নাহার গার্ডেন প্রাঃ লিঃ –এ রূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আম দ্বারা আমের জেলী, জ্যাম, জুস, আচার ইত্যাদি দ্রব্য তৈরি করে বাজারজাত করে থাকে। তারা নিজস্ব পরিবেশক নিয়োগ করে সারাদেশে আমজাত দ্রব্য বণ্টন করে থাকে। এ ছাড়া কিছু কিছু রপ্তানিও করে।

আমের বাজারজাতকরণের সমস্যা

আম বাজারজাতকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমের বাজার যথেষ্ট উন্নত হবে। নিম্নে আম বাজারজাতকরণে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তা আলোচনা করা হলো।

১. **পরিবহন সমস্যা ঃ** আম বাজারজাতকরণে প্রধান সমস্যা হলো পরিবহন সমস্যা। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকায় ও অন্যান্য অঞ্চলে আম আসে। সময়মত সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা করা যায় না বলে আম অনেক বেশি পরিমাণে পচে যায়। যেমন রাজশাহী হতে ঢাকায় আম আনতে লঞ্চ, স্টিমারের ব্যবস্থা নাই। তাই সড়ক বা রেলপথে পরিবহন করতে হয়। ট্রাকে করে আম আনলে পথে ফেরীর যান্ত্রিক গোলযোগে, বিলম্বতা, ট্রাফিক জ্যাম, অথবা রাস্তা খারাপের জন্য আমের উপর চাপ ইত্যাদি অসুবিধা পোহাতে হয়। আবার রেল পথে মাল বুক করা, উঠানো নামানো, বিভিন্ন চাঁদা, রেল কর্মচারীর বখরা ইত্যাদি প্রদান করতে হয়। তবে নৌকাই আম পরিবহনের সুন্দর ব্যবস্থা। এতে আম কম পচে। এ ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো সময় বেশি লাগে, সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালানীদের দৌরাত্ম্য, জলদস্যুদের আক্রমণ ইত্যাদি। ট্রেনে ১২% ট্রাকে ৫%, নৌকায় ১৫% পচে। সুতরাং পরিবহন নিশ্চিত করে আমের পচনরোধও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা উচিত।

২. **গুদামজাতকরণ সমস্যা ঃ** আম পেড়ে কিছু দিন গুদামজাত করে রাখতে হয়। কিন্তু, বাগান এলাকায় গুদাম নেই বলে পাড়ার সাথে সাথে বণ্টন করতে হয়। ফলে অনেক আম নষ্ট হয়।

৩. **পরিবহনে পথের জটিলতা ঃ** বিভিন্ন চেকপোস্ট, অবৈধ চাঁদা, রেলে উঠানো নামানোর সময় কুলিদের বেশি পারিতোষিক ইত্যাদি দেয়ার জন্য মালিকদের সাথে অনেক সময় কথা–কাটাকাটিতে সময় নষ্ট হয়। কুলির সর্দার খুশি না হওয়া পর্যন্ত আম ছাড়বে না। এ সমস্ত জটিলতার জন্য প্রচুর সময় অপচয় হয়। ফলে একদিকে খরচ বেশি পড়ে অন্যদিকে আম নষ্ট হয়।

৪. **সুষ্ঠু বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব ঃ** বিক্রয় ব্যবস্থায় দেখা যায় কয়েক হাত বদল হয়। ফলে আমের মূল্য সাধারণ ভোক্তাদেরকে বেশি দিতে হয়।

৫. **প্রশিক্ষণের অভাব ঃ** কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতিতে আম চাষে অজ্ঞ। অর্থাৎ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান না থাকায় একদিকে কৃষকরা বেশি উৎপাদন করতে পারে না, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা সঠিক পদ্ধতিতে বিক্রয় কার্য পরিচালনা করতে পারে না।

৬. **মধ্যস্থকারবারীদের দৌরাত্ম্য ঃ** আম উৎপাদন থেকে ভোক্তাদের নিকট পর্যন্ত কৃষক, বেপারী, ফরিয়া, আড়তদার, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা - এতসব হাত বদল হয়। কিন্তু ইচ্ছা করলে মধ্যস্থকারবারীর সংখ্যা আরও কম করেও আম ভোক্তাদের নিকট পৌছানো যায়।

৭. **অনিশ্চয়তা ঃ** প্রক্রিয়াজাত করার ব্যবস্থা নেই বলে দ্রুত পচে যায়। ফলে অনিশ্চয়তার ভয় থাকে।

৮. **চুরি যাওয়া ঃ** বাগানে থাকা অবস্থায় অনেক আম চুরি হয়ে যায়। এ ছাড়া পরিবহণের সময় রেল কুলিদের খুশি না করলে গুদাম হতে চুরি হয়।

৯. **উপযুক্ত অর্থের অভাব ঃ** উপযুক্ত অর্থের অভাবে কৃষকদেরকে অপরিণত সময়ে কম দামে বাগান বিক্রি করে ফেলতে হয়।

১০. **মাস্তান ও অন্যান্যদের উৎপাত ঃ** পরিবহনকালে এদেরকে মোটা অংকের চাঁদা প্রদান না করলে বিভিন্ন ঝামেলার সৃষ্টি করে। রাজশাহী থেকে এক ট্রাক আম আনতে এ সমস্ত উপরি খরচ প্রায় ১৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকার মত।

আম উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

অধিক অর্থ উপার্জন ও ঐতিহ্য টিকাতে হলে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বল্প মেয়াদীতে যে সমস্ত গাছে উৎপাদন কম হয় নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থায় নতুন গাছ রোপণ, গাছ কর্তন রোধ, আম চাষে আগ্রহ সৃষ্টি, ঋণের ব্যবস্থা, কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি। ফলে দেশীয় চাহিদাপূরণসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধান কল্পে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত যেমন মোটরচালিত নৌকার ব্যবস্থা, পরিবহণের জটিলতা ও চাঁদা আদায় রোধ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা, আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের আধুনিক পদ্ধতির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, মধ্যস্থকারবারী হ্রাস, চুরিরোধ, চোরাচালনীরোধ সর্বোপরি সরকারীভাবে এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা উচিত। কৃষকের ঋণ ব্যবস্থা, রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রকার

আমজাতদ্রব্য তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি; সরকারী কৃষি ও বাজারজাতকরণ বিভাগের সরাসরি পদক্ষেপ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া।

সুখের বিষয় সরকার আমের চাষ বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ কৃষকের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহীতে প্রথম জাতীয় আম প্রদর্শনী ১৯৮৬ ইং করে। আবার, নবাবগঞ্জে ১৯৮৬ সনে ২২-২৩ শে জুলাই জাতীয় আম প্রদর্শনী হয়েছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রচার বিভাগের উদ্যোগে। নবাবগঞ্জে ৩১ এককর জমিতে আম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ইউ, এন, ডি, পি –এর অর্থানুকুল্যে গবেষণা উপকরণের জন্য ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

আমের বৈদেশিক বাণিজ্য

মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে আমেরবাজার বিস্তৃত। পাকা আম ও আমজাত দ্রব্যাদির প্রচুর চাহিদা ঐ সমস্ত দেশে রয়েছে। আমাদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো টিনজাত, বোতলজাত আম, আমের আচার, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে থাকে। পাকা আম মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, লিবিয়া, ইরান ইত্যাদি দেশে ও ইংল্যাণ্ড, জাপান, হংকং– ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে।

কলা

ভূমিকা ঃ কলা একটি উৎকৃষ্ট শর্করা জাতীয় ফল। অর্থনৈতিক দিক থেকে এটা একটা লাভজনক ফল। কলা সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য। আমাদের দেশে সারা বৎসরই কলার চাষ করা যায়। এটা একটি বাণিজ্যিক পণ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশে মুন্সিগঞ্জ জেলা কলা উৎপাদনে বিখ্যাত। সারাদেশে ১,০৩,৫৫৫ একর জমিতে প্রায় ৭ লক্ষ টন কলা উৎপাদন হয়। আমাদের দেশে কলার প্রচুর চাহিদা ও উৎপাদনের সম্ভবনা থাকাসত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে কৃষকরা কলা উৎপাদনের জন্য উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই কলার বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রতি কৃষকদের উৎসাহিত করা অতি জরুরী।

কলার ব্যবহারিক গুরুত্ব

খাদ্য মানের দিক থেকে কলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কলাতে ২০% চিনি এবং B. A. C. ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কলায় লৌহ, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামও অল্প পরিমাণ আছে.

কলার বিভিন্ন জাত

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের কলা দেখা যায়। যেমন ঃ

১. **সাগর কলা ঃ** এ কলা মুন্সিগঞ্জে বেশি উৎপাদিত হয়। বর্তমানে নরসিংদিসহ সর্বত্র উৎপাদিত হয়। ইহা উন্নতজাতের কলা।

২. **সবরী কলা ঃ** এটা উৎকৃষ্ট জাতের এবং সুস্বাদু। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়ায় ইহা অর্থকরী ফসল হিসাবে উৎপাদিত হয়।

৩. **চাম্পা কলা ঃ** শতকরা ৪০ ভাগ কলাই এ জাতের হয়। এটা মধ্যম জাতের কলা। গাছের গড়ন শক্ত। সব জেলাতেই কম-বেশি উৎপাদিত হয়।

৪. **কবরী কলা ঃ** এটা নিকৃষ্ট জাতের কলা। সারা বৎসর এ কলা পাওয়া যায় এবং সব জেলাতেই উৎপাদিত হয়।

৫. বিচি কলা ঃ নিকৃষ্ট জাতের কলা। এতে বিচি বেশি থাকে। সারা বৎসর সব জেলাতে কম বেশি পাওয়া যায়।

৬. অন্যান্য কলাঃ সিংগাপুরী কলা, মাদ্রাজী কলা, চিনি চাঁপা, চন্দনী কবরী, ভেড়ার ভোগ, জান কাদলী, কানাইবাঁশী, গোসা ইত্যাদি।

জেলাভিত্তিক কলার উৎপাদন

বাংলাদেশের সকল জেলাতেই কলা কমবেশী উৎপাদিত হয়। তবে ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল জেলাতেও বিভিন্ন জাতের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। মুন্সিগঞ্জের কলা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ হয়ে থাকে। তাই ঢাকার উত্তরাঞ্চল নরসিংদি ও মুন্সিগঞ্জ কলার জন্য বিখ্যাত স্থান বলে খ্যাত। নিম্নে জেলাওয়ারী কলা উৎপাদনের জন্য জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৭
কলার জেলাভিত্তিক উৎপাদন

	১৯৮২–৮৩ ইং		১৯৮৩–৮৪	
জেলা	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একক)	উৎপাদন (টন)
চট্টগ্রাম	৩,৫৬৫	২৬,৪০০	৩,৭৮০	২৮,৫০০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৪,৭৫৫	১০৮,১৭৩	১৩,৪৬৫	১০১,০১৪
কুমিল্লা	২,৪২০	১৪,৪৯২	২,৬৪৫	১৪,৬৩৪
নোয়াখালী	৪,২৪৫	২২,৬৫৫	৩,৯৫০	২০,৮১০
সিলেট	৫,৯৫০	৪১,৫৬১	৫,২৭০	৩৪,৭৬৫
ঢাকা	৫,০১০	৩২,৬৭৪	৫,৫৪৯	২৪,৪৫০
ফরিদপুর	৪,৫০৫	৩১,৬৯৫	৪,৪৪৯	৩৪,৪৮০
জামালপুর	১,৮৮০	১০,৬৯৩	১,৯২০	১১,০৯২
কিশোরগঞ্জ	৭৬০	৩,৫৯২	৭৫০	৩,৩২২
মোমেনশাহী	২,২৫০	১৩,৭৯৩	২,২৫৫	১৩,৮৯১
টাঙ্গাইল	৪,২৩৫	২২,৩২১	৩,৯৪৫	২০,১৬০
বরিশাল	১৬,৮৮৫	১,২০,৮১৫	১৭,৪০০	১,২৪,৭৪২
যশোর	৫,৩৪০	৩৩,৪৬৬	৫,৩২০	৩০,০৪১
খুলনা	৬,৪১৫	৪৪,৩৬৬	৬,৩৩৫	৪২,০২৩
কুষ্টিয়া	১,৫৩৫	১১,০৮০	১,৫৯০	১১,৪০১
পটুয়াখালী	৫,০৮৫	২৯,৭৪৬	৫,৪১৫	৩১,৯১১
বগুড়া	২,৫২০	৯২,০৩৬	২,৫৩০	১১,৯১৮
দিনাজপুর	৩,৬২০	২০,৪৭৪	৩,৬৫০	২১,০৫৬
পাবনা	৫,২১০	৩৪,৮২৪	৫,২৪০	৩৩,৯২৪
রাজশাহী	২,৮৯০	১৫,৯৬৮	২,৮৮০	১৫,৮৪০
রংপুর	৬,৪৩৫	৩৬,৫৫৬	৬,২৮৫	৩৬,৯৬১
বাংলাদেশ	১,০৫,৬১০	৬,৮৭,৭৮২	১,০৩,৫৫৫	৬,৬৪,০৮৩

সূত্র বি. বি. এস.

আন্তর্জাতিক বিশ্বে কলা উৎপাদনের স্থান ও পরিমাণ

কলার আদি উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন এক অংশে। বাংলাদেশ, ভারত ও চীন দেশ কলার জন্মভূমি। প্রধান প্রধান কলা উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো বাংলাদেশ, ভারত, চীন, মালয়, মধ্য আমেরিকা, ব্রাজিল, সিংহল, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা এবং মধ্য আমেরিকা।

বাংলাদেশে কলার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

কৃষকরা উৎপাদিত কলা সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রি করে। আবার, সরাসরি পাইকার বা মধ্যস্থ কারবারীদের নিকট বিক্রি করে। মধ্যস্থকারবারীরা এটা সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রি করে, খুচরা বিক্রেতা বা ফেরীওয়ালাদের নিকট বিক্রি করে। নিম্নে কলার বণ্টন প্রণালী দেখানো হলো ঃ

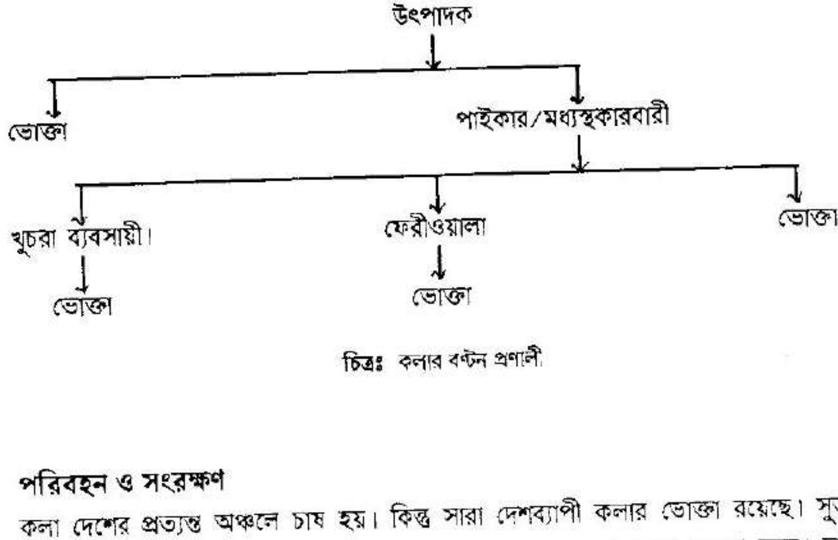

চিত্রঃ কলার বণ্টন প্রণালী

পরিবহন ও সংরক্ষণ

কলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাষ হয়। কিন্তু সারা দেশব্যাপী কলার ভোক্তা রয়েছে। সুতরাং পরিবহণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে কলা ঢাকা সহ বড় বড় শহরে প্রবেশ করে। ঢাকার বাদামতলী ঘাটে ফলের আড়তে, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি, বরিশাল ইত্যাদি এলাকা থেকে প্রচুর কলা উঠে, সাগর ও চম্পা কলা নরসিংদি জেলার কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া, শিবপুর, মনোহরদী ইত্যাদি উপজেলা থেকে ঢাকার আড়তে আসে। নরসিংদি থেকে বাস, ট্রাক বা ছোট লঞ্চ করে আসে। মুন্সিগঞ্জ থেকে ছোট লঞ্চ বা ট্রাকে করে কলা আসে। বরিশাল থেকে বড় বড় লঞ্চে ঢাকায় কলা আসে। সাগর, সবরি কলা আসে যশোর, ঝিনাইদা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে। এ গুলো ট্রাকযোগেই আসে। সবরি, কবরি, বিচিকলা ট্রাক বা বড় লঞ্চে করে বরিশালের গেগুরিয়া,

স্বরূপকাঠি, কাউখালী, পিরোজপুর ইত্যাদি স্থান হতে আসে। বগুড়াসহ অন্যান্য জেলা থেকে ট্রাকে করেই বেশির ভাগ কলা আসে। মুন্সিগঞ্জ থেকে অনেক সময় নৌকায়ও কলা আসে।

সাধারণত পচনশীল দ্রব্য উৎপাদনের পরপরই যত দ্রুত সম্ভব ভোগের উপযোগী করে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো আবশ্যক। তাই সংরক্ষণের তেমন প্রয়োজন হয় না। কলা ও কাদি পেড়ে ৭ দিনের মধ্যেই বাজারজাতকরণ করা হয়। এতে সংরক্ষণের জন্য তেমন একটা চিন্তা করতে হয় না। তবে অনেক সময় বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির অপেক্ষায় কলা সংরক্ষণ করতে হয়।

কলার অপচয়

কলা উৎপাদনের সময় ১০% ভাগ নষ্ট হয়। কিন্তু অনেক সময় উৎপাদনের পর কলা পচে যায়। কারণ পরিবহণের অপর্যাপ্ততা বা অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা। যশোর হতে ট্রাক যোগে যে সমস্ত কলা আসে সেগুলো ফেরী পারাপারের সময় অনেক সময় যান্ত্রিক গোলযোগ বা অন্যকোন কারণে সময় বেশি লাগে অর্থাৎ আটকে থাকে। এ ক্ষেত্রে ৫% ভাগ কলা নষ্ট হয়।

পাইকারী ও খুচরা বাজার

সারা বৎসর ধরেই কলার চাহিদা থাকে বলা যায়। ঢাকার মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদি, সীবপুর এলাকা থেকে বেপারীরা ঢাকার সোয়ারীঘাটের আড়তদারদের নিকট কলা নিয়ে আসে। আড়তদাররা কমিশনের বিনিময়ে এগুলো খুচরা ব্যবসায়ী, ফড়িয়া বা হকারদের নিকট বিক্রি করে থাকে। ফুটপাতের ব্যবসায়ীর বা মহল্লার ছোট ছোট মুদি দোকানে কলার কাদি ঝুলানো থাকে। এরা আড়তদার থেকে ক্রয় করে প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। অনেক সময় আড়তদাররা বিভিন্ন ফলজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট পাইকারী কলা বিক্রি করে। ১৯৮৬ সালের ঢাকার আড়তের কলার দাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) সাগর কলা প্রতিশ' ১০০/-, (২) সবরি কলা প্রতিশ' ১২৪/-, (৩) চাম্পা কলা প্রতিশ' ৭৫/- (৪) কবরী কলা প্রতিশ' ৫০/-, (৫) বিচি কলা – প্রতিশ' ৩০/-, অন্যান্য কলা প্রতিশ' ৩০-৫০/- এর মধ্যে।

সূত্র ঃ কদমতলী ঘাট আড়তদার সমিতি

কলার বিক্রয় ব্যয়

কলার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় পরিবহন খরচ, হাত বদল ব্যয়, আড়তদারদের কমিশন, পচন বাবেত ছাড়, ব্যবসায়ীর লাভ ইত্যাদি ব্যয় হয়ে থাকে। যেমন, যশোর থেকে কলা ঢাকার আড়তে ট্রাকযোগে বা লঞ্চ, বাস বা রেল যোগে আনতে বিভিন্ন খরচ হয়ে থাকে। তাছাড়া পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির ঝুঁকিও থাকে। নিম্নে কলার বিক্রয় ব্যয়ের একটি হিসাব প্রদান করা হলো ঃ

তালিকা - ৮

কলার মূল্য বিস্তার

সংখ্যা	বিবরণ	টাকা	
১.	উৎপাদনকারীর মূল্য	৩৫.০০	(প্রতিকাদি)
২.	কাদি পাড়ার ব্যয়	.৫০	,,
৩.	প্যাকিং ও পরিবহন ব্যয়	২.৫০	,,
৪.	আড়তদারের কমিশন, ঘাটভাড়া ইত্যাদি	২.০০	,,
৫.	বেপারীর লাভ	১৩.০০	,,
৬.	খুচরা বিক্রেতা লাভ	২০.০০	,,
৭.	অন্যান্য	২.০০	,,
৮.	ঢাকার বাজারের খুচরা মূল্য	৭৫.০০	,, (প্রায়)

সূত্রঃ কদমতলী ঘাট আড়তদার সমিতি

কলা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য

কলা থেকে উন্নতমানের এলকহোল তৈরি করা যায়। কাঁচা কলা রান্না করে খাওয়া যায়। তাছাড়া ফলজাতদ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো কলা থেকে জ্যাম, জুস ও অন্যান্য সুস্বাদু দ্রব্য তৈরি করে। এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরিবেশক নিয়োগের মাধ্যমে সারা দেশে কলাজাত দ্রব্য বন্টন করে থাকে। কলা দ্বারা আইসক্রিম, বেকারীতে ক্রীম বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্য তৈরি করা হয়। কলা থেকে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রপ্তানি করা হয়। সুতরাং কলাজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা উচিত।

কলার বাজারজাতকরণ সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

কলার বাজারজাতকরণে নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান। এ সমস্যার সঠিক সমাধান হলে অদূর-ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কলা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। আর দেশীয় চাহিদার কথাতো বলা বাহুল্য। নিম্নে কলা বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. পরিবহন সমস্যা ঃ অপর্যাপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থার জন্য সময় মত কলা চাহিদার স্থানে পৌছানো যায় না, ফলে ব্যবসায়ীরা কম মূল্য পায়। অন্যদিকে কলা দ্রুত পচে যায়। ১৯৮২ সালের দৈনিক বাংলার খবর (১৫-৮-৮২) যশোরে আন্তঃজেলা পরিবহন সমস্যার দরুন যশোর থেকে কলা সরবরাহ করার অসুবিধা দেখা দেয়। চাষীরা কলা নিয়ে বিপাকে পড়ে। কলার মূল্য অত্যধিক হ্রাস ও অনেক কলা পচেছে। যেহেতু কলা উৎপাদনে যশোর বিখ্যাত সেহেতু প্রতিদিন ট্রাক যোগে ১০/১৫ ট্রাক কলা যশোর থেকে বাদাম তলীর ফলের আড়তে উঠে। কিন্তু দৌলতদিয়া ঘাটে ফেরীর অসুবিধা থাকায় ৩/৪ দিন ট্রাক আটকিয়ে থাকে। ফলে কলা পচে যায়। ফলে উৎপাদকরা দাম পায় না।

২. নিশ্চিত বাজার ব্যবস্থার অভাব ঃ বিভিন্ন সংরক্ষণ ও পরিবহণের ত্রুটির জন্য অনেক সময় বাজার পড়ে যায়। তখন এ পচনশীল কলা লোকসান হলেও কৃষকদেরকে ছেড়ে দিতে হয়।

৩. মৌসুম ভিত্তিক বাজারজাতকরণ সমস্যা ঃ শীত মৌসুমে বাজারে কমলা, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল দেখা যায়, ফলে ভোক্তার কলার প্রতি ঝোক কমে যায়।

৪. মধ্যস্থ কারবারীদের দৌরাত্ম্য ঃ চাষীরা নিজেরাই সরাসরি ভোক্তা বা পাইকারের নিকট ফল পৌছাতে পারে। কিন্তু এখানে অযথা মধ্যস্থ কারবারীর ভীড় বেশি দেখা যায়।

সমাধান

১. কলা উৎপাদনের স্থান থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজারসমূহে যাতে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে, কম সময়ে যেতে পারে তার জন্য পল্লী এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন করতে হবে। সড়ক ও নৌ পরিবহণের উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। নদীপথের সংস্কার করতে হবে।

২. চাষীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। অবশ্য উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড ও সোনালী ব্যাংকের উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ সালে চাষ প্রকল্প হাতে নেয়া হলে যশোরে ঐ প্রকলেপর অধীনে কৃষকদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে উৎপাদন খরচ কমে আসে। ঐ প্রকল্পে প্রথম বৎসর একর প্রতি উৎপাদন খরচ ছিল ১০ হাজার টাকা। পরবর্তী বৎসর এর পরিমাণ ৩ হাজারে নেমে আসে।

৩. মধ্যস্থকারবারীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করতে হবে। কৃষকগণ সমবায়ের মাধ্যমে সরাসরি ভোক্তা বা খুচরা বিক্রেতাদের নিকট কলা বিক্রি করে বন্টন প্রণালী থেকে পাইকারদের সরিয়ে দিতে পারে।

৪. কৃষক এবং ব্যবসায়ী উভয়েরই উচিত কলা পর্যায়িতকরণ মানের ভিত্তিতে বিক্রি করা। সরকারী কৃষিপণ্য বিপণন বিভাগ এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

৫. পরিবহণের সময় উৎকোচ গ্রহণ প্রথা বন্ধ করে বাজারজাতকরণ ব্যয় বৃদ্ধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারকে কঠোর হাতে এগিয়ে আসা দরকার।

৬. বাজার তথ্য সরবরাহের জন্য "বাজার সংবাদ" কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৭. কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির ভিত্তিতে বাজারজাতকরণ কার্য পরিচালনা করতে সহায়তা প্রদান করা উচিত।

কলার বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের কলা ও কলাজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পরও মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে -এর চাহিদা রয়েছে। কলা ও কলা থেকে উৎপাদিত ক্রীম, বিস্কুট ও অন্যান্য দ্রব্য ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, ইংল্যাণ্ড এ সমস্ত দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব। কলা থেকে নতুন নতুন দ্রব্য তৈরি করে আরও বেশি পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

আনারস

ভূমিকা ঃ আনারস আমাদের একটি অর্থকরী ফল। এটা রসাল সুস্বাদু ফল। এর বহিরাঙ্গ কণ্টকময়। বাংলাদেশের যে সকল স্থান একটু উচু সাধারণত সেসকল স্থানে ইহা উৎপাদিত হয়। আনারসে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হজমে সহায়ক ব্রাসিলিয়ন নামক জারক রস বিদ্যমান। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আনারস চাষে বিখ্যাত। নানাবিধ সমস্যার জন্য কৃষকরা চাষ করতে উৎসাহ পায় না। তাছাড়া বাজারজাতকরণের অসুবিধার জন্য ব্যাপকভাবে বাজারজাত করে আনারস হতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সুবিধা ভোগ সম্ভব হয় না। সুতরাং আনারসের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ও জনগণ উভয়েই এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আনারসের ব্যবহারিক গুরুত্ব

খাদ্য মানের দিক থেকে এটা একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি' এবং কিছু পরিমাণ 'ডি' ও 'বি' বর্তমান। ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস প্রভৃতি ধাতব পদার্থও রয়েছে। পাকা আনারসে গড়ে ১০% ভাগ চিনি, ১% সাইট্রিক এসিড থাকে।

বিভিন্ন জাতের আনারস

বাংলাদেশে তিন ধরনের আনারস দেখা যায়

১. জলডুবী আনারস (Honey Queen) : এ ধরনের আনারস অত্যন্ত মিষ্টি ও হলুদ বর্ণের। ওজন ১।। - ২ কে.জি। পাতায় কাঁটা থাকে। এটা সিলেট ও কুমিল্লা জেলায় বেশি জন্মে।

২. ক্যালেঙ্গা (Giant kew) : এটা মধ্যম জাতের। পাতায় কাঁটা থাকে না। ওজনে জলডুবের চেয়ে একটু বেশি হয়। সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় বেশী উৎপাদিত হয়।

৩. ঘোড়াশাল বা দেশি ঃ এটা নিম্ন মানের আনারস। আকারে ছোট। ঢাকার নিকটবর্তী এলাকা, বিশেষ করে ঘোড়াশালে বেশি জন্মে।

পৃথিবীতে আনারসের উৎপাদন স্থান ও পরিমাণ

আনারসের মূল উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে। ১৫৪৮ সালে ভারত ও বাংলাদেশে পর্তুগীজ পর্যটকদের মাধ্যমে এ ফলের আগমন। আনারস উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান দেশগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

তালিকা - ৯

আনারসে বিশ্ব উৎপাদন

দেশের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ টনের হিসাবে)
থাইল্যাণ্ড	২০
চীন	৯.১
যুক্তরাষ্ট্র	৬.২
ব্রাজিল	৫.৭
ফিলিপাইন	৪.৮
মেক্সিকো	৪.৬
মালয়েশিয়া	২.১
দঃ আফ্রিকা	১.৯
বাংলাদেশ	১.৪
ভারত	১.১

সূত্রঃ বি.এ.আর.সি

জেলা ভিত্তিক আনারসের উৎপাদন

বাংলাদেশের শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ্ জেলায় আনারস উৎপাদিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, রামগড়ে জলডুব বেশি জন্মে। টাঙ্গাইলের মধুপুর, সখীপুর, সিলেটের মৌলভী বাজার –এ ক্যালেঙ্গা ভাল জন্মে। ঢাকার অদূরে ঘোড়াশালে, কাপাসিয়া ও বালিগঞ্জে দেশী আনারস জন্মে। সুতরাং বলা যায় বিভিন্ন জেলায় প্রচুর আনারস জন্মে। বাংলাদেশে ২৫.৫ হাজার একর জমিতে গড়ে ১০১ মণ করে ফলন হয়। নিম্নে ১৯৭৪–৭৫ হতে ১৯৮২–৮৩ পর্যন্ত আনারসের উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ১০

বাংলাদেশে আনারস উৎপাদন

বৎসর	'৭৪-'৭৫	'৭৫-'৭৬	'৭৬-'৭৭	'৭৭-'৭৮	'৭৮-'৭৯	'৭৯-'৮০	'৮০-'৮১	৮১-'৮২	৮২-৮৩
উৎপাদন (হাজার টন)	১২২	১৩৬	১৪২	১৪১	১৩৬	১৪০	১৫১	১৫৩	১৫৪

সূত্র ঃ বি. বি. এস.

আনারসের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

আমাদের দেশের বেশির ভাগ কৃষক গরিব হওয়াতে আনারস উৎপাদনের জন্য প্রচুর জমি থাকাসত্ত্বেও আশানুরূপ উৎপাদন করতে পারছে না। তাছাড়া অনেক জমি চাষের অযোগ্য। কৃষকরা পাহাড়ের ডালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত জমিতে স্বল্প পরিমাণ আনারস উৎপাদন করে নিজেরাই স্থানীয় বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে আনারস বণ্টন প্রণালীতে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামের কৃষকরা নিকটস্থ হাটে আনারস নিয়ে গেলে স্থানীয় ভোক্তারা তাদের নিকট থেকে ক্রয় করে। সেখানে মধ্যস্থ কারবারীদেরকে দেখা যায় না। কিন্তু শহরাঞ্চলে মধ্যস্থকারবারী আছে। গ্রামীণ উৎপাদনকারীরা আনারস শহরতলীতে নিয়ে আসলে সেখানে দালাল, আড়তদার, পাইকার ও অসংখ্য খুচরা বিক্রেতার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। স্থানীয় বেপারীরা ঘুরে ঘুরে কৃষকদের নিকট থেকে আনারস সংগ্রহ করে অথবা সম্পূর্ণ বাগান ক্রয় করে সেগুলো গ্রামীণ হাটে বিক্রি করে অথবা সরাসরি শহরের আড়তে নিয়ে আসে। সাধারণত গ্রামীণ আড়ত থেকে ট্রাক, বাস বা রেলের মাধ্যমে এগুলো বড় বড় শহরের আড়তে স্থানান্তরিত হয়। এ সকল আড়তদাররা কমিশনের বিনিময়ে খুচরা বিক্রেতা বা ফড়িয়াদের নিকট বিক্রয় করে। যেমন, ঢাকার বাদামতলীতে ফলের আড়ত থেকে সারা ঢাকাতে খুচরা দোকানদাররা আনারস কিনে তা সাধারণ ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে ঢাকার চাহিদা মিটায়। নিম্নে আনারসের বণ্টন প্রণালী দেখানো হলো ঃ

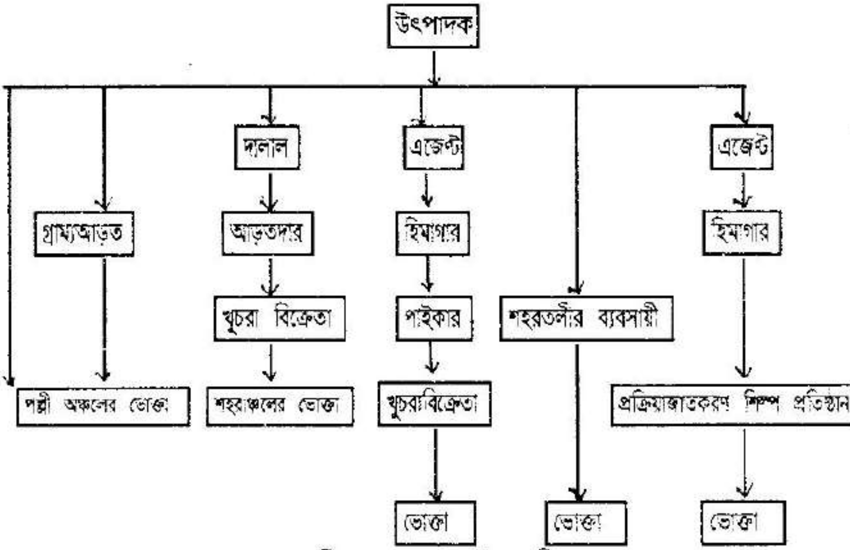

চিত্রঃ আনারসের বন্টন প্রণালী

অনেক সময় আনারস ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে হিমাগারে জমা করে এবং প্রয়োজন মত পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে। পাইকারীদের নিকট থেকে খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে এবং তা ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। অনেক সময় গ্রামীণ ব্যবসায়ীদের বা উৎপাদকের নিকট থেকে শহরতলীর ব্যবসায়ীরা সরাসরি আনারস ক্রয় করে শহরের ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। এতে ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হয়। আবার অনেক সময় উৎপাদনকারীর নিকট থেকে এজেন্টরা ক্রয় করে হিমাগারে রাখে। পরে এগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করা হয়। উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান আনারসজাত দ্রব্য তৈরি করে এজেন্ট -এর মাধ্যমে বাজারে বিপণীতে বিক্রি করে।

পাইকারী ও খুচরা বাজার

সিলেটের মৌলভীবাজার, পার্বত্যচট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, টাঙ্গাইলের মধুপুর, ঢাকার ঘোড়াশাল ইত্যাদি স্থান থেকে আনারস ট্রাক বা বাসে করে ঢাকার বাদামতলীর আড়তে উঠে। সেখান থেকে পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়। আড়তদাররা বিক্রি বাবদ কমিশন পেয়ে থাকে। ফুটপাতের হকার বা মহল্লা বা সুপার মার্কেটের ফলপট্টিতে খুচরা আনারস বিক্রি হয়। ঢাকার বাজারে খুচরা আনারস ভাল ও খারাপজাত মিলে গড়ে প্রতি হালি ৩০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

আনারস থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য

আনারস হিমাগারে রক্ষিত থাকে। প্রক্রিয়াজাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ঐ সমস্ত আনারস ক্রয় করে আনারস দ্বারা স্কোয়াশ, সিরাপ, জ্যাম, জেলী, সাইট্রিক এসিড, ক্যালসিয়াম সাইট্রেড এলকোহল প্রভৃতি প্রস্তুত করে বড় শহরের বিপণী, সুপার মার্কেটগুলোতে বিক্রি করে। ঢাকার আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস এ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান। আনারস দ্বারা সুস্বাদু বিস্কুট, জুস ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ও তৈরি করা হয়। আনারস থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশি। এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরিবহন দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে পাঠায়।

আনারসের বিক্রয় ব্যয়

আনারস যে দামে বিক্রি হয় তার অধিকাংশ মধ্যস্থকারবারীদের হাতে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনকারী তেমন মূল্য পায় না। একটি তালিকার সাহায্যে তা দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ১১

আনারসের উৎপাদন খরচ

সংখ্যা	বিবরণ	টাকা (প্রতি হালি)
১।	উৎপাদনকারীর মূল্য	১২.০০ ,,
২।	সংগ্রহ ব্যয়	১.০০ ,,
৩।	পরিবহন ব্যয় ও পচন	৪.০০ ,,
৪।	আড়তদার, দালাল, কমিশন, ঘাট	১.০০ ,,
৫।	বেপারীর লাভ	৮.০০ ,,
৬।	খুচরা বিক্রেতার লাভ	১০.০০ ,,,
৭।	ঢাকার বাজারে খুচরা মূল্য	৩৬.০০ ,,

সূত্র ঃ কৃষি বাজার বিভাগ

আনারস বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

আমাদের দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ আনারস উৎপাদন হচ্ছে ও ভবিষ্যতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় উৎপাদিত হবে তা আমাদের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এমনকি কৃষকরা উৎসাহিত হলে ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটায়ে প্রচুর পরিমাণ আনারস বিদেশে রপ্তানি

করাও সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে আনারস বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. **পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** যেহেতু পাহাড়িয়া অঞ্চলে আনারস উৎপাদিত হয় সেহেতু অনুন্নত পরিবহন যান উঁচুনীচু রাস্তায় চলাচল করতে বিশেষ অসুবিধা ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় নৌকায় আনারস পরিবহন করা হয়। ফলে সময় প্রচুর ব্যয় হয় এবং আনারস পচে যায়। তাছাড়া রেল ঠিকমত চলে না। চললেও উঠানো নামানোর সময় কর্মচারীদের পারিতোষিকের সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ দিকে ট্রাক, লরী, ভাড়া বেশি হওয়াতে বাজারজাতকরণ ব্যয় বেশি পড়ে।

২. **হিমাগার ঃ** আনারস সারা বৎসর উৎপাদিত হয় না। অথচ বাজারে সারা বছর ধরে বিক্রি করা যায়। তাই সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া খোলা অবস্থায় ৭/৮ দিন থাকলে আনারস পচে যায়। তাই দরকার হিমাগার। আমাদের দেশে আনারস পরিবাহিত যানে হিমাগার না থাকায় পরিবহনকালে আনারস পচে যায়।

৩. **পর্যায়িতকরণের অভাব ঃ** পর্যায়িতকরণের নিয়মকানুন সম্পর্কে কৃষকরা অজ্ঞ থাকায় ভাল মান ও খারাপমান একই দামে বিক্রয় করে। ফলে কৃষকরা লাভবান হতে পারে না।

৪. **মধ্যস্থকারবারীর আধিক্য ঃ** আনারস বাজারজাতকরণে প্রাথমিক ক্রেতা, গ্রামীণ ব্যবসায়ী, এজেন্ট, দালাল, আড়তদার, পাইকার, খুচরা কারবারী প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যস্থকারবারী পরিলক্ষিত হয়। অথচ বন্টন প্রণালীতে এত মধ্যস্থকারবারী না থাকলেও চলে। সমস্ত মধ্যস্থকারবারীরা কিছু কিছু লাভ করে থাকলেও সর্বশেষে দেখা যায় ভোক্তাকে বেশি দাম দিয়ে আনারস ক্রয় করতে হয়।

৫. **প্রতারণামূলক প্রথা ঃ** পণ্য উঠা নামা, মাল খালাস, পথে ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক উপরি পয়সা ব্যয় করতে হয় বলে দাম বেশি পড়ে। যেমন – ট্রাকের ক্ষেত্রে রোডের খাজনা, পুলিশের ঘুষ, বিভিন্ন চাঁদা, রেলের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের খুশি করা নচেৎ মাল খালাসে বিলম্ব করে। নদী পথে জল দস্যুদের আক্রমণ ইত্যাদি।

৬. **অনুন্নত বাজার ব্যবস্থা ঃ** বাজার তথ্য যেমন, দৈনিক বাজার দর, স্টকের পরিমাণ, চলাচলের সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকরা অজ্ঞ থাকায় অনেক সময় ঠকে। কারণ তেমন সংগঠিত ব্যবস্থা নেই। যদিও কৃষি বিপণন পরিদপ্তর থেকে সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশিত হয়। কিন্তু দরিদ্র এবং নিরক্ষর কৃষকদের তেমন কোন কাজে আসে না।

৭. **আর্থিক সমস্যা ঃ** কৃষকরা গরীব বলে মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদন করে। এ ঋণ শোধ করার জন্য অনেক সময় কাঁচা ফসল বিক্রি করতে হয়। আবার, অনেক সময় ঋণের অভাবে উৎপাদন বন্ধ থাকে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আড়তদাররা,

এজেন্টরা হিমাগার ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অনেক আনারস নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলোকে নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি করতে হয়।

সমাধান

বাংলাদেশের মাটি আনারস চাষের উপযোগী। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চল, কুমিল্লার লালমাই পাহাড়, ঢাকা ও ময়মনসিংহের গারো অঞ্চল, দিনাজপুর ও রংপুরের উঁচু অঞ্চলে ব্যাপক আনারস চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই যে, প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও কার্যকরী ব্যবস্থার অভাবে এ সম্ভাবনাময় ফলটির সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে না। ভোক্তাকে বেশিদামে আনারস ক্রয় করতে হয়। সুতরাং এ সমস্ত সমস্যা সমাধান করে আনারস চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

১. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থ করতে হবে। তাতে হিমাগার বিশিষ্ট গুদাম থাকতে হবে।

২. সরকারী কৃষিপণ্য বিপণন বিভাগ কর্তৃক পর্যায়িতকরণ করে আনারস বিক্রিয় ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বেসরকারী উদ্যোগে যাতে আনারস বেশি দিন ধরে রাখা যায় তার জন্য প্রচুর হিমাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতারণামূলক প্রথা যেমন, পরিবহণের পথের জটিলতা, বখরা গ্রহণ ইত্যাদি হ্রাস করে বাজারজাতকরণ ব্যয় কমাতে হবে।

৫. কৃষকের জমিগুলো বিভক্ত থাকায় উৎপাদন কম হচ্ছে এবং উৎপাদনে কষ্ট হচ্ছে। সবাই মিলে সমিতি গঠন করে তার মাধ্যমে সমস্ত জমি একত্রে করে চাষ করলে ফলন ভাল হবে।

৬. সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে কৃষককে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. কৃষকদেরকে সঠিক বাজার তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে বাজার সংবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

আনারসের বৈদেশিক বাণিজ্য

আনারস ও আনারস থেকে উৎপাদিত বোতলজাতদ্রব্য, জ্যাম, জেলী, জুস ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসহ সারা এশিয়া মহাদেশে কমবেশি রপ্তানি করা হয়। আনারসের চাহিদা মধ্য প্রাচ্যে যথেষ্ট রয়েছে। আনারস থেকে উৎপাদিত বিস্কুট, লজেন্সসহ আরও অনেক ধরনের সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়। বিদেশে এগুলোর চাহিদা অনেক। আনারস ও অনারসজাত দ্রব্য বেশি করে উৎপাদন করে দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বন্টন করে ভোক্তার নিকট পৌছানো এবং এর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

কমলা লেবু

ভূমিকা ঃ কমলালেবু ও লেবুজাতীয় ফল রুটেসী পরিবারের উপগোত্র সাইট্রিক সুইংগেল –এর অন্তর্গত কমলা লেবু খুবই সুস্বাদু ফল। এতে প্রচুর ভিটামিন "সি" আছে। কমলা লেবুগাছ গাঢ় সবুজ রংয়ের। আমাদের দেশে সিলেট জেলায় ১৯৮৫—'৮৬ সনে ১০,০০০ একর জমিতে ৪,২৮,০০০ মণ কমলা উৎপাদিত হয়েছে। এটা শীতকালীন ফল।

কমলার ব্যবহারিক গুরুত্ব

খাদ্য মানের দিক থেকে এর গুরুত্ব অধিক। মানবদেহে বিশেষ করে শিশুদের দৈহিক গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন "সি" এতে আছে। আমাদের দেশে ৯০% লোকই ভিটামিনের অভাবে ভোগে। একজন মানুষের দৈনিক ৩০ মি. গ্রাম ভিটামিন "সি" দরকার। সুতরাং দৈনন্দিন আহারের আগে বা পরে লেবু জাতীয় ফল খেয়ে এর অভাব পূরণ করা যায়।

কমলা লেবুর বিভিন্ন জাত

একজন খ্যাতনামা লেবু বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুইংগেল লেবু জাতীয় ফলকে মোট ১৩টি প্রজাতিতে ভাগ করেন। আর একজন জাপানী বিশেষজ্ঞ ১৯৬১ সালে এ ফলকে ২টি উপজাত ৮টি বিভাগ ও প্রায় ১৬০ টি প্রজাতিতে পুনর্বিন্যাস করেন।

উদ্যান তত্ত্ববিদরা বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিবেচনা করে একে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১. **কমলালেবু** ঃ কমলালেবু তিন ধরনের মিষ্টি, টক ও টক মিষ্টি।

২. **মিঠালেবু** ঃ মালটাকে মিঠা লেবু বলা যায়।

৩. **বাতাবীলেবু** ঃ এর খোসা শক্ত বলে খোসা ছড়িয়ে খাওয়া যায় না।

৪. **কাগজীলেবু** ঃ আকারে ছোট যা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে কমলা লেবুর উৎপাদন স্থল

কমলালেবু কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের কিয়দংশে উৎপাদিত হয়। অথচ অন্যান্য লেবুজাত দ্রব্য যেমন বাতাবী ও কাগজী লেবু সারা দেশে কমবেশি উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কমলালেবু আমাদের দেশে অনেক কম উৎপাদিত হয়। সিলেটের শ্রীমঙ্গলে, জাফলং, মৌলভীবাজার প্রভৃতি স্থানে কমলা লেবু উৎপাদিত হয়। নিম্নে শুধু সিলেটের ১৯৭৮–'৮৫ সন পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১২

বাংলাদেশে কমলার উৎপাদন

(হাজার টন)

'৭৮-'৭৯	'৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮১	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫
১০১.৭২	১০৩.৯২	১১৪.২০	১১৮.৯০	১১৭.৪৮	৭৫.০৮	৭৪.৮৮

সূত্রঃ বি, বি, এস

লেবু জাতীয় ফল দেশের চাহিদা মিটাতে অক্ষম। প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ কমলা ও মালটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তাই ইহার বাজারজাতকরণ পরিধিও ছোট। লেবু জাতীয় ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

কমলা লেবুর উপর অতীত ও বর্তমান গবেষণা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তত্ত্ব বিভাগ অন্যান্য ফল যেমন, আম, কলা, আনারস, কাঁঠাল, পেপে প্রভৃতি ফলের উপর গবেষণা করতে গিয়ে লেবুর উপর তেমন নজর দিতে পারে নাই। তবে সিলেটের জৈন্তাপুর কৃষি গবেষণা উপকেন্দ্র বাংলাদেশের লেবু চাষে প্রধান প্রধান অন্তরায়গুলো নিম্নোক্ত কারণে ঘটে থাকে বলে অনুমান করেন ঃ

(১) উফশী জাতের অভাব, (২) পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই-এর প্রকোপ, (৩) কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের অভাব, (৪) উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

বর্তমান গবেষণা ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়া কমলাচাষের উপযোগী হলেও নিম্নোক্তকরণে এর উৎপাদন নিম্ন ঃ

উফশী জাতের বীজের অভাব, গবেষণালব্ধ জ্ঞান নেই। বাংলাদেশে বাতাবী লেবু ভাল জন্মে। সুতরাং কমলার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে তথা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে হলে আরও গবেষণার আবশ্যক।

কমলা লেবুর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

অনুকূল পরিবেশ ও প্রচুর জমি থাকাসত্ত্বেও চাষ পদ্ধতির অজ্ঞতা ও বীজের অভাবে ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব নয়। সিলেটের কিছু কিছু এলাকায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কোন এলাকায় সামান্য পরিমাণ কমলা উৎপাদিত হয়। এ সকল কমলা সাধারণত স্থানীয় বাজারেই সরাসরি ভোক্তার নিকট কৃষকরা বিক্রি করে থাকে। অথবা কৃষকদের নিকট হতে বেপারীরা বা আড়তদাররা কিনে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের পাইকারীদের নিকট বিক্রি করে। পাইকাররা

আবার খুচরা ব্যবসায়ী বা ফেরীওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করে থাকে। খুচরা বিক্রেতা ও ফেরীওয়ালা ভোক্তার কাছাকাছি থাকে বিধায় তারা ভোক্তার নিকট বিক্রি করে। সত্যি কথা হলো যে, আমাদের কমলার উৎপাদন কম, তথা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় দেশীয় চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উপর নির্ভরশীল। ঢাকার আড়তে শতকরা ৮০% ভাগ কমলা ভারত থেকে আমদানি করা যা খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে এনে সাধারণ ভোক্তার চাহিদা মিটায়।

কমলার বাজার দর

বাদামতলীর আড়তে কমলা পাইকারী দরে বিক্রি করা হয়। আড়তদাররা শতকরা ১০% কমিশন কাটে। তাছাড়া অন্যান্য খরচ মিলে কমলার বাজার দর মোটামুটি বেশি। ১৯৮৬ সালে বাদামতলীর আড়তে পাইকারী মূল্য ছিল প্রতিশ কমলা ৩০০—৪০০ টাকা, যা খুচরা বাজারে ফেরীওয়ালারা প্রতি হালি ২০—৩০ টাকা বিক্রি করে।

কমলা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য

বাংলাদেশে কমলার রস শুকিয়ে একটি কোম্পানী 'TANG' নামক দ্রব্য তৈরি করে। কমলার দ্বারা জেলী, জ্যাম, আচার ইত্যাদি তৈরি হয়। ঢাকার ও সিলেটের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য তৈরি করে তা সারা বাংলাদেশের সুপার মার্কেট, কাঁচা বাজার ও মনোহারী দোকানে খুচরা বিক্রি করা হয়। এরা সাধারণত পরিবেশক নিয়োগ করে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌছায়। বিদেশে কমলার খোসা দিয়ে রং, প্রসাধনী দ্রব্য ও সুগন্ধি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন বেকারী, লজেন্স ফ্যাক্টরীতে কমলা ব্যবহৃত হয়। কমলার উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে ভবিষ্যতে কমলা ও কমলাজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে আর তা থেকে প্রচুর আয় হবে।

কমলার বাজারজাতকরণ সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

যেহেতু আমাদের দেশে কমলা উৎপাদন তেমন আশাব্যঞ্জক নয়, সেহেতু উহার বাজারজাতকরণ পরিধিও তেমন দক্ষ নয়। তবুও নিম্নোক্ত কারণে আমাদের বাজারজাতকরণ অদক্ষ।

১. পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবঃ পরিবহণের অসুবিধার জন্যে অল্প পরিমাণ কমলাই বাজারে সময়মত পৌছাতে পারে না। সিলেট ও চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় অনেক কমলা পচে যায়।

২. সংরক্ষণের অভাব ঃ সংরক্ষণের অভাবে কমলা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কৃষকরা দাম পায় না।

৩. কৃষকরা উৎসাহিত পায় নাঃ আশানুরূপ ফলন হয় না বলে কৃষকরা কমলা উৎপাদনে উৎসাহ পায় না।

৪. আমদানিকৃত কমলার জন্যঃ প্রচুর কমলা আমদানি করে দেশে চাহিদা মিটানো হয় বলে কৃষকরা কমলা উৎপাদনে আগ্রহী নয়।

৫. গুণগতমান সম্পর্কে কৃষকরা অজ্ঞ।

৬. পচনশীলতার জন্যঃ ৫/৭ দিন ধরে রেখে ভোক্তার নিকট পৌছাতে হয়। এতে অনেক কমলা পচে যায়। ফলে দাম পায় না।

৭. উৎপাদন খরচ মূল্যের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে বলে উৎপাদনের জন্য উৎসাহ নষ্ট হয়।

৮. মধ্যস্থকারবারীদের দৌরাত্ম্য থাকায় প্রকৃত উৎপাদনকারী দাম পায় না।

সমাধান

আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃষকদেরকে ভাল বীজ সরকারী মাধ্যমে প্রদান করে কমলা উৎপাদনে সহায়তা করতে হবে। বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে। সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি আমদানির প্রবণতা কমাতে হবে।

কমলার বৈদেশিক বাণিজ্য

আমাদের দেশে যে কমলা উৎপাদন হয় তা স্থানীয় বাজারে বা কৃষকের নিজস্ব ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় কমলা আমাদের রপ্তানি তো দূরের কথা দেশীয় চাহিদা মিটানোর নাগালের বাইরে। তাই দেশীয় চাহিদা মিটানের লক্ষ্যে প্রতি বৎসর বিশেষ করে শীতের শেষের দিকে ভারত থেকে প্রচুর কমলা আমদানি করতে হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কম ব্যয়ে বন্টন করার ব্যবস্থা করা গেলে প্রচুর আয় হবে। আবার বিদেশে রপ্তানিও করা যাবে।

কাঁঠাল

ভূমিকাঃ কাঁঠাল বাংলাদেশের প্রধান ফলগুলোর মধ্যে একটি। এটি একটি অর্থকরী ফলও বটে। কাঁঠাল একটি সুস্বাদু ফল। অভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁঠালের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশের কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, ঢাকার সাভার, সোনারগাঁও অঞ্চলে প্রচুর কাঁঠাল উৎপাদিত হয়। বাজারজাতকরণে নানাবিধ সমস্যা থাকায় কাঁঠালের বাজার প্রসারতা লাভ করে নাই। যে পরিমাণ কাঁঠাল উৎপাদিত হয় তা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম। এর বাজারজাতকরণের জন্য সুদৃষ্টি দেয়া হলে বহির্বিশ্বে এর চাহিদা বাড়ানো যাবে।

ব্যবহারিক গুরুত্ব

খাদ্যমানের দিক থেকে কাঁঠালের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ইহা একটি উচ্চ মানের ফল। ইহা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। এতে প্রচুর শ্বেতসার, আয়রন, ফসফরাস, প্রোটিন, খনিজ ও ভিটামিন বি-১ রয়েছে। কাঁঠালের দ্বারা গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি ও শহরে স্ন্যাকসগুলোতে কাঁঠালের জুস তৈরি করা হয়। সুতরাং বলা যায়, ইহা একটি প্রিয় ফল।

আমাদের দেশে কাঁঠালের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

অধিকাংশ কাঁঠাল বাগান ফুল অবস্থায় বিক্রি করা হয়। স্থানীয় বেপারীরা বা দালালরা এ সমস্ত বাগান কম দামে ক্রয় করে তা পরিণত সময়ে বিভিন্ন আড়তদার বা মধ্যস্থকারবারীদের নিকট বিক্রি করে। অতঃপর তারা বিভিন্ন এলাকার আড়তে এগুলো উঠায়। আড়তদাররা কমিশনের ভিত্তিতে পাইকারের নিকট বা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পাইকারীর নিকট বিক্রি করে। অনেক সময় ফড়িয়া ও খুচরা দোকানদারদের নিকট বিক্রি করে। খুচরা দোকানদাররা ফুটপাতে বসে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট বিক্রি করে। সাধারণত ট্রাক বা নৌকায় করে কাঁঠাল আড়তে আনা হয়।

সাধারণত জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় মাসে বাজারে পাকা কাঁঠাল পাওয়া যায়। তবে শ্রাবণ–ভদ্র মাস পর্যন্ত কাঁঠালের বাজার জমজমাট থাকে। নিম্নে কাঁঠাল বাজারজাতকরণ চ্যানেল-এর একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

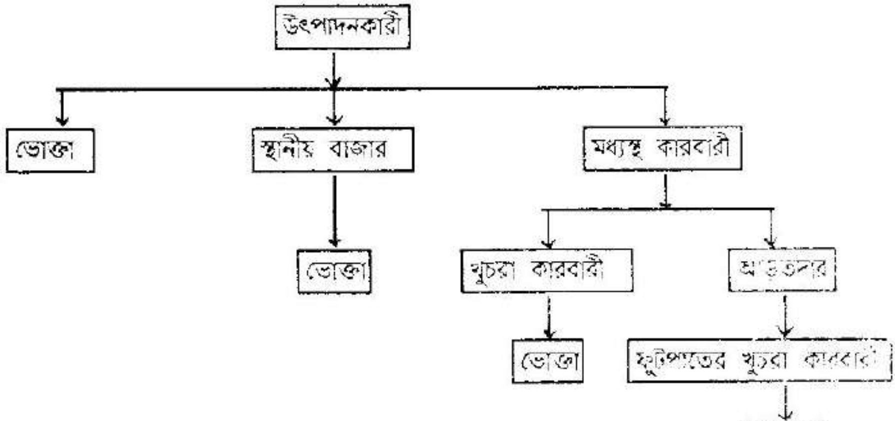

চিত্রঃ কাঁঠের বন্টন প্রণালী

কাঁঠালের বর্তমান বাজারদর

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ–আশ্বিন পর্যন্ত বাজারে কাঁঠাল থাকে। বিভিন্ন বাজারজাতকরণজনিত জটিলতার দরুন কাঁঠালের বাজারদর যথেষ্ট উঠানামা করে। ফলে উৎপাদনকারী ঠকে। সাথে

সাথে ভোক্তাকেও অনেক সময় বেশি দাম দিয়ে কাঁঠাল কিনতে হয়। ১৯৮৬ সালে ঢাকার আড়তে প্রতি'শ কাঁঠালের মূল্য ছিল ৫০০—১৫০০ টাকা ; নিউমার্কেটের মত অন্যান্য সুপার মার্কেট বা কাঁচা বাজারের ফুটপাতে প্রতিটি কাঁঠাল ৪০—১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হয়েছে।

কাঁঠালের বাজারজাতকরণ ব্যয়

কাঁঠালের বাজারজাতকরণ ব্যয়ের মধ্যে পরে পরিবহন, সংরক্ষণ ও স্থানান্তর খরচ, আড়তদারের কমিশন, পচন বাবদ ছাড়, ব্যবসায়ীর লাভ ইত্যাদি। কাঁঠাল বাজারজাতকরণে বেপারী বা মহাজনকে যথেষ্ট ঝুঁকি বহন করতে হয়। নিম্নে বাজারজাতকরণ ব্যয়ের একটি হিসাব দেখানো হলোঃ

তালিকা-১৩

কাঁঠালের মূল্য বিস্তার

সংখ্যা	বিবরণ	টাকা (প্রতি'শ)
১.	উৎপাদনকারীর মূল্য	৩০০.০০ টাকা
২.	পরিবহন ও সংরক্ষণ	১৫০.০০ টাকা
৩.	আড়তদারী, দালালী ও চাঁদা	৩২.০০ টাকা
৪.	বেপারীর লাভ	২৫.০০ টাকা
৫.	অন্যান্য (পচন)	৩.০০ টাকা
৬.	ঢাকার আড়তে পাইকারী মূল্য	৫১০.০০ টাকা

সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ

কাঁঠাল বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

আমাদের দেশে যে পরিমাণ কাঁঠাল উৎপাদন হচ্ছে তা আমাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম। কিন্তু সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার অভাবে কাঁঠাল উৎপাদনকারী যেমন একদিকে দাম পায় না অন্যদিকে ভোক্তা সাধারণকেও বেশি দামে এ সুস্বাদু ফলটি ক্রয় করতে হচ্ছে। সুতরাং কাঁঠালের বাজারজাতকরণ দক্ষ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে কাঁঠাল ক্রয় করা সাধারণ ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। অপর পৃষ্ঠায় কাঁঠাল বাজারজাতকরণে সমস্যাগুলো ও সমাধানের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. পরিবহন ব্যবস্থাঃ আমাদের পরিবহণ যান যেমনঃ ট্রাক, নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি আধুনিক না হওয়ায় পরিবহণের সময় বেশি লাগে বা পরিবহণকালে নষ্ট হয়ে যায় যা বাজারজাতকরণ ব্যয় বৃদ্ধির সহায়ক।

২. **গুদাম ঘরঃ** বাগান এলাকায় বা আড়তে গুদাম ঘর না থাকায় উৎপাদনের পর বাজারে উঠানোর সাথে সাথে যে দাম পায়, সে দামেই বিক্রি করা হয়ে থাকে। নচেৎ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. **মধ্যস্থ কারবারীদের সংখ্যাধিক্যঃ** অতিরিক্ত মধ্যস্থকারবারীর পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। ফলে হাত বদল ব্যয় বেড়ে যায় যা বাজারজাতকরণ ব্যয় বৃদ্ধির অংশ হিসাবে কাজ করে।

৪. **ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদঃ** ফুটপাতের কাঁঠাল ব্যবসায়ীদের মাঝে মাঝে সরকারী উদ্যোগে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে আড়তে কাঁঠাল জমে থাকে এবং প্রচুর কাঁঠাল আড়তেই পচে।

৫. **আর্থিক সমস্যাঃ** অর্থের অভাবে কাঁঠাল বাগান ফুল আসার সাথে সাথে বিক্রি করে দিতে হয়।

৭. **অনুন্নত বাজার ব্যবস্থাঃ** বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় একচেটিয়া দাম থাকে ফলে উৎপাদক ঠকে।

৮. **পথের বাঁধাঃ** পথে বিভিন্ন চাঁদা, বখরা ইত্যাদির জন্য ট্রাক আটকানো হয়। অনেক সময় ফেরীতে ট্রাফিক জ্যাম থাকে ফলে কাঁঠাল পৌছাতে পৌছাতে হয় দাম পড়ে যায় না হয় পচে যায়।

সমাধান

১. উৎপাদনের স্থান থেকে যদি কম ব্যয়ে, কম সময়ে মাধ্যমিক বাজারে কাঁঠাল আনায়ন করা যায় তবে বাজারজাতকরণ ব্যয় ও পচনরোধ সম্ভব। এর জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধন করা উচিৎ।

২. কাঁঠাল উৎপাদনে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠাল উৎপাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষককে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. পথে চাঁদা ও মাস্তানের উৎপাত বন্ধের লক্ষ্যে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বন্টন প্রণালী হতে যতটা সম্ভব মধ্যস্থকারবারী হ্রাস করা দরকার।

৫. কৃষকদেরকে সংগঠিত হয়ে পাইকারী ব্যবসায়ের প্রতারণা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদন করা।

৬. বাজার তথ্য সরবরাহের জন্য সংগঠিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কাঁঠালের বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের কাঁঠাল ও কাঁঠালজাত দ্রব্য সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত-আরব-আমিরাত, কাতার, ওমান, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুদান ইত্যাদি দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। বাংলাদেশের বর্তমান রপ্তানি উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া এ সমস্ত দ্রব্য রপ্তানিতে ব্যয় অনেক বেশি বলে তেমন লাভবান হওয়া যায় না। কম খরচে পরিবহণ ও নতুন কাঁঠালজাতদ্রব্য উৎপাদন করে সহজশর্তে রপ্তানি করা গেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

পেয়ারা

ভূমিকাঃ বাড়ীর আনাচে কানাচে অন্য পাঁচ-দশটি গাছের সাথে সবার নজরের বাহিরেই একটি দুটি পেয়ারা গাছ বড় হয়ে উঠে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পেয়ারা গাছকে তেমন যত্ন করার প্রয়োজন হয় না। এটা একটি সুস্বাদু ফল। পেয়ারার অর্থনৈতিক গুরুত্বও অধিক। যে কেউ ইচ্ছা করলে অনায়াসে এক একর জমিতে পেয়ারা গাছ রোপণ করে ১ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারে। সুতরাং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেয়ারার চাষ করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক।

পেয়ারার ব্যবহারিক গুরুত্ব ও চাষ সম্পর্কে ধারণা

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পেয়ারার গুরুত্ব অনেক আমলকির পরই ভিটামিন সি-এর প্রধান উৎস পেয়ারা। পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস রয়েছে। ফলে আমিষ, শ্বেতসার, চর্বি ছাড়াও আছে লবণ ও ভিটামিন। পেয়ারার রস কমলা বা টমেটোর রসের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে।

সব রকম মাটিতেই পেয়ারা ফলে। তবে খোলামেলা সমতল জমি উত্তম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চারাগাছ লাগাতে হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে ৩৩০টি গাছ লাগালে ভাল হয়। আগাছা পরিষ্কার, ডাল ছাটাই, মাটি ও সেচ ব্যবস্থা নিলে একর প্রতি ফলন ২টন উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে পেয়ারার উৎপাদন স্থান

বাংলাদেশের সব জেলাতে পেয়ারা উৎপাদিত হয়। তবে বরিশালের মেছারাবাদ ও ঝালকাটিতে এবং চট্টগ্রামের পটিয়া ও হাটহাজারীতে এর চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তাছাড়া কুমিল্লার কোটবাড়ীতে, ময়মনসিংহে, সিলেটের শ্রীমঙ্গলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর চাষ হয়।

১৯৮৩–৮৪ সালে এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের এসব জেলাতে ১২ হাজার টন পেয়ারা উৎপাদিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার একর জমিতে পেয়ারার চাষ হয়।

পেয়ারার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

পেয়ারার বাজারজাতকরণে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যাপক। শুধুমাত্র গ্রামে নয়, শহরে-বন্দরে মতিঝিলের ব্যস্ততম রাস্তার ফুটপাতে, চলন্ত ট্রেনে, স্টীমারে অর্থাৎ সর্বত্রই পেয়ারা পাওয়া যায়। যে সমস্ত জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেয়ারার চাষ হয়, সেখান থেকে স্থানীয় বাজারে হকাররা পেয়ারা নিয়ে আসে। অথবা গ্রাম্য আড়ত থেকে ট্রাক, নৌকা, বাস বা ট্রেনে করে পেয়ারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় চালান দেয়া হয়। ফুটপাতে ও যানবাহনে হকাররা চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পেয়ারা বেচে থাকে; পেয়ারা পরিবহণের সময় রাস্তাঘাটে সময় বেশি নষ্ট হয়। বরিশাল থেকে ট্রাক বা স্টীমার পেয়ারা ঢাকায় আনতে অনেক পেয়ারা পচে যায়। ফলে বাজারে এর দাম বেড়ে যায়। প্যাকিং -এর ভাল ব্যবস্থা না থাকায় চুরি ও পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিম্নে বন্টন প্রণালী দেখানো হলোঃ

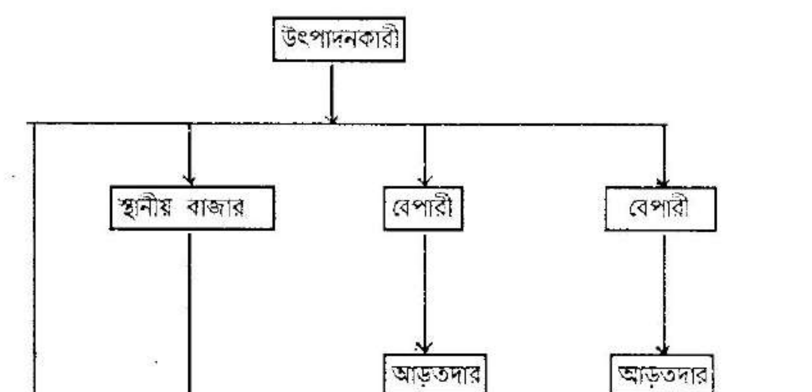

চিত্রঃ পেয়ারার বণ্টন প্রণালী

পেয়ারার বাজারজাতকরণ সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

পেয়ারা বাজারজাতকরণে বহুবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পথের ঝামেলা ও বখরারোধ, ভালো প্যাকিংকরণ, মধ্যস্থকারবারী হ্রাস, চুরি ও পথে নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে বাংলাদেশ বাজারজাতকরণ ব্যয় কমিয়ে ক্রেতাসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে সরকারী

উদ্যোগের প্রয়োজন। কৃষিমন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের বাস্তবানুগ উদ্যোগের ফলে পেয়ারার বাজার শক্তিশালী হবে। ফলে কৃষকরা উৎসাহিত হবে এবং ন্যায্য মূল্য পাবে।

পেয়ারা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য

পেয়ারা থেকে জেলী ও জ্যাম জাতীয় দ্রব্য তৈরি হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ সমস্ত দ্রব্য তৈরি করে থাকে। তারা আভ্যন্তরীণ বাজারে নিজস্ব পরিবেশক দ্বারা ও পরিবহণ ভ্যান দ্বারা সুপারমার্কেট, মনোহারী দোকানে ও খুচরা দোকানে পাঠায়। সেখান থেকে ভোক্তা সাধারণ এ সমস্ত দ্রব্য পেয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য আরও ব্যাপকভাবে এর উৎপাদন আবশ্যক।

পেয়ারার বৈদেশিক বাণিজ্য

পেয়ারা ও পেয়ারাজাত উৎপাদিত দ্রব্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম হলেও রপ্তানি করতে পারছে না। তাছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পেয়ারাজাত দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছে না। ফলে রপ্তানি করা হচ্ছে না।

লিচু

ভূমিকাঃ লিচু আমাদের একটি উৎকৃষ্ট ফল। ইহা ছোট আকারের অত্যন্ত সুস্বাদু ফল। আমাদের দেশে সব জেলাতেই লিচু উৎপাদিত হয়। আমাদের দেশে লিচু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেমন উৎপাদন করা হয় না। অথচ যদি এ সুস্বাদু ফলটির উৎপাদন বৃদ্ধি ও আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে এর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায় তবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও দেশীয় ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। আমাদের দেশের জনগণ লিচু প্রিয় একথা একবাক্যে স্বীকার্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে বাজারে এর প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে ক্রেতা সাধারণকে বেশি দামে লিচু ক্রয় করতে হয়।

লিচুর ব্যবহারিক গুরুত্ব

খাদ্য মানের দিক থেকে ইহা একটি উচুমানের ফল। এতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। সুতরাং এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

লিচুর উৎপাদন এলাকা

প্রত্যেক জেলাতে কম বেশি উৎপাদিত হয়। তবে রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সোনারগাঁও, রাণীগঞ্জ, কাপাসিয়া ইত্যাদি এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লিচু চাষ করা হয়।

রাজশাহী, দিনাজপুর, ঢাকার লিচু সারা বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। লিচুর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা দরকার। আমাদের দেশে বোম্বাইয়া ও পাটনাইয়া –এ দু'ধরনের লিচু হয়।

লিচুর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

লিচু বাগান সাধারণত ফুল অবস্থায় স্থানীয় বেপারীদের নিকট বিক্রি করা হয়। বেপারীরা ফল পাকলে হয় মধ্যস্থ কারবারীদের নিকট অথবা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে কৃষকরা খুবই কম দাম পায়। অনেক সময় বেপারীরা বিভিন্ন বড় বড় শহরে লিচু চালান দিয়ে থাকে। পাইকাররা খুচরা বিক্রেতা বা ফুটপাতের হকারের নিকট লিচু বিক্রি করে। হকাররা শহরাঞ্চলে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। লিচু পাকানোর সময় পাখি, চোর ও টাউটদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ফলে লিচু পাকানো বেপারীদের পক্ষে বিরাট ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। বেপারীরা অনেক সময় তদারকের ভয়ে বিক্রি করে হাত বদল করে। এক্ষেত্রেও অনেক লিচু রক্ষণাবেক্ষণ-এর অভাবে নষ্ট হয় বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনেক বেশি পড়ে। নিম্নে লিচুর বাজারজাতকরণ চ্যানেল দেখানো হলো ঃ

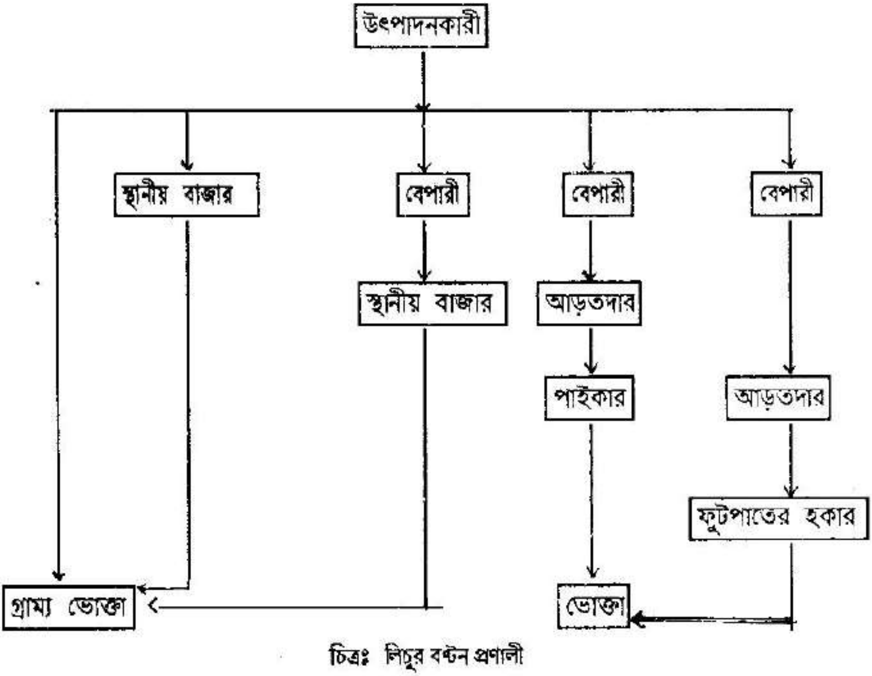

চিত্রঃ লিচুর বন্টন প্রণালী

লিচুর বর্তমান বাজার দর

লিচুর উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি। তাছাড়া মধ্যস্থ কারবারী ও বিভিন্ন উপরি খরচের জন্য এর বাজার দর অনেক বেশি যা ক্রেতাকে বহন করতে হয়। অথচ উৎপাদনকারী উপযুক্ত মূল্য পায় না। নিম্নে ১৯৮৬ সালের লিচুর বাজার দর দেয়া হলো ঃ

তালিকা - ১৪

লিচুর বাজারদর

বৎসর	শ্রেণী বিভাগ	বাজারদর (প্রতি হাজার) টাকা
১৯৮৬	বোম্বাইয়া	৪৫০ — ৫৫০ টাকা
জানুয়ারী-ডিসেম্বর	পাটনাইয়া	৩০০ — ৪৫০ টাকা
	দেশী	৩০০— ৪০০ টাকা

তরমুজ

ভূমিকাঃ তরমুজ আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় ফল। ইহা মৌসুমী ফল। সাধারণত গ্রীষ্মের সময়ে বাজারে এর প্রাচুর্যতা দেখা যায়। অতিরিক্ত গরমে ভোক্তা তরমুজের ঠাণ্ডা রস গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়। বাংলাদেশের কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে তরমুজ ভাল জন্মে। তরমুজের বর্তমানের উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম হলেও কৃষকরা তেমন দাম পায় না।

ব্যবহারিক গুরুত্ব ও বিভিন্ন জাত

তরমুজ ব্যবহার বাঙালীর একটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে গ্রীষ্মের সময়ে বাজারে তরমুজ উঠলে ধনী-গরীব, শহরে গ্রামের সবাই এটা ক্রয় করে। তরমুজে প্রচুর পরিমাণ ফসফরাস, লৌহ, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। বিভিন্ন জাতের তরমুজ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা দেয়া হলো।

১. রেডাকিং ঃ এটা উন্নতজাতের তরমুজ। এ জাতীয় তরমুজ কুমিল্লা, চট্টগামসহ সব জেলাতেই কমবেশি উৎপাদিত হয়।

২. গ্লোরী ঃ এটা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের তরমুজ। এ জাতীয় তরমুজ বাণিজ্যিক ভাত্তিতে উৎপাদিত হয়। এর চাহিদাও বেশি। কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর এর উৎপাদন বেশি।

৩. টাপি ঃ এটা মাঝারি জাতের তরমুজ। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, যশোরে উৎপাদিত হয়।

৪. দেশী ঃ এটা দেশী জাতের এবং নিকৃষ্ট। সর্বত্রই কম বেশি উৎপাদিত হয় কিন্তু চাহিদা কম।

তরমুজের উৎপাদন এলাকা

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এর উৎপাদন হয় না। যে সমস্ত এলাকায় মোটামুটি সমতল ও বেলে দোঁ-আশ মাটি সেখানে এর চাষ ভাল হয়। সাধারণত কুমিল্লা জেলাতেই এর চাষ ভাল হয়। কুমিল্লাসহ রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, যশোর, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তরমুজ চাষ হয়।

তরমুজের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

তরমুজ উৎপাদনকারী সরাসরি স্থানীয় বাজারে গ্রাম্য ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। আবার স্থানীয় বেপারীরা কৃষকের নিকট থেকে ক্ষেত ক্রয় করে তরমুজ সংগ্রহ করে ট্রাক, বাস, বা নৌকায় করে বড় বড় শহরের আড়তে চালান দিয়ে থাকে। আড়তদাররা তা ফুটপাতের খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে। সেখান থেকে সাধারণত ভোক্তারা ক্রয় করে থাকে। সাধারণত কুমিল্লা, রাজশাহী, নাটোর, যশোর, চট্টগ্রাম হতে ট্রাক, বাস বা নৌকায় করে বিভিন্ন আড়তে পাঠানো হয়। ক্ষেতের আশে-পাশে সংরক্ষণাগার না থাকায় ক্ষেত ভাঙ্গার সাথে সাথে বাজারে নিয়ে আসতে হয়। কৃষকরা বিভিন্ন শ্রেণীর তরমুজকে মান অনুযায়ী ভাগ না করেই বিক্রি করে। ফলে তেমন দাম পায় না। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণত ঢাকা, চট্টগ্রামের আড়ত থেকে পাইকারীরা ফল ক্রয় করে। নিম্নে বন্টন প্রণালী দেখানো হলোঃ

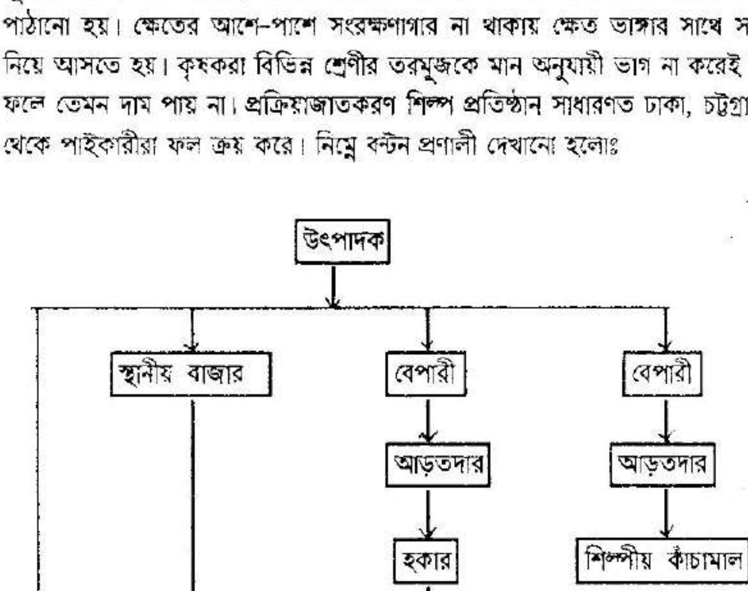

চিত্রঃ তরমুজের বন্টন প্রণালী

তরমুজ বাজারজাতকরণে সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

তরমুজ বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় ফল। ইহার বাজারজাতকরণে যে সমস্ত সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো হলো সংগ্রহের অব্যবস্থা, ঢাকায় আনার পথে ঝুঁকি, পচন বৃদ্ধি, নিম্নমান, বখরা ও পুলিশী উৎপাত ইত্যাদি। সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে এর বাজারজাতকরণ সমস্যাগুলো হ্রাস করা যায়। বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইনের কঠোর প্রয়োগ করা দরকার। তরমুজ সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ করা গেলে দেশে এর বাজারজাতকরণ ব্যয় কম হবে। ফলে মূল্য কমবে এবং চাহিদার অতিরিক্ত রপ্তানি করা যাবে।

তরমুজ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য

আমাদের দেশে অসংখ্য তরমুজ উৎপাদন হয় যা টাটকা অবস্থায় ব্যবহারের পরও প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত করা যায়। বিভিন্ন শহরে অবস্থিত প্রক্রিয়াজাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তরমুজের আচার, জ্যাম, সস, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে ছাড়ে। উৎপাদনকারীরা নিজস্ব পরিবেশক দ্বারা সারা দেশে এ সমস্ত দ্রব্য বাজারজাতকরণ করে থাকে। আরও বেশি পরিমাণে তরমুজ থেকে সুস্বাদু ফলজাত দ্রব্য তৈরি করা আবশ্যক।

তরমুজের বৈদেশিক বাণিজ্য

তরমুজ ও তরমুজ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য সৌদী-আরব, কুয়েত, সংযুক্ত-আরব-আমিরাত, ওমান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভম।

বেল

ভূমিকাঃ বেল বাংলাদেশের একটি উৎকৃষ্ট জাতের ফল। দেশের প্রায় প্রত্যেক স্থানেই বেলের সাক্ষাৎ মেলে। অর্থনীতির দিক থেকে এটা একটা লাভজনক ফল। বেল একটি সুস্বাদু ফলও বটে। বেলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা হলে বেল থেকে কৃষকরা যথেষ্ট আর্থিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

বেলের ব্যবহারিক গুরুত্ব ও চাষ সম্পর্কে ধারণা

ব্যবহারিক দিক থেকে বেলে গুরুত্ব অনেক বেশি। বেল সুস্বাদু ও রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা হজমের জন্যও উপকারী। বেলে প্রচুর পরিমাণ লৌহ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। বেল চাষ সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই হয়। তবে কয়েকটি জেলায় এর চাষ বেশি।

বেলের বিভিন্ন জাত

বেল দু'ধরনের হয়। যথাঃ (১) মিষ্টি ও (২) টক। মিষ্টি বেলের চাহিদা খুবই বেশি এবং এটা জনপ্রিয় ফল।

বেলের চাষ এলাকা

বাংলাদেশের সব জেলাতেই কমবেশি এর চাষ হয়। তবে যশোর, ঢাকার সোনার গাঁও এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেল চাষ হয়ে থাকে। বেল চাষ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও কমবেশি হয়।

বাংলাদেশে বেলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

বেলের বাগান উৎপাদনকারীরা বেপারীদের নিকট বিক্রি করে দেয়। বেপারীরা এগুলো স্থানীয় বা বড় বড় শহরের আড়তে পাঠায়। আড়তদাররা খুচরা ব্যবসায়ী বা হকারদের নিকট বিক্রি করে। আবার উৎপাদনকারী সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রিও করে।

বেলের বর্তমান বাজার দর

বেল ঢাকার আড়তে পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়। ১৯৮৬ সালে ঢাকার বাদামতলীর আড়তে প্রতিশ বেল ২৫০—৩০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে।

বেলের বিক্রি ব্যয়

বেল বিক্রির জন্য উৎপাদন ও সংগ্রহ ব্যয় ছাড়াও পরিবহণ, বেপারী, আড়ত কমিশন ১০%, ঘাট, প্যাকিং, পচন বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় মিলে প্রতিশতে ২০০ টাকা মত পড়ে।

বেলের বাজারজাতকরণ সমস্যা ও সমাধান

বেল উৎপাদন ও সংগ্রহ সহজ হলেও এর বাজারজাত করণে নানাবিধ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। বেল পাকার পর সংগ্রহ ব্যবস্থার অভাব, পরিবহণ ব্যয় বেশি, পথে পুলিশী ও মাস্তানের হস্তক্ষেপ, মধ্যস্থকারবারীর আধিক্য, ফুটপাতের খুচরা ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে বেলের দক্ষ বাজারজাত সম্ভব হয় না। ফলে বাজারজাতকরণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সরকারীভাবে কৃষকের উৎপাদন উৎসাহ বৃদ্ধি ও সুযোগ প্রদান এবং বাজারজাতকরণ সহজতর করার ব্যবস্থা করা উচিত।

বেল থেকে উৎপাদিত দ্রব্য

বেল থেকে আমাদের দেশের প্রক্রিয়াজাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বেলের বোতলজাত খাদ্য, জুস, বেলের সরবত, বেকারীর কাঁচামাল ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির

জন্য সারা দেশে পরিবেশক নিয়োগ করা হয়। ভবিষ্যতে বেল থেকে উন্নতমানের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করে প্রচুর মুদ্রা অর্জিত হবে।

পেঁপে

ভূমিকাঃ পেঁপে একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ফল। এটা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। আমাদের দেশের কৃষকরা বাড়ীর আনাচে-কানাচে বা বাড়ীর পার্শ্বে খালি জায়গায় পেঁপের চাষ করে। কিছু কিছু জেলায় এর উৎপাদন বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। এটা উৎপাদন সহজ।

বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

আমাদের দেশের সব জেলাতেই কমবেশি পেঁপে উৎপাদন হয়। ঢাকার নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, সোনার্গাও, কুমিল্লা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, চট্টগ্রাম এলাকায় পেঁপের চাষ হয়। পেঁপের বর্তমান বাজারজাতকরণ পদ্ধতি তেমন ব্যাপক নয়। গ্রামীণ কৃষক উৎপাদনের পর নিজস্ব ব্যবহারের উদ্বৃত্ত গ্রামীণ হাটে, বাজারে, ফুটপাতে বসে ভোক্তার নিকট সরাসরি বিক্রি করে। শহরের আশেপাশের এলাকা হতে কৃষকরা নিজেরা বড় বড় শহরে নিয়ে আসে। অথবা বেপারীরা খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে। এরা শহরের ফুটপাতে বা সুপার মার্কেটে বসে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পেঁপে বিক্রি করে থাকে। পরিবহণে, সংরক্ষণে অব্যবস্থার দরুন, পথে বিলম্ব হওয়ার দরুন, দালালের প্রতারণার দরুন পেঁপে নষ্ট বা পচে যায় এবং বাজারজাতকরণ ব্যয় বেশি পরে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা আবশ্যক। তবেই ক্রেতা এ সুস্বাদু ফলটির স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

উপসংহার

আমাদের দেশে যে সমস্ত ফলমুল উৎপাদিত হয় সেগুলোর বাজারজাতকরণে যদিও বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তথাপি মন্তব্য করা যায় যে যদি এ সমস্ত ফলমুল উৎপাদনের প্রাচুর্যতার সমাহার ঘটিয়ে ও দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটনা সম্ভব হবে। বিভিন্ন প্রকার টাটকা ফলমুল দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নতুন সুস্বাদু ফলজাত দ্রব্য উৎপাদন করার চেষ্টা করলে ফলমুল ও ফলজাত দ্রব্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে বলে আমরা মনে করি। আপাতত যে সব সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের মাধ্যমে এর দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সমাধান করা গেলে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা একদিকে আমাদের অর্থনীতির চেহারা উজ্জ্বল করতে পারে অন্যদিকে ফল ও ফলজাতদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। অতএব, বলা যায় ফলমুল ও ফলজাত দ্রব্য আমাদের প্রচুর সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক ও শিল্পীয় পণ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ফল ও শাক-সব্জী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা*

সূচনা ঃ সন্দেহাতীতরূপে এটা সত্য যে, একটি দেশের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সেই দেশটির জনগণের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশের একজন সাধারণ মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে তাতে খাদ্যপ্রাণের বা পুষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বহুলাংশে কম। এ অবস্থার জন্য খাদ্যের অভাব বা শাক-সব্জী ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর স্বল্পতাই কেবল দায়ী নয় বরং কোন খাদ্যে কতটা খাদ্যপ্রাণ আছে সে সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবও দায়ী। তদুপরি, ফল ও শাক-সব্জী মৌসুমী কৃষিজাত পণ্য এবং পচনশীল বিধায় আমাদের মত দেশে সমস্যা হচ্ছে খাদ্য ও শাক-সব্জী বেশি দিন সংগ্রহ করার। এ কারণে আমাদের দেশে ফল ও শাক-সব্জী প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব খুব বেশি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সারা বছর ধরে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে বর্তমানে। বিশেষত শাক-সব্জী হচ্ছে ভিটামিন "এ" এর সুলভতম উৎস যার অভাবে বিশেষ করে শিশুরা অন্ধত্বের শিকার হয়। এক কথায় সকলের জন্য পরিমিত ও বলকারক খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে ফল ও শাক-সব্জী প্রক্রিয়াজাত শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। যার ফলে একদিকে কৃষক বা উৎপাদনকারীগণ তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে অন্যদিকে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াস বাস্তবরূপ নেবে।

বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নততর এবং তাঁরা সুশিক্ষিত বিধায় প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ বা পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন, তাই সে সকল দেশে প্রতিক্রয়াজাত খাদ্যের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ঐ সকল উন্নত দেশগুলো মূলত শিল্প নির্ভর দেশ এবং তাঁদের উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য নিজ প্রয়োজনের তুলনায় অনেকাংশে অপ্রতুল। তাঁরা শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি করে এবং পক্ষান্তরে, নানাবিধ কৃষিজপণ্য আমদানি করে থাকে। প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর চাহিদা তাই সে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমাদের মত গরীব ও উন্নয়নকামী কৃষিপ্রধান দেশ ঐ সকল উন্নত ও শিল্প নির্ভর দেশে প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সক্ষম হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলেও বাংলাদেশে ফল ও শাক-সব্জী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

* বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক-এর অর্থনীতি বিভাগের সৌজন্যে।

চাহিদার প্রাক্কলন প্রণালী

বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও শাক-সবজীর চাহিদা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এ দুই বাজারেই বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা নিরূপণে বিশ্বের প্রধান প্রধান উন্নত দেশসমূহের (যারা প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও শাক-সবজী আমদানি করে থাকে) আমদানির গড় হিসাবে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে আংটাড/গ্যাট এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের ১৯৮২ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন/বই এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা নিরূপণে দেশে বর্তমানে গড় বাৎসরিক ফল ও শাক-সবজী উৎপাদন ক্ষমতা (যা মূলত আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদিত) এবং কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন হারের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

চাহিদা

আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে চাহিদার প্রাক্কলন

আংটাড/গ্যাট এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের ১৯৮২ সালে প্রকাশিত প্রক্রিয়াজাত ফলের বিশ্ববাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদন বইটিতে পরিলক্ষিত হয় যে, ১৯৮১ সালে বিশ্বের বৃহৎ ২৫টি দেশ প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের মোট আমদানির ৯৫ শতাংশ পরিমাণ আমদানি করে, যা বৈদেশিক মুদ্রার হিসেবে দাঁড়ায় সর্বমোট ২,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে আনুমানিক ১,৯০০ মিলিয়ন ডলার। উক্ত ২৫টি মুখ্য আমদানিকারী দেশের বেশিরভাগই হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশ। তবে কিছু কিছু উন্নয়নকামী দেশও প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও শাক-সবজী আমদানি করে থাকে। ঐ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪১১ মিলিয়ন ডলার) ও পশ্চিম জার্মানী (২৭৪ মিলিয়ন ডলার) মোট আমদানি বাজারের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ আমদানি করে যা বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে দাঁড়ায় ১৯০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৬৮৫ মিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় পর্যায়ের আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে কানাডা (১৯৪ মিলিয়ন ডলার), যুক্তরাজ্য (১৮৩ মিলিয়ন ডলার) ও সৌদী আরব (১৬২ মিলিয়ন ডলার)। এ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে, উপরিউক্ত ৫টি দেশ মোট আমদানিকৃত প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর ৬০ শতাংশ পরিমাণ আমদানি করে। তৃতীয় পর্যায়ের হিসেবে অবশিষ্ট ২০টি দেশ যেমনঃ নেদারল্যাণ্ডস (১৪৫ মিলিয়ন ডলার), ফ্রান্স (৯৯ মিলিয়ন ডলার), বেলজিয়াম-লুক্সেমবার্গ (৫৪ মিলিয়ন ডলার), সুইডেন (৪৮ মিলিয়ন ডলার) সুইজারল্যাণ্ড (৩৫ মিলিয়ন ডলার), লিবিয়ান আরব জুমহুরীয়া ৩৫ মিলিয়ন ডলার), অস্ট্রিয়া (২৮ মিলিয়ন ডলার), জাপান (২৭ মিলিয়ন ডলার), ডেনমার্ক (২৬ মিলিয়ন ডলার), ফিনল্যাণ্ড (২০ মিলিয়ন ডলার), ইসরাইল (১৮ মিলিয়ন ডলার), হংকং (১৮ মিলিয়ন ডলার), নরওয়ে (১৮ মিলিয়ন ডলার), ইয়েমেন (১৮ মিলিয়ন ডলার), অস্ট্রেলিয়া (১৬ মিলিয়ন ডলার), সোভিয়েত রাশিয়া (১৫ মিলিয়ন ডলার), ইটালী (১৪ মিলিয়ন ডলার), কুয়েত (১৩ মিলিয়ন ডলার), আয়ারল্যাণ্ড (১১ মিলিয়ন ডলার) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (১১ মিলিয়ন ডলার) মোট আমদানির ৪০ শতাংশ পরিমাণ আমদানি করে।

উপরন্তু এও প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৭৭ সাল হতে ১৯৮১ সালের মধ্যে মোট বিশ্ববাজারে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও শাক-সবজী আমদানির পরিমমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৯৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩২৫ মিলিয়ন ডলার, ১৫৬৪ মিলিয়ন ডলার, ১৬০৪ মিলিয়ন ডলার এবং ১৮৯১ মিলিয়ন ডলার। আগামী বছরগুলোতে আংটাড এর হিসাব অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর বিশ্ববাজার নিম্নরূপ হবে বলে অনুমেয় হচ্ছে ঃ

তালিকা – ১

বর্তমান ও আগামী বৎসরগুলোতে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও শাক-সবজীর বিশ্ব-বাজারের প্রাক্কলন

বৎসর	প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর বিশ্ববাজারের প্রাক্কলন[১]	
	মিলিয়ন ডলার	হাজার টনে
১৯৮৬–৮৭	৩,৫৭৩.৩৭৯	২,৮৫৯
১৯৮৭–৮৮	৩,৮৩৭.০৬৯	৩,০৭০
১৯৮৮–৮৯	৪,১০০.৭৫৯	৩,২৮১
১৯৮৯–৯০	৪,৩৬৪.৪৪৯	৩,৪৯২

উপরিউক্ত সারণী নং ১ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় যে, বর্তমানে (১৯৮৬–৮৭ সালে) প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর বিশ্ববাজার আনুমানিক ৩,৫৭৩.৩৭৯ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ (বা আনুমানিক ২৮.৫৯ মেট্রিক টন) এবং উক্ত বাজারের চাহিদা ১৯৯০ সালে দাঁড়াবে আনুমানিক ৪৩৬৪.৪৪৯ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ (বা আনুমানিক ৩৪.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন)।

আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার প্রাক্কলন

যদিও বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর, কিন্তু এদেশে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২ কোটি ২৬ লক্ষ একর আবাদী জমি আছে । উক্ত আবাদী জমির মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ ৮০ হাজার একরে ফলের চাষ হয় এবং ৭ লক্ষ ৭০ হাজার একরে হয় শাক-সবজীর চাষ।[২] বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া বিভিন্ন রকমের ফল ও শাক-সবজী উৎপাদনের জন্য উপযোগী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় দেশে ফলের

১ গড়ে ১ টন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর মূল্য ১২৫০ ডলার ধরে।
২ . স্ট্যাটিষ্টিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৮৬

উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। মাথাপিছু বার্ষিক ফল গ্রহণের পরিমাণ ১৯৫০ সালে ছিল ৩০ কেজি যা ১৯৮৩ সালে মাত্র ১৬ কেজিতে নেমে এসেছে। উক্ত সময়ে দৈনিক মাথাপিছু শাক-সব্জী গ্রহণের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে শাক-সব্জীর একর প্রতি উৎপাদন ৮.০১ শতাংশ হ্রাস পাওয়ায় এর মোট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৪.৯৮ শতাংশ। এ অবস্থায় বাংলাদেশের ৮৫ শতাংশ লোক প্রোটিন ঘাটতিতে ভুগছে, ৪০ শতাংশ লোক পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ' পাচ্ছে না। এবং ৩০ শতাংশ লোক লৌহ জাতীয় খনিজ ঘাটতির শিকার হচ্ছে। জনাব আহম্মদ-এর ১৯৮২ সালের গবেষণা প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশের জনগণের দৈনিক মাথাপিছু ফল ও শাক-সব্জী গ্রহণের পরিমাণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম। ১৯৭৫ সালের বাংলাদেশে মাথাপিছু লভ্য ফলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৩ গ্রাম, যেখানে থাইল্যাণ্ডে ছিল ১২৮ গ্রাম, জাপানে ছিল ১২১ গ্রাম এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৩৯ গ্রাম। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু লভ্য ফলের পরিমাণ এমনকি নেদারল্যাণ্ডস, যুক্তরাষ্ট্র, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি দেশসমূহের তুলনায়ও যথেষ্ট কম দেখা যায়। বাংলাদেশে লভ্য ফলের পরিমাণ এমনকি যদি দ্বিগুণ হতো তবে মোটামুটি সন্তোষজনক বলে ধরে নেয়া যেত। অন্যদিকে, বাংলাদেশে মাথাপিছু লভ্য শাক-সবজীর পরিমাণ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমন মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন এর তুলনায় অপ্রতুল। উক্ত দেশসমূহের মোট কৃষিজাত শস্যের মধ্যে শাক-সবজীর পরিমাণ ২৪ হতে ২৭ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশে মাত্র ১৪ শতাংশ বা ২৭ লক্ষ ৩২ হাজার মেট্রিক টন।[৩]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু লভ্য ফল ও শাক-সবজীর পরিমাণ যথেষ্ট অপ্রতুল। উপরন্তু মোট লভ্য ফল বা শাক-সব্জী সারা বৎসর ধরে পাওয়া যায় না, যার ফলে মাথাপিছু ফল ও শাক-সব্জী গ্রহণের পরিমাণ লভ্য পরিমাণের তুলনায় অনেক কম। পচনশীল এবং মৌসুমী ফল ও শাক-সব্জী তাই সারা বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াসে বাস্তব পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুমেয়। সারা বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য করার কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নে বর্ণিত পন্থাসমূহ বিবেচনার দাবি রাখে।

ক. বাংলাদেশের উৎপাদিত ফল ও শাক-সব্জীর যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পন্থার ব্যবস্থা করা।

খ. কিছুসংখ্যক ফল ও শাক-সব্জী সারা বৎসর চাষের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্য চালিয়ে যাওয়া; এবং

গ. অধিক ফলনশীল ফল ও শাক-সব্জী আবাদ করার লক্ষ্যে চাষীদের অনুপ্রাণিত করা।

৩. 'বিসিক' আয়োজিত বাংলাদেশের ফল ও শাক-সব্জীর প্রক্রিয়াজাত শিল্প বিকাশে সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সেমিনারে উপস্থাপিত জনাব মোস্তাফিজুর রহমানের প্রতিবেদন।

যাহোক, জনাব আহম্মদ এবং করিম এর ১৯৭৭ সালের গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে কমপক্ষে মাথাপিছু ৪ আউন্স বা প্রায় ১২৬ গ্রাম পরিমাণ ফল গ্রহণ করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে এদেশের জনগণের মাথাপিছু শাক–সবজী গ্রহণের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হওয়া বাঞ্ছনীয় যা হিসেব করলে দাঁড়ায় প্রায় ১৫০ গ্রাম।

উপরিউক্ত হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের বৎসরে প্রয়োজন মোট ৪৫ লক্ষ ৯৯ হাজার মেট্রিক টন ফল ও ৪৪ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন শাক–সবজী যার অংশবিশেষ সারা বৎসরে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন।

বর্তমানে যতটুকু পরিমাণই লভ্য ফল ও শাক–সবজী বাংলাদেশের জনগণের আছে তাও আবার প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণের অপ্রতুলতার কারণে সারা বৎসর ধরে জনগণ গ্রহণ করতে পারছে না। অতএব, এদেশের ফল ও শাক–সবজী আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর তাগিদে হলেও ফল ও শাক–সবজী প্রক্রিয়াজাত শিল্পের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে বর্তমানে ফল ও শাক–সবজীসমূহের অন্তত ৫০ শতাংশ পরিমাণ প্রক্রিয়াজাত করা প্রয়োজন বলে বোধগম্য হয়। এ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে ফল ও শাক–সবজীর প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের চাহিদা দাঁড়ায় মোট ২৬ লক্ষ ১৯ হাজার মেট্রিক টন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ৫.২ শতাংশ। এই প্রাক্কলিত হিসেবে উক্ত সময়কালে বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক–সবজীর চাহিদার পরিমাণ তালিকা নং ২–এ দেখানো হলো।

তালিকা – ২

আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক–সবজীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রাক্কলন

(হিসাব হাজার মেট্রিক টনে)

সাল	চাহিদার প্রাক্কলন		
	ফল	শাক–সবজী	মোট
১৯৮৬–৮৭	১১৫০	১৪৬৯	২৬১৯
১৯৮৭–৮৮	১২১০	১৫৪৫	২৭৫৫
১৯৮৮–৮৯	১২৭৩	১৬২৬	২৮৯৯
১৯৮৯–৯০	১৩৩৯	১৭১০	৩০৪৯

উপরিউক্ত তালিকা নং ২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক–সবজীর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে যদি জনসাধারণকে তা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলা যায়। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রাক্কলিত চাহিদা বর্তমানে মোট ২,৬১৯ হাজার মেট্রিক

টন যা ১৯৮৯–৯০ সালে ৩,০৪৯ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা যায়। তবে বর্তমানের এ হিসেবকে একটি নির্দেশমূলক প্রাক্কলন হিসেবে ধরে নেয়াই শ্রেয়। কারণ এখন পর্যন্ত এদেশের জনসাধারণ প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর পরিবর্তে তাজা ফল ও শাক-সবজী গ্রহণে অভ্যস্থ। মান ও গুণগত দিক গ্রহণযোগ্য হলে এবং তা জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার ভেতরে থাকলে উপরিউক্ত প্রাক্কলিত চাহিদা সঠিক বলে অনুধাবন করা যাবে।

রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর চাহিদা

যদিও বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের উৎপাদিত ফল ও শাক-সবজী বিশ্ব বাজারে রপ্তানির সম্ভাবনা যথেষ্ট, কিন্তু এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজী রপ্তানিতে ততটা সফল হয়নি। তবে বাংলাদেশ অল্প পরিমাণে কিছু কিছু তাজাফল ও শাক-সবজী (অপ্রক্রিয়াজাত) বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সাল হতে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে বিশ্ব বাজারে তাজা ফল ও শাক-সবজী রপ্তানির পরিমাণ নিম্নে তালিকা নং ৩ এ দেখানো হলো।

তালিকা – ৩

বাংলাদেশের তাজা (অপ্রক্রিয়াজাত) ফল ও শাক-সবজী রপ্তানির সময়ক্রম খতিয়ান।

সাল	তাজা ফল ও শাক-সবজীর রপ্তানির পরিমাণ [৪]		
১৯৮১–৮২	১১২১	মেট্রিক	টন
১৯৮২-৮৩	১৭৭০	,,	,,
১৯৮৩–৮৪	১৯৮০	,,	,,
১৯৮৪–৮৫	২৩৮৫	,,	,,
১৯৮৫–৮৬	৮৫৭৮	,,	,,

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত তালিকা নং ৩ হতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশ বিগত ৫ বৎসরে কিছু পরিমাণ তাজা ফল ও শাক-সবজী বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে (যেমন- যুক্তরাজ্য মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, উপসাগরী দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নেদারল্যাণ্ডস, ইরান ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি) রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮১-

৪ . উপাত্ত/তথ্য বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে নেয়া।

৮২ সালে বাংলাদেশ ১১২১ মেট্রিক টন পরিমাণ তাজা ফল রপ্তানি করে যা ১৯৮৫-৮৬ সালে দাঁড়ায় ৮৫৭৮ মেট্রিকটন

উপরিউক্ত তাজা ফল ও শাক-সবজী রপ্তানির চাহিদার হিসাব প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর চাহিদা নিরূপণে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ হতে প্রক্রিয়াজাতফল ও শাক-সবজী রপ্তানির কোন চিত্র রপ্তানি বাজারের চাহিদা নিরূপণে গৃহীত হয়নি।

চাহিদার মোট প্রাক্কলন

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর চাহিদা আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই বিদ্যমান। প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর মোট চাহিদার প্রাক্কলন নিম্নে উপস্থাপিত তালিকা নং ৪ এ দ্রষ্টব্যঃ

তালিকা - ৪

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজী মোট চাহিদার প্রাক্কলন

(হাজার মেট্রিক টনে)

বৎসর	প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর মোট চাহিদা প্রাক্কলন		
	আভ্যন্তরীণ বাজার	আন্তর্জাতিক বাজার	মোট
১৯৮৬-৮৭	২৬১৯	২৮৫৯	৫৪৭৮
১৯৮৭-৮৮	২৭৫৫	৩০৭০	৫৮২৫
১৯৮৮-৮৯	২৮৯৯	৩২৮১	৬১৮০
১৯৮৯-৯০	৩০৪৯	৩৪৯২	৬৫৪১

উপরিউক্ত তালিকা নং ৪ এ প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে (১৯৮৭-৮৮) বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে ও আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর মোট চাহিদা দাঁড়াচ্ছে ৫৮২৫ হাজার মেট্রিক টন, যা ১৯৮৯-৯০ সালে হবে ৬৫৪১ হাজার মেট্রিক টন।

সরবরাহ

আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর সরবরাহঃ বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিল্প পরিদপ্তরের ১৯৮৫ সালের প্রাক্কলি [illegible] এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, এদেশে ঐ সময় মোট ৯টি ফল ও শাক-সবজী প্রক্রিয়াজাত প্রকল্প মোট ৫,২৯৯ মেট্রিক টন ক্ষমতা সমেত চালু অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং শিল্প ব[illegible] ও আরো ১,৪০০

মেট্রিক টন ক্ষমতার ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে রুগ্ন হয়ে আছে। উপরন্তু শিল্প পরিদপ্তর হতে জানুয়ারী ১৯৮৭ ইং তারিখে সংগৃহীত তথ্য হতে দেখা যায় যে, আরো ৬টি ফল ও শাক-সবজী প্রক্রিয়াজাত প্রকল্প মোট ২,৭৪১ মেট্রিক টন ক্ষমতা সমেত বর্তমানে চালু অবস্থায় বিদ্যমান। তদুপরি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা হতে গৃহীত তথ্য হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদনকৃত আরো ৫০টি ফল ও শাক-সব্‌জী প্রক্রিয়াজাত প্রকল্প আছে যার মধ্যে ৪১টি প্রকল্প চালু অবস্থায়, ১টি প্রকল্প রুগ্ন অবস্থায় এবং বাকী ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। উক্ত ৫০টি প্রকল্পের মোট ক্ষমতা ৬,০৯৫ মেট্রিক টন বলে অনুমান করা যায়। সর্বসাকুল্যে বাংলাদেশে এপর্যন্ত মোট ১৫,৫৩৫ মেট্রিক টন পরিমাণ বাৎসরিক ক্ষমতাসমেত ৬৬টি ফল ও শাকসব্‌জী প্রক্রিয়াজাত প্রকল্প হয় বাস্তবায়িত অথবা বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। আশা করা যায় যে, আগামী অর্থবছরের মধ্যে সবকয়টি বাস্তবায়নবিহীন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এবং দেশে বর্তমানে সর্বমোট ১৪,৫৫৯ মেট্রিক টন ক্ষমতার পরিবর্তে ১৫,৫৩৫ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে।

প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্‌জীর যোগান-ঘাটতি

ক. আন্তর্জাতিক বাজারে যোগান-ঘাটতিঃ বর্তমানে ও আগামী বৎসরগুলোতে আন্তর্জাতিক/বিশ্ববাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্‌জীর যোগান ঘাটতি তথা বাংলাদেশের জন্য রপ্তানির সম্ভাবনা নিম্নে তালিকা নং ৫-এ দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ৫

বিশ্ববাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্‌জীর যোগান-ঘাটতি

(হাজার মেট্রিক টনে)

বৎসর	বিশ্ববাজারে মোট চাহিদা	বিশ্ববাজারে সরবরাহের পরিমাণ	যোগান ঘাটতি
১৯৮৬-৮৭	২৮৫৯	২৫০০	৩৫৯
১৯৮৭-৮৮	৩০৭০	২৭০০	৩৭০
১৯৮৮-৮৯	৩,২৮১	২৯০০	৩৮১
১৯৮৯-৯০	৩৪৯২	৩১৫০	৩৪২

উপরিউক্ত তালিকা নং ৫-এ প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্‌জীর সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল যার পরিমাণ মোট ৩৫৯০০০ মেট্রিক টন। আগামী ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩৭০০০০ মেট্রিক টন, ৩,৮১০০০ মেট্রিক টন এবং ৩৪২০০০ মেট্রিক টনে। যেহেতু বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে নিজস্ব প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্‌জী এখনো রপ্তানি/সরবরাহ করতে পারেনি কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যদি এই চেষ্টা অব্যাহত থাকে তবে উপরিউক্ত সরবরাহ ঘাটতি আংশিক

বা সম্পূর্ণাংশ মেটাবার প্রয়াসে রপ্তানি বাজারে অনুপ্রবেশ করতে পারবে যা বাংলাদেশের জন্য একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

খ. **আভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান-ঘাটতিঃ** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর চাহিদা, যোগান ও যোগান-ঘাটতি নিম্নে তালিকা নং ৬-এ দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ৬

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর যোগান-ঘাটতি

(হাজার মেট্রিক টনে)

বৎসর	চাহিদা	যোগান	যোগান ঘাটতি
১৯৮৬-৮৭	২৬১৯	১৪.৫৬	২৬০৪.৪৪
১৯৮৭-৮৮	২৭৫৫	১৫.৫৪	২৭৩৯.৪৬
১৯৮৮-৮৯	২৮৯৯	১৫.৫৪	২৮৮৩.৪৬
১৯৮৯-৯০	৩০৪৯	১৫.৫৪	৩০৩৩.৪৬

উপরিউক্ত তালিকা নং ৬ হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জনসাধারণকে যদি যথার্থরূপে বোঝানো যায় এবং গ্রহণযোগ্য মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী তাঁদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া যায়, তবে এদেশে উক্ত দ্রব্যের যথেষ্ট যোগান ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে। বর্তমানে প্রাক্কলিত হিসেবে যোগান-ঘাটতি হচ্ছে ২৬০৪ হাজার মেট্রিক টন পরিমাণ যা আগামী বছরগুলোতে বেড়ে ১৯৮৯-৯০ সালে দাঁড়াবে ৩,০৩৩ হাজার মেট্রিক টন।

বাজারজাতকরণের কলাকৌশল

ক. আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যের বাজারজাতকরণ

১. উৎপন্ন দ্রব্য

বিশ্বের বিভিন্ন রপ্তানি বাজারের চূড়ান্ত ব্যবহারকারীগণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানি চাহিদা। প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর রপ্তানি বাজার যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এবং বিভিন্ন দেশের জনগণের অভিরুচি ও ভোগের ধরনের তারতম্য বিদ্যমান, তাই বিশ্ববাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর বিভিন্ন চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবধরনের ফল ও শাক-সব্জীর বিবরণ যদিও দেওয়া সম্ভব নয়, তবু কিছু কিছু সাধারণ উৎপাদিত সামগ্রীর খতিয়ান আংটাড/গ্যাট এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কেন্দ্রের প্রকাশিত প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর বিশ্ব বাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সাহায্যে নিম্নরূপে দেখানো যায়।

ক. **সাধারণ ভোক্তার/জনসাধারণের ভোগের জন্যঃ** বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জনসাধারণ তাঁদের প্রয়োজন ও অভিরুচির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজী গ্রহণ/ভোগ করে থাকেন। যেমন-মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহে নিদারুণ গরম আবহাওয়া এবং ধর্মীয় কারণে মদ ইত্যাদি তরল পানীয় পরিহারের দরুন প্রক্রিয়াজাত ফল ও ফলের রস সমাদৃত হয়ে থাকে। অপর দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহের জনসাধারণ সাধারণত সকালের নাস্তায় প্রক্রিয়াজাত ফল এবং ফলের রস গ্রহণে অভ্যস্থ। তদুপরী, বিভিন্ন উন্নত দেশসমূহ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ প্রক্রিয়াজাত ফলের পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত শাক-সবজীও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে।

খ. **বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পসমূহের কাঁচামাল হিসেবেঃ** বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পসমূহ যেমন নানা প্রকার পানীয় উৎপাদন শিল্প, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন শিল্প ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাঁদের নিজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রক্রিয়াজাত বিবিধ ফল ও শাক-সবজী ব্যবহার করে থাকে। যেমন বিষুব অঞ্চলীয় (প্রক্রিয়াজাত) ফলমূল প্রয়োজন হয় বিভিন্ন পানীয় উৎপাদন শিল্প প্রকল্পসমূহে। দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্রী এবং শিশু খাদ্য সমেত অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প প্রকল্পসমূহ প্রকারভেদে নানা ধরনের (সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রক্রিয়াজাত) ফল ও শাক-সবজী তাদের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

২. উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম

২.১ বিশ্ব বাজারে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর বিভিন্ন দাম পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশ্ববাজারে যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বা দেশসমূহ তাদের পণ্যের মান ও প্রয়োজনের অনুরূপ প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজী সরবরাহ করতে সক্ষম তারা নিজ দরকষাকষির ক্ষমতাবলে একটু বেশি বা চড়াদামে তাঁদের পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে তাই নতুন ভাবে অনুপ্রবেশ করা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও কিছু কিছু অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশ তাঁদের নিজ প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর দাম দ্রব্যসামগ্রীর মান ও প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীর মোড়ক বা প্যাকিং পদ্ধতির উপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যাহোক, নিম্নে তালিকা নং ৭ এ বিশ্ববাজারের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজীর ১৯৮১-৮২ সালের নমুনা দাম দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৭

রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী	বিশ্ববাজার/ আমদানিকারক দেশ	রপ্তানিকারক দেশ	মান	মোড়ক/ প্যাকিং	১৯৮১-৮২ সালের এফ, ও, বি দাম (প্রতি টনের ডলার হিসাবে)
প্রক্রিয়াজাত আম	পঃ জার্মানী, যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সমেত অন্যান্য আমদানিকারক দেশসমূহ।	ভারত, ব্রাজিল মেক্সিকো, ফিলিপাইন, পেরু অস্ট্রেলিয়া, তাইওয়ান, স্পেন দক্ষিণ আফ্রিকা মালয়েশিয়া, ফ্রান্স থাইল্যাণ্ড, কেনিয়া সোয়াজিল্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী কলম্বিয়া ইত্যাদি	রসাত্মক ১ম মাপের ঘনত্ব/ জমাটমণ্ড ইত্যাদি	গরম বা ঠাণ্ডায় জমানো অবস্থা ধারণক্ষম মোড়ক (টিনজাত বা বোতলজাত	৮৫০-৯০০
,, পেয়ারা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০-৬০০
,, আনারস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৯০০-১৪০০
,, পেঁপে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪০০-৫০০
,, টমেটো	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪০০-৫০০
,, আঙ্গুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৮০০-১০০০
,, কমলা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৮০০-১৩০০
,, লেবু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০-৭৫০
,, লাইম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬০০-৭০০
,, আপেল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৮০০-১০০০
,, শাক-সব্জী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪০০-৬০০

২.২ উপরিউক্ত তালিকা নং - ৭ হতে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, বিশ্ববাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক–সব্জীর দাম উঠানামা করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের ফল ও শাক–সব্জী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়।

৩. বাজারজাতকরণের তৎপরতা

৩.১ বিশ্ববাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে শুধু উৎপাদন করে গেলেই চলবে না। বরং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণে বিভিন্নভাবে বা মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে ক্রয়ে ইচ্ছুক বা প্রলুব্ধ করতে হবে। এব্যাপারে সরবরাহকারী সংস্থা বা দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজ পণ্য পরিচিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন বাজারে ক্রেতাগণের প্রয়োজন ও অভিরুচির পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য নির্ভর প্রতিবেদন এবং তদনুরূপ সরবরাহে সচেষ্ট/সমর্থ হওয়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে নিজ পণ্যের গুণ ও মান সংক্রান্ত স্মারক প্রকাশ বা প্রচার করা সমেত অন্যান্য বিবিধ পন্থা গ্রহণে তৎপর হওয়া একান্ত জরুরী। নিজ পণ্য সামগ্রী বিশ্ববাজারে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও প্রদর্শনী/মেলার ব্যবস্থা অনেক সময় যথোপযুক্ত হয়। তদুপরি নতুন নতুন বাজার বিস্তারের প্রয়াস নেয়া প্রয়োজন যাতে করে নিজ পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করা যায়।

৪. বিতরণের ক্ষেত্রে মাধ্যম

৪.১ বিশ্ব বাজারে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর চাহিদা সৃষ্টিকল্পে বা বিস্তারে বিতরণ মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ কার্যকরী পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আমদানিকারক দেশসমূহের কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে বাজারজাতকরণের যৌথ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

গ. আভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যের বাজারজাতকরণ

১. উৎপন্ন দ্রব্য

১.১ বাংলাদেশের জনসাধারণ সাধারণত তাজা ফল ও শাক-সব্জী গ্রহণে অভ্যস্থ, কিন্তু এদেশে যে পরিমাণ ফল ও শাক-সব্জী উৎপন্ন হয় তা মৌসুমী এবং পচনশীল বিধায় সারা বৎসর ধরে সমভাবে ভোগের জন্য পাওয়া যায় না। অন্যদিকে স্বাস্থ্যগতকারণে এদেশের মানুষের পরিমিত ফল ও শাক-সব্জী সারা বৎসরই গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেহেতু তারা ফল ও শাক-সব্জী সারা বৎসর ধরে সমপরিমাণে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রয়োজন যথেষ্ট, সেহেতু প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী যদি সারা বৎসর ধরে (অমৌসুমে) পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তবে এদেশের মানুষ তা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। এব্যাপারে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন যাতে করে পরিমিত ফল ও শাক-সব্জী অমৌসুমে প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া যায়। ফল ও শাক-সব্জী এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে যাতে দেশের জনসাধারণের

অভিরুচিতে তা গ্রহণযোগ্য হয়। শুধুমাত্র মোড়ক বা প্যাকিং এর উন্নয়নে মনোনিবেশ না করে বরং প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয় মানোন্নয়নের প্রতি খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে মোড়ক বা প্যাকিং মোটামুটি সাদামাটা হলেও চলবে (কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে মানের সাথে মোড়কের ভূমিকাও যথেষ্ট)

১·২ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার বিষুবীয় ফল ও শাক–সবজী উৎপন্ন হয়। এসকল ফল ও শাক–সবজী প্রায় সবগুলোই প্রক্রিয়াজাত করে অমৌসুমে দেশ বিদেশের সাধারণ ভোক্তার ভোগের যোগ্য করা সম্ভব। ফলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-আম, আনারস, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, বড়ই/কুল, নারিকেল, বেল, কলা, আমলকী, জাম্বুরা, পেঁপে, তরমুজ, ফুট/বাঙ্গী, আতা, সফেদা, কঁদবেল, কমলা, লেবু, জলপাই, কামরাঙ্গা ইত্যাদি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য শাক–সবজীসমূহ হচ্ছে লাল শাক, পালং শাক, পুঁইশাক, শালগম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, টমেটো, ঢেড়স, বেগুন, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ডাটা, করল্লা, লেটুসপাতা, গোল আলু, মিষ্টি আলু, শশা, ক্ষিরাই, কচু ইত্যাদি। উক্ত ফল ও শাক–সবজীসমূহের মধ্যে বর্তমানে দেশে প্রতিষ্ঠিত চালু ফল ও শাক–সবজী প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প সমূহ কমলা, লেবু, আনারস, আম, জলপাই, পেয়ারা, টমেটো ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বর্তমানে উৎপন্ন সকল প্রকার প্রক্রিয়াজত ফল ও শাক–সবজীসমূহ সাধারণ ভোক্তার ভোগের জন্য প্রক্রিয়াজাতকৃত হয় এবং অন্যান্য শিল্পসমূহের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার্য তেমন কোন প্রক্রিয়াজাত পদ্ধতি বা প্রকল্প এখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তদুপরি উৎপন্ন দ্রব্যের মান, প্যাকিং/ক্যানিং বা পাত্রজাতকরণ পদ্ধতি তেমন লাগসই না হওয়ায় এটা এখনও জনসাধারণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

২. উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম

২·১ বাংলাদেশে বর্তমানে চালু ফল ও শাক–সবজী প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পসমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম নিম্নের তালিকা নং ৮ এ দেখানো হলোঃ

তালিকা – ৮

আভ্যন্তরীণ বাজারে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক–সবজীর বাজার দাম

প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক–সবজী নাম	একক হিসাবে	গড় বাজার দর (টাকার হিসাবে)
আনারসের রস/জেলি, টমেটোর রস/ জেলি, কমলার রস/ জেলি, আমের রস, লেবুর রস ও বিভিন্ন প্রকারের আচার ইত্যাদি।	মেট্রিক টন	২০,০০০/= হতে ২৫,০০০

উৎসঃ রাঙ্গামাটি ফুড প্রডাক্টস লিঃ চট্টগ্রাম

২.২ বাংলাদেশের আভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী সাধারণ ভোক্তার ভোগের জন বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়ে থাকে। উপরিউক্ত তালিকা নং ৮ হতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি মেট্রিক টন পরিমাণ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীসমূহের গড় বাজারদর টাকা ২০,০০০/= হতে টাকা ২৫,০০০/=।

২.৩ উপরন্তু বিভিন্ন প্রকল্প মালিকদের সঙ্গে আলাপ করে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী উৎপাদনে লাগসই/প্রয়োজনীয় মোড়ক/পাত্র/আধারের অভাব। তাছাড়া বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন-চিনি ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদির দাম যথেষ্ট বেশি বিধায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজার দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারছে না অথবা নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৩. আভ্যন্তরীণ বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারজাতকরণ তৎপরতা

৩.১ বর্তমানে দেশের চালু প্রকল্পসমূহ তাদের প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর বাজারজাতকরণে তেমন কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করছে না বিধায় জনসাধারণ তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ বা ব্যবহারের সুবিধাদি সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত নয়। একারণে আভ্যন্তরীণ বাজারে উক্ত দ্রব্যের চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। জনসাধারণকে প্রক্রিয়াজাত ফল শাক-সব্জী গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঐ সকল উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার্য সুবিধাদি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ সম্বলিত প্রচার অভিযান বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। তদুপরি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জীর ব্যবহারিক সুবিধা, গুণাগুণ ও স্বাস্থ্যগত কারণে প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশের প্রয়াস নেয়া দরকার। দেশের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমেও উক্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার/ভোগের পক্ষে যথার্থ শিক্ষাদানের উদ্যোগ প্রয়োজন যাতে করে এদেশের জনসাধারণ শুধুমাত্র তাদের চিরাচরিত রুচির বশবর্তী হয়ে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী গ্রহণে অনীহা না করে।

৪. আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী বিতরণের মাধ্যম/ক্ষেত্র।

৪.১ বাংলাদেশের উৎপন্ন প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌছানোর ব্যাপারটিও একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে উক্ত দ্রব্যাদির চাহিদা নিরূপণে জনসাধারণের প্রয়োজনবোধে উক্ত দ্রব্যাদি যদি তাদের সাধ্যের মধ্যে সহজে পেতে পারে তবে তা তারা গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বিতরণ মাধ্যমের ভূমিকাও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে চালু প্রকল্পসমূহ তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সরাসরি খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। কিছু কিছু

প্রকল্পসমূহ তাদের দ্রব্যাদি মধ্যম ব্যবসায়ীদের বা পাইকারী বিক্রেতাদের মাধ্যমে খুচরা ব্যবসায়ী বা দোকানদারদের নিকট পৌছায় এবং পরে খুচরা দোকাদারগণ তা ভোক্তার নিকট পৌছে দেয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা ভিত্তিক কমিশন এজেন্ট বা মধ্যম ব্যবসায়ী নিয়োগ করে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারজাত করতে পারে, যা পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে পৌছাতে সাহায্য করবে এবং উৎপাদনকারী তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের পরিধি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজী প্রকল্পসমূহ উন্নয়নে সরকারী নীতিমালা

১. বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিজাত প্রকল্পসমূহ উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কৃষি সহায়ক ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নে বেসরকারী খাতে ২০০ কোটি টাকা (যা সরকারী খাতে মোট ৩,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দের ৬.৩%) এবং সরকারী খাতে ৬৫ কোটি টাকা (যা সরকারী খাতে মোট ২,৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দের ২.৫%) বরাদ্দ হয়েছে। তদুপরি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে (অবকাঠামো গঠন সমেত অন্যান্য কার্যসম্পাদনে) আরো ৬০ কোটি টাকা সরকারী খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্পনীতি ১৯৮৬ প্রণীত হয়। অত্র শিল্পনীতিতে কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংগ্রহণ প্রকল্পসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এবং তদুদ্দেশ্যে এটাকে তাদের "উৎসাহ তালিকার" অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তদুপরি শিল্পনীতির বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প পরিদপ্তর এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা কর্তৃক দুটি পৃথক "শিল্প বিনিয়োগ তফশীল" প্রণীত হয়। শিল্প পরিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিনিয়োগ তফশীলে ইহা ব্যক্ত হয় যে, দেশের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন কল্পে ফল ও শাক-সবজী প্রক্রিয়াজাত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ প্রাধান্যের সঙ্গে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা কর্তৃক প্রণীত বিনিয়োগ তফশীল অনুযায়ী অনুমোদন ও অর্থায়ন করা যাবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা কর্তৃক প্রণীত বিনিয়োগ তফশীলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সবজী প্রকল্পসমূহ উন্নয়নে মোট ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দ করা হয়েছে।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

বর্তমানে দেশে প্রতিস্থাপিত ফল ও শাক-সবজী প্রক্রিয়াজাত প্রকল্পসমূহের উন্নয়ন কল্পে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

ক. প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী তৎপরতা জোরদার করা। এ ব্যাপারে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহকে কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্রতী হওয়া এবং বিদেশে বেসরকারী উদ্যোক্তাগণকে তাদের পণ্য রপ্তানি কল্পে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ও ব্যবসায়ীক সফরকে উৎসাহিত করা।

খ. দেশে ও বিদেশে গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাক-সব্জী গ্রহণের/ভোগের সুবিধা ও উপকারিতা সংক্রান্ত তথ্য নির্ভর প্রচার অভিযানে সরকারী ও বেসরকারীভাবে তৎপর হওয়া।

গ. পণ্যের মান উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া,

ঘ. উৎপাদনকারী যাতে তাদের ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় "চলতি মূলধন" সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ঙ. সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে উক্ত প্রকল্পসমূহের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা।

চ. আমদানিকৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর সরকারী কর রেয়াত বা কমানোর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ছ. রপ্তানি উন্নয়নে প্রকল্পসমূহকে রপ্তানি সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদান নিশ্চিত করা এবং আইনগত জটিলতা রহিত করা।

জ. প্রকল্পসমূহে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাটামোগত সুবিধাপ্রদান নিশ্চিত করা।

ঝ. সরকারী পর্যায়ে প্রকল্পসমূহের সমস্যা দূরীকরণে প্রতি তিনমাস অন্তর জাতীয় ভিত্তিক আলোচনা সভা করা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে তড়িৎ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান করা, এবং

ঞ. এদেশের কৃষিজ পণ্য তথা বিবিধ ফল ও শাক-সব্জী উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কার্যকরী এবং বাস্তব সম্মত দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সপ্তম অধ্যায়

পান

ভূমিকাঃ পানের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণের টান বহুকালের। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে পানের ব্যবহার চলে আসছে। বাংলা সাহিত্যেও পান বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পানের রসসিক্ত সুন্দরীর ওষ্ঠের বর্ণনা ঘাটে ডিঙ্গা লাগিয়ে বন্ধুকে পান খেয়ে যাওয়ার আহ্বান এবং ঘুমপাড়ানী মাসিপিসীকে বাটা ভরে পান দেয়ার ছড়া আজকাল অবশ্য কমই শোনা যায়। তবে পান বেঁচে আছে, গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা পানকে বাঁচিয়ে রেখেছে; যদিও শহরে ও ধনী সমাজে পানের ব্যবহার ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশে পান বিশেষ করে অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে, শখ করে অথবা ভদ্রতার খাতিরে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে ঈদ, পূজা, বিয়ে, বৈঠক এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে পান বেশি ব্যবহৃত হয়। পানের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা এবং অসুবিধা নেই। তবে পান খাওয়ার অভ্যাস তামাক, সিগারেট ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অভ্যাস বা নেশার চেয়ে উৎকৃষ্ট একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পান খাওয়ার অন্যতম উপাদান সুপারী, চুন, খয়ের, জর্দা বা তামাক ইত্যাদি। ইদানীংকালে গবেষকরা সুপারীর মধ্যে মানব স্বাস্থ্যের উপকারী উপকরণের সন্ধান পেয়েছেন। তবু চিকিৎসা বিজ্ঞান পান খাওয়াকে সমর্থন করেন না। এতদশর্ত্বেও এই উপমহাদেশের কয়েক কোটি লোক পান খাওয়ার অভ্যাস বজায় রেখেছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে পানের চাষ ও ব্যবহার হয়। পানসেবী বহুলোক বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান করছে। পান বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য হয়ে উঠেছে একারণেই। পানের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদার কথা বিবেচনা করে পানের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের দিকে বিশেষ নজর দেয়া আবশ্যক।

উৎপাদন এলাকা ও পরিমাণ ঃ আমাদের দেশে পান উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের মধ্যে বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা, সিলেট, রংপুর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েক বছরের পান চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ১

বাংলাদেশের পান চাষ

বছর	চাষের জমি একরে	উৎপাদন মেট্রিক টন
১৯৭৬-৭৭	২৬,৭৫০	৫১,১৬০
১৯৭৭-৭৮	২৭,৮৩৫	৫৬,৯৫০
১৯৭৮-৭৯	২৭,৯৪১	৫৪,১৯৫
১৯৭৯-৮০	২৮,৬১৩	৫৪,০২৮
১৯৮০-৮১	২৯,৯৪০	৫৯,৩৬৩
১৯৮১-৮২	৩১,৩৮০	৬১,০৬৮
১৯৮২-৮৩	৩২,১৪০	৭১,৩২৫
১৯৮৩-৮৪	৩১,৬২৫	৬১,২৫১
১৯৮৪-৮৫	৩০,৮৮৩	৬১,৮৯৫

সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ, ঢাকা

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পান উৎপাদন হয় বরিশাল জেলায় এবং সবচেয়ে কম উৎপাদন হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। তবে এদেশের সর্বত্রই কমবেশি পান চাষ হয়। নিম্নে ১৯৮৪-৮৫ সালের পানের জেলা (পুরাতন) ভিত্তিক উৎপাদন দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ২

বাংলাদেশে জেলাওয়ারী পানের উৎপাদন ১৯৮৪-৮৫ (লংটন হিসেবে)

জেলা	উৎপাদন	জেলা	উৎপাদন
বরিশাল	১৩,০৭৫	পটুয়াখালী	৮৬১
চট্টগ্রাম	৭,৯৯৯	বগুড়া	৮১০
রাজশাহী	৭,৬২৯	পাবনা	৪৩৯
খুলনা	৭,৪৮৮	কুমিল্লা	৭৪৫
যশোর	৪,৫০৪	কিশোরগঞ্জ	৬০২
ফরিদপুর	৩,১৫৮	টাঙ্গাইল	৪২৭
কুষ্টিয়া	২,৮৮২	জামালপুর	৩৯০
ঢাকা	২,৩২২	দিনাজপুর	৭৪১
সিলেট	১,৭৮৪	খাগড়াছড়ি	১৩৬
রংপুর	১,৭৪৫	বান্দরবন (পাহাড়)	২৬
নোয়াখালী	১,৭২৩	রাঙামাটি (পাহাড়)	২২
ময়মনসিংহ	১,৪২৯		

সূত্রঃ বি. বি. এস.

পানের প্রকারভেদ

আমাদের দেশে সাধারণত কয়েক প্রকার পান দেখা যায়, যেমন– মিঠাপান, বাংলা পান, সাঁচী পান, কপুরী পান, গাছ পান প্রভৃতি।

মিঠাপানঃ এ ধরনের পান স্বাদে মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত। এর রং শ্বেত আভাযুক্ত সবুজ। আমাদের দেশে এ পানের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

বাংলা পানঃ এই পান আকারে ছোট ও পুরু তবে উৎপাদনের এলাকা অনুসারে বড়ও হয়। এর ব্যবহার মোটামুটি।

সাঁচী পানঃ দেখতে অবিকল মিঠা পানের মত, চিবানোর সময় কর্পূরের অনুরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। যার কারণে অনেকেই এ পান পছন্দ করে না। এই পান রপ্তানি বাজারে সমাদৃত।

গাছ পানঃ এ জাতীয় পান অতি নিকৃষ্ট। এই পান আম, কাঁঠাল, সুপারী প্রভৃতি গাছ আশ্রয় করে লতিয়ে উঠে ও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

রুচি ও পছন্দের ভিন্নতার কারণে এক এক শ্রেণীর গ্রাহক এক এক শ্রেণীর পান পছন্দ করেন। পান পছন্দের ব্যাপারে আঞ্চলিক পার্থক্যও দেখা যায়।

পানের চাষ

সাধারণত বেলে দোআঁশ মাটি ও অল্প লবণাক্ত মাটি পান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। জমিটি ঢালু প্রকৃতির হওয়া উচিত যাতে বৃষ্টির পানি জমতে না পারে। পানের চাষ সাধারণত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার এক্ষেত্রে কম। খৈল ব্যবহার করা হয় বেশি। পান গাছ অতিরিক্ত রৌদ্রতাপ ও শীতের হাত থেকে রক্ষার জন্য সেড় নির্মাণ করে দিতে হয়। সেড় নির্মাণে পাটখড়ি, মুলি ও খড় ব্যবহৃত হয়। শীতকালে পানের বরজে পানি সেচের ব্যবস্থা করে দিতে হয় যা বেশ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল কাজ। রোপণের ৯/১০ মাস পর হতে পানের পাতা সংগ্রহ শুরু করা হয়। একটা পানের বরজ ১০/১৫ বছর টিকে থাকে এবং বছরের সব সময় পান সংগ্রহ করা যায়। তবে বর্ষাকালে সর্বাধিক পান তোলা হয়। পান তোলার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যাতে গাছে আঁশ না উঠে। পানকে ধুয়ে ঝুঁড়িতে করে বাজারে আনা হয়।

পানের উৎপাদন খরচ

পানের উৎপাদন খরচ হিসাব করা বেশ জটিল কাজ। কারণ একবার পান লাগালে ১০/১৫ এমনকি ২০ বছর পর্যন্ত ফসল তোলা যায়। বরজ যতদিন টিকে থাকে ততদিনই কিছু না কিছু খরচ লেগেই থাকে। চুয়াডাঙ্গা জেলার তালতলা গ্রামের জনৈক পান চাষী প্রদত্ত এক একর আয়তন বিশিষ্ট একটি পানের বরজের প্রথম তিন বছরের খরচ নিম্নরূপ ঃ

তালিকা – ৩

বিবরণ	টাকা
জমি চাষ, খনন ও মজুরী	২০,০০০/=
সেড নির্মাণ (বাঁশ, পাটখড়ি, খড় ইত্যাদি)	১০,০০০/=
খৈল ও সার	১০,০০০/=
সেচ (শ্যালো মেশিন)	৮,০০০/=
অন্যান্য	২,০০০/=
মোট	৫০,০০০/=

উৎস ঃ খামার বাড়ি

এছাড়াও পান নিকটস্থ বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করার জন্য বেশ কিছু খরচ হয় যেমনঃ পরিবহণ খরচ। পান উৎপাদনে সবচেয়ে বড় খরচ হচ্ছে মজুরী খরচ। একর প্রতি দৈনিক কমপক্ষে ৫জন শ্রমিক বছরের সব সময় প্রয়োজন হয়।

পানের গ্রেডিং ও গণনা

পানের শ্রেণীবিন্যাস বা গ্রেডিং সাধারণত পাতার আকারের ভিত্তিতে করা হয়। বড়, মাঝারি ও ছোট এই তিন ভাগে পানকে ভাগ করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীবিন্যাস সাধারণত উন্নতমানের হয় না। অর্থাৎ প্রায়ই ছোট বড় পান একসাথে মিশানো থাকে। বিভিন্ন জাতের পান আলাদাভাবেই উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পান বিভিন্নভাবে গণনা করা হয়। দেশের কোন কোন স্থানে ২০ গণ্ডায় এক বিড়া, ২৪ গণ্ডায় এক বিড়া, ২৮ গণ্ডায় এক বিড়া ইত্যাদি গণনা বিরাজমান। তবে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই ২০ গণ্ডায় অর্থাৎ ৮০ টায় ১ বিড়া হিসেবে কেনা-বেচা হয়।

পানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা

পান দ্রুত পঁচে বা শুকিয়া যায়। পানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয় বলে পরিবহণ ও বিক্রির সময় প্রচুর পরিমাণ পান নষ্ট হয়ে যায়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে পানের বাজারজাতকরণ ব্যয় বেড়ে যায়। পানের সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে এবং ভাল ফলও পাওয়া গেছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই গবেষণার ফল ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। পান সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি রাখা যায় না। কাঁচা এবং তাজা অবস্থায় রাখা ছাড়া পানের অন্য কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র দ্রুত ও দক্ষ পরিবহণ দ্বারাই এই সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

বন্টন প্রণালী

কৃষক পান সংগ্রহ করে গ্রেডিং করে বানা করে বিড়া অনুসারে সাজিয়ে টুকরিতে করে নিকটস্থ পাইকারী বাজারে নিয়ে যায়। সেখানে দালাল ও বেপারীরা সাধারণত নিলাম ডাকে পান ক্রয় করে এবং পাইকারী বাজারের মাধ্যমে দুইভাবে বিক্রি করে। প্রথমত পাইকারী বাজার থেকে স্থানীয় খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয় এবং খুচরা বিক্রেতা পান ব্যবহারকারীর কাছে বিক্রি করে। স্থানীয় খিলি পান বিক্রেতারার পানের খুচরা কারবারীদের কাছ থেকে গোটা পান ক্রয় করে। দ্বিতীয়ত পাইকারী বাজার থেকে বেপারীরা দূরে পান চালান দিয়ে সেখানকার পাইকারী বাজারের মাধ্যমে আবার খুচরা বিক্রেতার কাছে পান বিক্রি করে যারা পরে প্রকৃত ভোক্তার কাছে পান বিক্রি করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা থেকে পান ঢাকায় আসে। নৌকা,

গরু ও ঘোড়ার গাড়ী, ভ্যান, সাইকেল ও মাথায় করে স্থানীয় পাইকারী বাজারে পান নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে লঞ্চ, ট্রাক, বাস ও রেলে করে পান দূর-দূরান্তে চালান দেয়া হয়। ঢাকার কয়েকজন আড়তদার বিদেশে পান রপ্তানি করে থাকেন।

পান রপ্তানি

বাংলাদেশ যে সব দেশে পান রপ্তানি করে তার মধ্যে পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান, সুইডেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বিভিন্ন দেশে পান রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৪

পান রপ্তানি

১৯৮৪–৮৫

দেশের নাম	মূল্য (হাজার টাকা)	শতাংশ
পাকিস্তান	১৬,৬৫৭	৪৬.৭১
যুক্তরাজ্য	৯,৮১৯	২৭.৫৩
সৌদি আরব	৫,০১৪	১৪.০৬
কুয়েত	৩,১৯৩	৮.৯৫
কাতার	৪৪৫	১.২৫
ইউ. এ. ই	৩৫৯	১.০১
ওমান	১৭৫	০.৪৯
সুইডেন	—	—
মোট	৩৫,৬৬২	১০০.০০

সূত্রঃ বাংলাদেশ রপ্তানি পরিসংখ্যান ১৯৮৪–৮৫

পানের মূল্য

পানের মূল্যের ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মূল্যের মৌসুমী উঠানামা। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে পান গাছ দ্রুত বড় হয় ফলে নীচের দিক দিয়ে "পাইয়ান" (মাটিতে নামানো) দিতে হয় ফলে কৃষককে বাধ্যতামূলকভাবে পান তুলতে হয় যার কারণে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হয়, তাছাড়া তখন মধ্যস্থকারবারীরা জোটবদ্ধ হয়ে কমমূল্যে পান ক্রয় করে। নিম্নে ১৯৭৫ ও ১৯৮৫ সালের পানের মৌসুমী মূল্যের জাতীয় গড় দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৫

বাংলাদেশের পানের গড় মূল্য ১৯৭৫ ও ১৯৮৫
(গাদি প্রতি টাকায়) ১ গাদি = ৬০০০ পান

মাস	১৯৭৫	১৯৮৫
জানুয়ারী	১৬১,২৭	৬৩৮.০০
ফেব্রুয়ারী	১৭৪.৫৫	৬৪৭.০০
মার্চ	২৪৫.৪৭	৬৭৮.০০
এপ্রিল	৩২২.১৭	৭১৭.০০
মে	২৯১.২০	৬১৫.০০
জুন	২২৫.৮৭	৫১৬.০০
জুলাই	১৭৫.০৫	৩৬০.০০
আগস্ট	১৪৭.৮৯	৩২১.০০
সেপ্টেম্বর	১৩৫.০৭	২৯৭.০০
অক্টোবর	১৩৯.১৯	৩১১.০০
নভেম্বর	১৫৬.১৪	৩৫৩.০০
ডিসেম্বর	১৯২.৫৯	৩১৯.০০

সূত্রঃ কৃষি বাজার বিভাগ

উপরিউক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এপ্রিল মাসে পানের দাম সবচেয়ে বেশি থাকে এবং সেপ্টেম্বর মাসে পানের দাম সবচেয়ে কম থাকে। বড় পান খিলি পান হিসাবে ফেরিওয়ালা ও টং দোকানদাররা বিক্রি করে। বড় একটা পান থেকে দুই তিন খিলি পান তৈরি করা হয়; যার ফলে বড় পানের দামও বেশি হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বড় পান ক্রয় করা হয় তাই বছরের সব সময়ই বড় পানের দাম বেশি থাকে।

পান চাষী

খুচরা বাজারে পানের দাম গত এক দশকে অনেক বেড়েছে। কিন্তু কৃষক পানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। তাদের খরচ পোষায় না। পানের চাষও পানের বরজের জন্য পাটখড়ি, খড়, বাঁশ, খৈল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম গত দশ বছরে অন্তত দ্বিগুণ বেড়েছে। পুঁজির অভাবও দেখা দিয়েছে প্রকটভাবে। উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় গত ১৫ বছরে পান চাষ অর্ধেক

হ্রাস পেয়েছে। এসব জেলায় ৫৫ হাজার পান চাষী গত ৫ বছরে পান চাষ করতে গিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে এই তথ্য জানা গেছে। উৎপাদন পদ্ধতির আদিমতা, উৎপাদনের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, পুঁজি সঙ্কট, বাজারে মধ্যস্থকারবারীদের দৌরাত্ম্য প্রভৃতির কারণে পান চাষ এখন লাভজনক নয়। কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে তার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে যার জন্য পান চাষের দুঃসময় যাচ্ছে।

রপ্তানিযোগ্য এই ঐতিহ্যবাহী পানকে পতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। পান চাষের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা, চাষীদের প্রয়োজনীয় ঋণদান, উপকরণাদি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা, মধ্যস্থকারবারীদের থেকে রক্ষার জন্য পানচাষী সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং পান বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা করা হলে পান চাষ ও চাষী বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জরুরী দৃষ্টি আবশ্যক।

অষ্টম অধ্যায়

চিংড়ি

চিংড়ি আমাদের অন্যতম রপ্তানি পণ্য। বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা এবং মূল্য ক্রমবর্ধমান। ১৯৮৪–৮৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশে মোট চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৫৮৮ মেট্রিক টন। এদেশের অসংখ্য নদ-নদী, হাওড়–বাওড় খাল–বিল, পুকুর–দীঘি এবং মৌসুমী জলাশয়ের মোট আয়তন প্রায় ১০৭ লক্ষ একর। এছাড়া বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে আমাদের নিজস্ব সামুদ্রিক জলসীমা। ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল এলাকা থেকে গভীর সমুদ্রের অভ্যন্তরে দুইশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে নিজস্ব অর্থনৈতিক সমুদ্র অঞ্চল। যার আয়তন প্রায় ৪৮,০০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল। এসকল এলাকার বেশির ভাগই চিংড়ি চাষ অথবা আহরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে চিংড়ি রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ বছরে এক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। চিংড়ি চাষের ও আহরণের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, চাষ এবং আহরণ এলাকা সম্প্রসারণ, প্রতিবেশ সংরক্ষণ বর্ধিত চিংড়ি উৎপাদনের সহায়ক হবে। যেহেতু চিংড়ি আমাদের রপ্তানি পণ্য সেহেতু চিংড়ি আহরণ, সংরক্ষণ এবং মান নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদন থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশে কৃষকরা দরিদ্র ও নিরক্ষর বিধায় তাদের পক্ষে এসমস্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে তাদেরকে বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ইদানীংকালে এ ব্যাপারে কিছু কিছু সরকারী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিংড়ি চাষ, আহরণ ও বাজারজাতকরণ প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে যার জন্য চিংড়ির উৎপাদন ও বাজারজাতকণ সমস্যাসমূহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচনা আবশ্যক।

চিংড়ির প্রজাতি ও শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ প্রজাতির চিংড়ি দেখা গেছে। উল্লেখযোগ্য প্রজাতিসমূহ নিম্নরূপঃ

মিঠা পানির চিংড়ি	লোনা পানির চিংড়ি
গলদা চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি
ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি	চাপড়া চিংড়ি
শলা চিংড়ি	হরিনা চিংড়ি
ছটকা চিংড়ি	বাঘা চিংড়ি
কাঠালিয়া চিংড়ি	কোলা চিংড়ি
কাইরা চিংড়ি	লাল চামা চিংড়ি
গোদা চিংড়ি	
কুঞ্চ চিংড়ি এবং	
লটিয়া চিংড়ি	

গলদা চিংড়ি ঃ এই চিংড়ি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে সেপ্টেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অধিক পরিমাণে ধরা হয়, কিন্তু জুন হতে আগস্ট পর্যন্ত খুব কম পাওয়া যায়। জুন মাসে এরা ডিম ছাড়ার জন্য সুন্দরবন মোহনার নিম্নাঞ্চলে চলে যায়। তখন ঐ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। গলদা চিংড়ি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক চিংড়ি। এরা আকৃতিতে সর্ববৃহৎ বলে বিদেশে চাহিদা প্রচুর। মস্তক বিচ্ছিন্ন করার পর ৫১.৩৩% ওজন রক্ষিত হয়।

ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি ঃ এই চিংড়ি নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওড়ের মিঠা পানিতে বিশেষ করে জলজ আগাছাপূর্ণ এলাকায় বাস করে। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় এই চিংড়ি কমবেশি পাওয়া যায়। তবে শুষ্ক মৌসুমে সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার খালবিল ও হাওড়ে এদের পাওয়া যায়। ঠেঙ্গুয়া আকৃতিতে বড় এবং বাণিজ্যিক চিংড়ি।

শলা চিংড়ি ঃ এই চিংড়ি সাধারণত মিঠা ও অপেক্ষাকৃত কম লোনা পানিতে পাওয়া যায়। জুলাই হতে নভেম্বর পর্যন্ত বাগেরহাট এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলায় প্রচুর পরিমাণে শলা চিংড়ি ধরা হয়ে থাকে। বর্ষার মৌসুমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এবং শুষ্ক মৌসুমে চট্টগ্রামের হালদা নদীতে প্রচুর শলা চিংড়ি পাওয়া যায়।

ছটকা চিংড়ি ঃ এই চিংড়ি মিঠা পানি ও মোহনার লোনা পানিতে বাস করে। বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জুন হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত এরা মেঘনা নদীতে ডিম দেয়। তখন এদের চাঁদপুর ও দাউদকান্দি এলাকায় ধরা হয়।

কাঠালিয়া চিংড়ি ঃ মিঠা পানিতে বসবাসকারী কাঠালিয়া চিংড়ি আকৃতিতে ছটকা চিংড়ির চেয়ে একটু ছোট। চাঁদপুর, দাউদকান্দি, চট্টগ্রাম ও বাগেরহাট এলাকায় পাওয়া যায়।

কাইরা চিংড়ি ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র এই চিংড়ি পাওয়া যায়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদেরকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

গোদা চিংড়ি ঃ দেশের সর্বত্র বছরের সবসময় পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ধানক্ষেতে ও অন্যান্য জলজ আগাছাপূর্ণ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ধরা হয়।

কুচু চিংড়ি ঃ সকল ঋতুতে দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ।

লটিয়া চিংড়ি ঃ মিঠা পানির এই চিংড়ি নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বেশি পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির এই চিংড়ি কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বাজারেই বিক্রি হয়।

বাগদা চিংড়ি ঃ সমুদ্রে ও মোহনার লোনা পানিতে বাস করে। বিশেষ করে জলজ আগাছাপূর্ণ এলাকায়, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, সুন্দরবন মোহনায় এবং বঙ্গোপসাগরে এদের প্রচুর পাওয়া যায়। বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর

পরিমাণে এই বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায়। এটা বাণিজ্যিক চিংড়ি, বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পচন ধরার আশঙ্কা বেশি হওয়ায় বাজারে নেয়ার সাথে সাথে এসকল চিংড়ির মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বরফ দিয়ে রাখা হয়। মস্তক বিচ্ছিন্ন করার পর ৭১-৪৪% ওজন রক্ষিত হয়। জুন থেকে আগস্ট সময়ে সবচেয়ে বেশি ধরা হয়।

চাপড়া চিংড়ি ঃ সমুদ্রে ও মোহনায় লবণাক্ত পানিতে বাস করে। এই বাণিজ্যিক চিংড়ি এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বেশি পাওয়া যায়। বেশ সুস্বাদু এই চিংড়ি বাগেরহাট অঞ্চলের অধিবাসীদের খুব প্রিয় খাদ্য। পচন ধরার পূর্বেই মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বরফ দেওয়া হয়।

হরিনা চিংড়ি ঃ লোনা পানির এই চিংড়ি পটুয়াখালী, বাগেরহাট, সুন্দরবন মোহনায় এবং বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। এটা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক চিংড়ি।

বাঘা চিংড়ি ঃ পটুয়াখালী, বাগেরহাট, সুন্দরবন মোহনায় ও বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়।

কোলা চিংড়ি ঃ লোনা পানির এই চিংড়ি সুন্দরবন মোহনায় ও বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়।

লাল চামা চিংড়ি ঃ জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চিংড়ি পটুয়াখালী, বাগেরহাট ও সুন্দরবন মোহনায় প্রচুর পাওয়া যায়।

এছাড়াও আরও অনেক প্রজাতির চিংড়ি বাংলাদেশে পাওয়া যায়। যেমনঃ গুড়ি চিংড়ি, লালিয়া চিংড়ি, কেরানী চিংড়ি, কচু চিংড়ি, খরখরিয়া চিংড়ি, রোভা চিংড়ি, মইসা চিংড়ি ইত্যাদি। বহু প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া গেলেও সব প্রজাতিই বিদেশে রপ্তানি করা হয় না। কিছু কিছু চিংড়ি কেবলমাত্র দেশেই ব্যবহৃত হয়।

চিংড়ি চাষ এলাকা

আমাদের দেশে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য তেমন নির্দিষ্ট বেশিসংখ্যক এলাকা নেই। উপকূলীয় এলাকায় লোনা পানি আটকিয়ে এই চিংড়ি চাষের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশের গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন পুকুর, নদী–নালা, ডোবা প্রভৃতিতে চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে আনুমানিক ৭০ হাজার একর জোয়ার ভাটা প্রবাহিত এলাকায় চিংড়ির চাষ হচ্ছে। যার মধ্যে খুলনা এলাকায় ৪০ হাজার একর এবং চট্টগ্রাম এলাকায় ৩০ হাজার একর। বাংলাদেশের চিংড়ি চাষভুক্ত এলাকা ও আয়তন নিম্নরূপ (তালিকা – ১)ঃ

তালিকা – ১

বাংলাদেশের চিংড়ি চাষভুক্ত এলাকা ও আয়তন

এলাকা (জেলা)	আয়তন (একর)
খুলনা	১৫,০০০ একর
সাতক্ষীরা	১৫,০০০ একর
বাগের হাট	১০,০০০ একর
চট্টগ্রাম	১,০০০ একর
কক্সবাজার	২৯,০০০ একর

সূত্রঃ মৎস্য বিভাগ

এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের মৎস বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য চিংড়ি চাষ উপযোগী এলাকা নিম্নরূপ (তালিকা – ২)ঃ

তালিকা – ২

বাংলাদেশে সম্ভাব্য চিংড়ি চাষ উপযোগী এলাকা

এলাকা	আয়তন
চট্টগ্রামের কক্সবাজার	৫৫,০০০ একর
চট্টগ্রামের বাকী অংশ	১৫,০০০ একর
নোয়াখালীর হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ	৩০,০০০ একর
বরিশালের ভোলা ও পটুয়াখালীর	
রাঙ্গাবালি, গলাচিপ, মহিপুর, খেপুপাড়া,	
চর জনাই, পাথর ঘাটা	৫০,০০০ একর
খুলনা	৮৫,০০০ একর

সূত্রঃ মৎস্য বিভাগ

বিভিন্ন এলাকায় একর প্রতি উৎপাদন তিনটি নমুনা বা মডেলে ভাগ করে দেখানো হল (তালিকা – ৩)ঃ

তালিকা – ৩

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের বিভিন্ন মডেল

	মডেল – ১	মডেল – ২	মডেল – ৩
স্থান	খুলনা জেলা	কক্সবাজার	ম্যানগ্রোব জলাভূমি
		মহেশখালী	রামপুরা
		চকরিয়া	চকরিয়া
		কুতুবদিয়া	
চাষ পদ্ধতি	চিংড়ি/ধান	চিংড়ি/লবণ	চিংড়ি
উৎপাদন (চিংড়ি)			
কিঃ গ্রাম/হেক্টর	৪০	৩০	৫০
কিঃ গ্রাম/একর	১৬	১২	২০

সূত্র ঃ মৎস বিভাগ

চিংড়ি উৎপাদনের সমস্যা

বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ এখনো সনাতন পদ্ধতিতে হচ্ছে। এতে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০–৬০ কিঃ গ্রাম/হেক্টর। উন্নত কলাকৌশল পদ্ধতির সাহায্যে ইকোয়েডর ও ক্যালিফোর্নিয়াতে চিংড়ির উৎপাদনের হার ৫০০ কিঃ গ্রাম/হেক্টর। খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার নীচু ও ধানী জমিতে, চট্টগ্রামের কক্সবাজারের লবণ উৎপাদন এলাকায় এবং চকরিয়া সুন্দরবনের ম্যানগ্রোব বনাঞ্চলে বর্তমানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। চিংড়ি মাছ উৎপাদনে আমাদের সমস্যা অনেক। প্রধান সমস্যাসমূহ হচ্ছে ঃ

১. উন্নত জাতের প্রজাতি বাছাই-এর সমস্যা।
২. কৃষকের পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব।
৩. খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের সমস্যা।
৪. কৃত্রিমভাবে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনের সমস্যা।
৫. রোগ ও পরজীবী আক্রমণ থেকে রক্ষাকরণের সমস্যা।
৬. বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব।

এসকল সমস্যার জন্য ব্যাপক চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্তমানে সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আমাদের চিংড়ি উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে। বিগত কয়েক বৎসরের চিংড়ি উৎপাদন নিম্নরূপ ছিল (তালিকা-৪) ঃ

তালিকা - ৪

বাংলাদেশে চিংড়ি উৎপাদন

জেলা	১৯৮৩-৮৪ উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃ টন)	১৯৮৪-৮৫ উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃ টন)
কক্সবাজার	১৮৩৪	২৫৫৩
সাতক্ষীরা	২৫১৪	৪৮৭৮
যশোর	৩৩	৫৭
পটুয়াখালী	৩	৫
নোয়াখালী ও ভোলা	০	৮৫

সূত্রঃ মৎস বিভাগ

চিংড়ির বাজারজাতকরণ

পণ্যমানঃ বাংলাদেশ হিমায়িত চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিকৃত চিংড়ি থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে ২৫টি ও খুলনায় ১৮টি কারখানা চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাপৃত আছে। আমাদের কারখানাসমূহে প্রক্রিয়াজাত মোট চিংড়ির সম্পূর্ণটাই রপ্তানি করা হয়। বিদেশে চালানকৃত হিমায়িত চিংড়ি অনেক সময় আন্তর্জাতিক মানের না হওয়ায় আমেরিকা, ইটালী ও অন্যান্য উন্নত দেশের বাজারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্যত্র অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি হয়েছে। এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে আমাদের কারখানায় উৎপাদিত চিংড়ির প্যাকেটে পচা বা আধাপচা চিংড়ি এবং এতে জীবাণুর পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানের উপরে থাকে। এ সকল অপবাদের জন্য চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

বাংলাদেশের কারখানায় প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি নিকৃষ্ট মানের হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রধানত কারখানাসমূহে সংগৃহিত চিংড়ির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পচা ও আংশিক পচা চিংড়ি মিশ্রিত

থাকে এবং এসকল মিশ্রিত চিংড়িই ধুয়ে হিমায়িত ও জমাট করা হয়। ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানিতে উত্তমরূপে ধুলে চিংড়ির গায়ের বাহ্যিক জীবাণুর পরিমাণ অত্যন্ত কমে যায়। কিন্তু পঁচা বা আংশিক পঁচা চিংড়িকে কোন রকমেই টাটকা করা যায় না। অতএব আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য উৎপাদিত চিংড়ি অবশ্যই মস্তকবিহীন ও টাটকা অবস্থায় কারখানায় পৌঁছতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলাদেশে নানাবিধ অসুবিধা রয়েছে।

চিংড়ি সংগ্রহ ও পরিবহন

চিংড়ি উৎপাদিত হবার পর হতে বিদেশে রপ্তানি করা পর্যন্ত পরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। উপকূলীয় জেলাসমূহ যথা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ছাড়াও ফরিদপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার নদী, বিল, খাল, ধানক্ষেত, উপকূলীয় বিভিন্ন জলাশয় ও বঙ্গোপসাগরে ট্রলারের সাহায্যে প্রচুর চিংড়ি ধরা হয়। জেলেরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে চিংড়ি ধরে। আজকাল ৫/৬ ইঞ্চির উপর বড় চিংড়ির প্রায় সমস্তটাই বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়। দেশের প্রধান প্রধান চিংড়ি সংগ্রহ কেন্দ্রসমূহ হচ্ছেঃ চাঁদপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, ক্ষেপুপাড়া, কুলিয়ার চর, কক্সবাজার ইত্যাদি। আড়তদার ও ব্যবসায়ীরা তাদের এজেন্ট বা সাব এজেন্টের মাধ্যমে দূর ও নিকটবর্তী স্থানসমূহ থেকে চিংড়ি সংগ্রহ করে। চিংড়ি পরিবহণের জন্য সরকারী কোন পরিযান নেই। শুধুমাত্র বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন সংস্থা কিছু কিছু কেন্দ্র থেকে ভ্যান, ট্রাক–এ বরফ দিয়ে এবং মাত্র কয়েকটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রাক–এ করে চিংড়ি পরিবহণ করে থাকে। এছাড়া চিংড়ি পরিবহণের জন্য বিশেষায়িত কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই।

রাস্তাঘাটের দুরাবস্থা ও পরিযান স্বল্পতার কারণে পরিবহণে দীর্ঘ সময় লেগে যায় যার ফলে পথেই অনেক চিংড়ি পচে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া সংগ্রহ কেন্দ্রের গুদামে বা আড়তে প্রায় ২৪ ঘন্টা চিংড়ি জমা রাখা হয় কারণ দিনে মাত্র একবার লঞ্চ, স্টীমার বা ট্রেনযোগে খুলনায় ও চট্টগ্রামের কারখানায় পাঠানো হয়। এতে অনেক চিংড়ি নষ্ট হবার সুযোগ থাকে।

সংরক্ষণ ও প্যাকিং

আমাদের চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুন্নত ও সেকেলে। চিংড়ি সংরক্ষণাগারের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। তবে বলা চলে পূর্বের সংরক্ষণ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে। চিংড়ির পচনরোধ করতে হলে ধরার পরপরই মস্তক বিচ্ছিন্ন করে হিমায়িত করার প্রয়োজন। হিমাগারের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ সময়ে বরফ দিয়ে চিংড়ি সংরক্ষণ করা হয়। এতে সংরক্ষণ ব্যয় বেড়ে যায়, যা চিংড়ির মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর প্রায় সবকটিতেই বরফ কল রয়েছে, কিন্তু বরফ পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনে বরফ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হয়ে পড়ে। আমাদের

বরফের মানও নিম্ন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী, পুকুর বা আবদ্ধ জলাশয়ের পানি ব্যবহার করে বরফ তৈরি করা হয়। এ সকল পানিতে প্রচুর জীবাণু ও আবর্জনা থাকে যা বরফ গলার সাথে সাথে চিংড়ির দ্রুত পচনে সহায়তা করে। প্রতি বৎসরে প্রায় এক পঞ্চমাংশ চিংড়ি সুষ্ঠুরূপে সংরক্ষণের অভাবে পচে নষ্ট হয়ে যায়। চিংড়ি উৎপাদনকারী কৃষক ও জেলেদের পক্ষে চিংড়ি সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী বড় উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

সাধারণত বরফের ব্লক কাঠের হাতুড়ি দ্বারা চূর্ণ করে চিংড়ি প্যাকিং করা হয়। এতে বরফ খণ্ডের ধারাল কিনারার চাপে চিংড়ির মাংস থেতলিয়ে বা কেটে যায়। যাতে দ্রুত পচন ধরে। যার জন্য উত্তমরূপে চূর্ণ করা বরফ ব্যবহার আবশ্যক। চিংড়ি প্যাক করার সময় পরিবহণ খরচ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বরফের পরিমাণ কম দেয়া হয়। বাঁশের চটা দ্বারা তৈরি বাক্সে চিংড়ি প্যাক করা হয় যা মোটেই মানসম্মত পদ্ধতি নয়। তবে কাঠের বাক্স ও ঝুড়িতে করেও চিংড়ি পাঠানো হয়। এসকল বাক্সে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বিধায় ৩ চিংড়ি পঁচে নষ্ট হয়।

আমাদের দেশে মোটামুটি তিনটি পদ্ধতিতে চিংড়ি সংরক্ষণ করা হয়। যথাঃ

১. রোদে শুকিয়ে
২. লবণ মিশ্রিত পানিতে সিদ্ধ করে ও রোদে শুকিয়ে এবং
৩. হিমায়নের মাধ্যমে।

১৯৮৩–৮৪ সালে দেশের মোট হিমায়িত চিংড়ির পরিমাণ ছিল ১৭,৪০০ মেট্রিক টন এবং ১৯৮৪–৮৫ সালে এ পরিমাণ ছিল ১৭,৩০০ মেট্রিক টন। এসকল চিংড়ি বিদেশে পাঠানোর সময় পেপার মণ্ড–এর মাধ্যমে কার্টুন হিসাবে প্যাকিং করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রতিবছর অনেক চিংড়ি শুটকী করা হয়। তবে বাংলাদেশে এর পরিমাণ কত তার কোন পরিসংখ্যান জানা যায়নি। এক হিসেবে দেখা গিয়েছে খুলনা এলাকায় দুবলার চরে প্রতিবছর ৬০ টন চিংড়ি শুটকী করা হয়ে থাকে। সাধারণত ছোট আকারের চিংড়ি যেমন কুঞ্চু, গোদা, লটিয়া, হরিনা ইত্যাদি চিংড়িকে শুটকী করা হয়ে থাকে।

চিংড়ির রপ্তানি বাণিজ্য

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।মোট উৎপাদনের কিছু অংশ দেশীয় খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি চিংড়ি হিমায়িত অবস্থায় প্যাকিং করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চিংড়ির মাথা ও পা দেশের অভ্যন্তরে খাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, হংকং, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, সুদান, থাইল্যাণ্ড, কুয়েত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ইটালীতে রপ্তানি হচ্ছে। ১৯৮৪–৮৫ সালে বাংলাদেশ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি

করে ২০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বছরে চিংড়ি থেকে অর্জিত টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হলো (তালিকা-৫)ঃ

তালিকা - ৫

চিংড়ি রপ্তানি আয়

বছর	মূল্য (হাজার টাকা)
১৯৭২-৭৩	২২৬৪৯
১৯৭৩-৭৪	৩৩৩১৮
১৯৭৪-৭৫	২৩৮০৮
১৯৭৫-৭৬	১৪৫০১৯
১৯৭৬-৭৭	২৪৬২০৩
১৯৭৭-৭৮	২৫৩০৮২
১৯৭৮-৭৯	৪৪৬৪৩৮
১৯৭৯-৮০	৫২৯৩৪১
১৯৮০-৮১	৫৪৯৫৪৪
১৯৮১-৮২	৯০৪৩৯৬
১৯৮২-৮৩	১৪৯৯৩৬৬
১৯৮৩-৮৪	১৫৫৫০০৯
১৯৮৪-৮৫	১৯৯৪৫০০
১৯৮৫-৮৬ (জুলাই - ডিসেম্বর)	১৫২৭১৩২

সূত্র ঃ মৎস্য বিভাগ

নবম অধ্যায়

লবণ

খাদ্যদ্রব্য হিসাবে লবণ

আমাদের দেহে তাপ বজায় লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আমাদের খাদ্যদ্রব্যের উপাদান হিসাবে লবণের কোন বিকল্প নেই। তবে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল সবজি ও পানি থেকে আমরা কিছু লবণের চাহিদা মেটাই। আমাদের শরীরের শক্তি সঞ্চয় ও শরীরের অনুকূল তাপ রক্ষায় লবণ একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

লবণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। এদেশের প্রায় ৫০ হাজারেরও অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই লবণ। বাংলাদেশে যে লবণ উৎপাদিত হয় তার দ্বারা দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না বলেই সরকারকে বিভিন্ন সময় লবণ আমদানি করতে হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন শিল্প দপ্তর লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের জন্য এ শিল্পকে ১৯৬১ সালে বিসিক এর হাতে ন্যস্ত করেন। এবং তারপর থেকে লবণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিসিক এককভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। লবণ সাধারণত সমুদ্রের লোনা পানি জ্বাল দিয়ে বা রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হয়। কোন কোন দেশে লবণের খনিও আছে। তবে আমাদের দেশে লবণের উৎস হলো সমুদ্রের লোনা পানি। বাংলাদেশে সমুদ্রের উপকূলে লবণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে উহাতে ক্রমাগত সৌর রশ্মির দ্বারা লবণাক্ত পানি শুকিয়ে অপরিশোধিত লবণ প্রস্তুতের পদ্ধতি সর্বপ্রথম ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামের ইষ্টার্ন সল্ট ওয়ার্কস লিমিটেড নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োগ করে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি বোম্বাই থেকে এই প্রক্রিয়াটি এদেশে প্রথম আমদানি করে। ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে বাহির হতে লবণ আমদানি করা হতো, কিন্তু দেখা গেছে যে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় লবণ বাংলাদেশ নিজেই প্রস্তুত করতে সক্ষম।

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে লবণের চাষ করা হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস হলো লবণ উৎপাদনের উপযুক্ত সময়। এ সময়ে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এ সময় এ অঞ্চলে রোদে সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়। এছাড়া সুন্দরবনের বাওয়ালী ও কাঠুরিয়া কাজের মৌসুমে সমুদ্রের পানি জ্বাল দিয়ে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী লবণ উৎপাদন করে। বিগত ১৫ বৎসরের লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫ লাখ মণ থেকে ২২৭ লাখ মণে উঠানামা করছে। এবং গড়ে প্রতি বৎসর উৎপাদনের হার দাঁড়িয়েছে ২৭৫৯৮ একরে ১৫৬ লাখ মণ। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রয়োজন ১ কোটি ৬৮ লক্ষ শোধিত

লবণ। এর মধ্যে মানুষের প্রয়োজনে ৮৪% এবং পশু ও শিল্পের প্রয়োজন ১৬%। অপরিশোধিত লবণ থেকে শোধিত লবণ তৈরি করতে ঘাটতি হয় প্রায় ২১% থেকে ২৫%। নিম্নে বাংলাদেশের ১৫ বৎসরে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ১

বাংলাদেশে লবণ উৎপাদন

বছর	একর	অশোধিত লবণের পরিমাণ (কোটি মণে)
১৯৭১–৭২	২৬০০০	২.১৩
১৯৭২–৭৩	২৬০০০	১.৯০
১৯৭৩–৭৪	১৮০০০	০.৪৫
১৯৭৪–৭৫	২৬০০০	০৪
১৯৭৫–৭৬	২৪০০০	১.৫৬
১৯৭৬–৭৭	২৬০০০	১.২১
১৯৭৭–৭৮	২৭০০০	২.০৯
১৯৭৮–৭৯	২৭০০০	২.২৭
১৯৭৯–৮০	৩১০০০	১.২৪
১৯৮০–৮১ (২৫–৪–৮১ পর্যন্ত)	২৮০০০	০.৭৪
১৯৮১–৮২	৩৩০০০	১.৫৪
১৯৮২–৮৩	৩১০০০	০.৬৫
১৯৮৩–৮৪	৩১২৩০	১.৮০
১৯৮৪–৮৫	৩০৪১৬	১.৭৭
১৯৮৫–৮৬	২৯৩২৪	২.০১

সূত্র ঃ বি. বি. এস.

লবণের ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে লবণ আমদানি করে। টেণ্ডারের মাধ্যমে লবণ সংগ্রহ করে রেশন ও ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে খাদ্যবিভাগ ৪০০০০ মেট্রিক টন লবণ ভারত থেকে আমদানি করেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওয়েজ আর্নিং স্কীমের মাধ্যমে (অধীনে) বেসরকারী উদ্যোগে বিদেশ (ভারত, অস্ট্রেলিয়া) থেকে লবণ আমদানির পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ২

বাংলাদেশে লবণ আমদানির পরিমাণ

সন	পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিকটন)
১৯৮২-৮৩	৩.৫৭
১৯৮৩-৮৪	৩.৪
১৯৮৪-৮৫	১.৩৫
১৯৮৫-৮৬	১.৬৫

সূত্র ঃ বি. বি. এস.

লবণ চাষ পদ্ধতি ও এলাকা

বাংলাদেশে বর্তমানে কক্সবাজার, মহেশখালী, চকোরিয়া, বাঁশখালি, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া প্রভৃতি এলাকাতে লবণ চাষ হয়। সাধারণত লবণ চাষের জন্য ডিসেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত উপযোগী। এই সময় আবহাওয়া শুষ্ক এবং সমুদ্রের পানি অধিক লবণাক্ত থাকে। লবণ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শুষ্ক জলবায়ু, সূর্যের কিরণ ও সমুদ্র উপকূলীয় জমি। সমুদ্র উপকূলীয় জমিতে বড় ঘেড় দিয়ে বাধ দেয়া হয় এবং সমস্ত ঘেড় দেয়া জমিকে A. B. C. D. ও E এই পাচ ভাগে ভাগ করে ছোট ছোট ঘেড়ের সৃষ্টি করা হয়। যাকে A ব্লক B ব্লক ইত্যাদি বলা হয়। A ব্লকের জমি B ব্লক অপেক্ষা উঁচু থাকে, B ব্লকের জমির C ব্লক অপেক্ষা উঁচু থাকে এবং C ব্লকের জমি D ব্লক অপেক্ষা উঁচু থাকে। কিন্তু E ব্লকের বৈশিষ্ট্য আলাদা। E ব্লকে কাঠের গুড়ি দিয়ে নরম কাদা সরিয়ে ফেলা হয় এবং E ব্লকের তলদেশ শক্ত ও সমতল হতে হয়। A ব্লকে কিছু পানি বাষ্প হয় এবং এর কারণে লবণাক্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। এভাবে B ব্লক, C ব্লক ও D ব্লক পর্যন্ত পানি সরিয়ে নেয়া হয়। A ব্লকে যখন পানিতে লবণাক্ততা থাকে ১০ থেকে ১৫ ভাগ সেখানে D ব্লকে লবণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ।

D ব্লকের পানি অনেক বেশি লবণাক্ত হয়ে যায় ঠিক এ পর্যায়ে E ব্লকে পানি সরবরাহ করা হয়। E ব্লকে এই পানি এসে আস্তে আস্তে জমাট বাঁধে। A ব্লক থেকে শেষ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া নির্ভর করে সূর্যের কিরণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার উপর। আবহাওয়া যদি কোন কারণবশত এই সময় খারাপ হয় অর্থাৎ আকাশে মেঘ থাকে তাহলে লবণ উৎপাদন ব্যাহত হয়। E ব্লকে জমাট বাধা পানি মাটির উপর একটি শক্ত আবরণ সৃষ্টি করে। এই আবরণই হলো অশোধিত লবণ। এই লবণ কাঠের গুড়ি দ্বারা জড়ো করা হয় এবং বাঁশ দ্বারা তৈরি খদে ফেলা হয়। বাঁশের এসব খাদ ৪০০–৫০০ থেকে ৪০০০–৫০০০ মণ লবণ রাখা হয়। যখন এসব খাদ ভর্তি হয়ে যায় তখন ট্রলার ও নৌকা যোগে এগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ ও চাঁদপুর পাঠানো হয়। এসব এলাকায় লবণ পরিশোধনের পর বাজারে ছাড়া হয়। অনেক সময় অশোধিত লবণও বাজারে ছাড়া হয়। শোধনের অর্থ হলো কাদা থেকে পৃথক করে সাদা লবণ বের করা। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২১০ টি ক্রাশিং মিল আছে যার মাধ্যমে লবণ শোধন করা হয়। বাংলাদেশে সেকেণ্ডারী লবণ প্রসেসিং ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা ও চাঁদপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রাশিং করার পর মিল মালিকগণ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ ও শতকরা ২০–২৫ ভাগ প্রসেসিং ঘাটতি বাদ দিয়ে আনুমানিক ১০ টাকা লাভে শোধিত লবণ বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রয় করে। তবে অনেক সময় কমপক্ষে ১ বস্তা হলে খুচরা কারবারীদের কাছেও মিল মালিক লবণ বিক্রি করে।

সরকার ক্রয় মূল্য হিসাবে প্রতিমণ লবণ ২৭ টাকা ধার্য করার পর দেখা যায় যে এলাকায় লবণের মূল্য আরও নিম্নমুখী অর্থাৎ সরকারীভাবে বিধিবদ্ধ সেট কার্যকরী হচ্ছে না। একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে লবণ চাষীরা তাদের লবণের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের অন্যান্য কৃষি পণ্যের ন্যায় লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রকৃত কৃষক পণ্যের মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লাভবান হচ্ছে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী।

লবণ বাহির থেকে আমদানি না করার নীতিতে দৃঢ় থাকলে চাষীরা লবণের জন্য ভাল দাম পাবে, কারণ লবণ কোন পচনশীল দ্রব্য নয়।

লবণের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল লবণ প্রায় একই মানের। তবে উৎপাদনের প্রক্রিয়াজাতকরণের কারণে লবণকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত লবণ।
২. সিদ্ধ করে প্রস্তুত লবণ।
৩. পরিশোধিত লবণ এবং
৪. আয়োডিন মিশ্রিত লবণ।

১. রৌদ্রে শুকিয়ে প্রস্তুত লবণ

বাংলাদেশে উৎপাদিত লবণের প্রায় সবটাই এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চকোরিয়া, বাঁশখালি, মহেশখালি ও কুতুবদিয়া উপজেলায় এই প্রক্রিয়ায় লবণ উৎপাদন করা হয়।

২. সিদ্ধ করে প্রস্তুত লবণ

এই প্রক্রিয়ায় লবণাক্ত পানি তাপ দিয়ে লবণ প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত সুন্দরবন এলাকায় বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত বিশেষ করে কাঠুরিয়া ও মৎস শিকারীরা এই প্রক্রিয়ায় লবণ উৎপাদন করে তাদের নিজেদের চাহিদা মেটায়। এই লবণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন হয় না। কারণ এতে জ্বালানির খরচ উৎপন্ন লবণের ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।

৩. পরিশোধিত লবণ

রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত লবণ মিল এলাকায় মিল মালিক বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত অপরিশোধিত লবণ ক্রয় করে এবং ক্রাশ মিলে লবণাক্ত পানিতে ধুয়ে এগুলো শোধন করা হয়।

৪. আয়োডাইজড লবণ

পরিশোধিত লবণে আয়োডিনের মিশ্রণ করে আয়োডাইজড সল্ট প্রস্তুত করা হয়। এই লবণের উৎপাদন বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে শুরু হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এই লবণের বাজার প্রসারিত হয় নাই। সাধারণ লবণের মতই এই লবণ। কিন্তু আয়োডিন মিশ্রিত লবণ কতকগুলো রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে যেমনঃ

ক. গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ প্রতিরোধ করে।
খ. প্রসূতির প্রসব কষ্ট সহজসাধ্য করে।
গ. গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে সহায়ক হয়।
ঘ. শিশুর মানসিক প্রতিবন্ধকতা, মূক ও বধিরতা দূর করে।
ঙ. দেহের পেশী সঞ্চালন ও স্নায়ুশক্তি বৃদ্ধি করে।
চ. ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে শিশুদের মেধাশক্তি বৃদ্ধি করে।
ছ. শারীরিক দুর্বলতা দূর করে।

আমিরাবাদ, নবীগঞ্জ এবং নারায়নগঞ্জে আয়োডাইজড সল্ট প্ল্যান্ট এই লবণ তৈরি করে এবং লবণের উপরিউক্ত গুণাবালীর কথা বাজারে প্রচার করে। ইতিমধ্যে এই লবণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তবে দেশের সর্বত্র এই লবণ পৌছানো এখনও পর্যন্ত তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশেষভাবে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে এই লবণ অধিক পরিচিত।

বন্টনপ্রণালী

সূর্যালোকে প্রস্তুত লবণই আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ উৎপন্ন লবণ। আমাদের দেশে লবণের কোন খনি নেই। বাংলাদেশের লবণ বিপণন পদ্ধতি অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মতোই যা চূড়ান্তভাবে বাজারজাতকরণের পূর্বে প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হয়। লবণ শিল্পে ভূমি পর্যায় থেকে বন্টন ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ লোক নিয়োজিত।

সাধারণত ছোট কৃষকেরা অল্প অশোধিত লবণ উৎপাদন করে। কিছু বড় কৃষক ব্যতীত বাকি উৎপাদনকারীরা স্থানীয় দালাল এবং মিল প্রতিনিধির কাছে অশোধিত লবণ বিক্রয় করে। স্থানীয় দালালেরা সওদাগর নামে পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট লবণ বিক্রয় করে। এসব সওদাগর তাদের পণ্য আড়তদার বা মিল মালিকের কাছে বিক্রয় করে। মিল মালিকেরা সরাসরি এবং মিল গেটও অশোধিত লবণ ক্রয় করে। মিল মালিকের কাজ অশোধিত লবণ আবার লবণাক্ত পানিতে গলিয়ে এটা হতে কাদা মুক্ত সাদা লবণ প্রস্তুত করে যাহা একটি সহজ প্রক্রিয়া।

ক্রাশিং লবণ মিল মালিকগণ অন্যান্য ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে ১০% লাভে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত পাইকারী বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। অবশেষে পাইকারী বিক্রেতাগণ খুচরা কারবারীর নিকট বিক্রয় করে। মাঝে মাঝে মিল মালিকগণকে খুচরা কারবারীর নিকট বিক্রয় করে। মাঝে মাঝে মিল মালিকগণও খুচরা কারবারীর নিকট শোধিত লবণ বিক্রয় করে। নিম্নে লবণ বিক্রয়ের বন্টন প্রণালী চিত্রে দেখানো হলোঃ

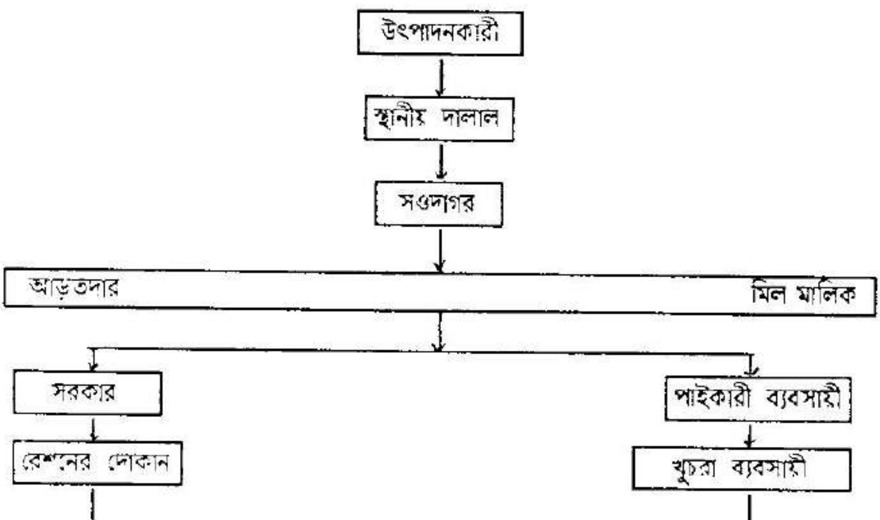

চিত্রঃ দেশে উৎপাদিত লবণের বন্টনপ্রণালী

দেশে উৎপাদিত লবণ দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। এর প্রধান কারণ লবণ সংরক্ষণের অভাব। তাই মাঝে মাঝে সরকার বিদেশ থেকে টেণ্ডারের মাধ্যমে লবণ সংগ্রহ করে রেশন ও ন্যায্যমূলের দোকানের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে ভোক্তাদের কাছে পৌছে দেয়। সাধারণত আমদানিকারকেরা তাদের আমদানিকৃত লবণ পাইকারী বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। পাইকারী বিক্রেতাগণ এ লবণ খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে। খুচরা কারবারীরাও অনেক সময় সরাসরি আমদানিকারকের নিকট থেকে লবণ কিনে থাকেন। আমদানির পর আমদানিকৃত লবণ প্রসেসিং করে বিতরণ করা হয়। আমদানিকৃত লবণ কিভাবে বন্টন করা হয় তা নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

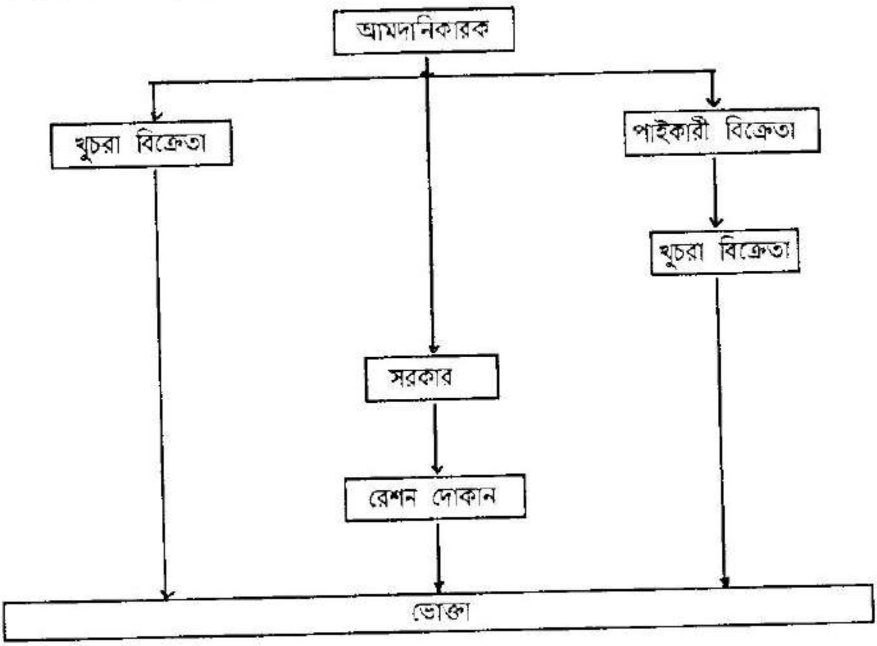

চিত্রঃ আমদানিকৃত লবণের বন্টনপ্রণালী

সরকার লবণের বন্টন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের অর্থাৎ লবণ উৎপাদনকারীদের ১৯৭৪ সালে ১৪ লক্ষ টাকার ঋণ বরাদ্দ করেন। এবং প্রতি একরে ২৫০০ টাকা ঋণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেন যা বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত। এই ঋণদানের উদ্দেশ্যে কৃষককে আর্থিক সহায়তা দ্বারা লবণের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও লবণ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা। লবণ উৎপাদন মৌসুমের প্রথম দিকে এই ঋণ প্রদান করা হয় এবং মৌসুমের শেষে ঋণ গ্রাহকদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সমপরিমাণ টাকার লবণ সংগ্রহ করেন। তবে এই ঋণের উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে। কারণ এক ধরনের টাউট ও ধান্দাবাজ লোক এই ঋণের টাকা

আত্মসাৎ করে এবং বাজারে যেহেতু সরকারী মূল্যের কম মূল্যে লবণ বিক্রয় হয় তাই তারা ঐ কম মূল্যে বাজার থেকে লবণ ক্রয় করে ঋণের টাকা শোধ করে।

মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের কোন মূল্য নির্ধারণের নির্দিষ্ট মান নেই। সেক্ষেত্রে লবণও একটি কৃষিজাত পণ্য হওয়ায় এর মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় হলেও বাংলাদেশে লবণের মূল্য নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট মান নেই। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের কৃষক এতই অজ্ঞ যে, সে কি পণ্য উৎপাদন করছে , কেন করছে এবং একর প্রতি তার উৎপাদন খরচ কত যাচ্ছে এর কিছুই সে জানে না। ফলে পণ্য উৎপাদন করে কৃষকেরা তাদের আসল টাকা ঘরে তুলতে পারছে না বলেই লবণ উৎপাদন ব্যবস্থা সঙ্কটাবস্থায় পড়েছে। আমাদের দেশের সরকারও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য বাস্তব কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। লবণের একটি সরকারী মূল্য নির্ধারণ করা হয় প্রতি বছর। কিন্তু বাজারে সরকারী মূল্যের কম মূল্যে লবণ ক্রয়-বিক্রয় হয়। বর্তমানে সরকার নির্ধারিত মূল্য মণ প্রতি অশোধিত লবণ ২৭ টাকা ধার্য করা হলেও বাজারে এর চেয়ে কম মূল্যে লবণের ক্রয় বিক্রয় চলে। এর কারণ সরকারী মূল্য সময় মত কার্যকরী হয় না। ফলে দরিদ্র কৃষকেরা অর্থের প্রয়োজনে তাদের উৎপাদিত লবণ উৎপাদনের পরেই বিক্রয় করে। অবশ্য বর্তমানে সরকার লবণ শিল্পে বিরাজমান সঙ্কট উত্তরণের লক্ষ্যে লবণ নীতি ঘোষণার চিন্তাভাবনা করছেন এবং লবণের মণ প্রতি মূল্য ৩০ টাকা (অশোধিত) করার কথা ভাবছেন। নির্ধারিত মূল্যে সরকার নিজ গুদামে লবণ কিনে মওজুদ রাখলে সুষ্ঠু বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার লবণ বাহির থেকে আমদানির প্রয়োজন সম্পূর্ণ রহিত করতে পারেন।

লবণের উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে শতকরা ১০ ভাগ লাভজনক অবস্থায় মূল্য নির্ধারিত হয়। দেশীয় উৎপাদিত লবণের স্বাভাবিক খুচরা মূল্য কত হবে তা নিম্নবর্ণিত বাজারজাতকরণ পর্যায়গুলো বিবেচনার পর স্থির করা হয়।

ক. উৎপাদন এলাকায় স্থানীয় দালালের কমিশন।
খ. উৎপাদক কর্তৃক বিক্রয়কৃত অশোধিত লবণের মূল্য।
গ. সওদাগরের কমিশন।
ঘ. উৎপাদন এলাকা থেকে ক্রাশিং এলাকা পর্যন্ত পরিবহণ খরচ।
ঙ. আরতদারের কমিশন।
চ. সিলিং খরচ ও প্রক্রিয়াকরণ ঘাটতিসহ মিলারের লাভের অংশ।
ছ. পরিবহণ খরচ ও ঘাটতিসহ পাইকারী বিক্রেতার লাভের অংশ।
জ. পরিবহণ খরচ ও ঘাটতিসহ খুচরা বিক্রেতার লাভের অংশ।

BANSDOC Library
Accession No. 18910

লবণ শিল্পের অনেক সমস্যা যা একটির সাথে অন্যটি জড়িত এবং তা প্রকারান্তরে সুষ্ঠু উৎপাদন ও দক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বাধাস্বরূপ বিরাজমান। ১৯৭৩–৭৪ সালে দেশে লবণের মূল্য লাগামহীন গতিতে বেড়ে গিয়েছিল। লবণের মূল্য উৎপাদন খরচের সর্বোচ্চ ৩৫% হওয়ার কথা থাকলেও এসময় ১০০% বেড়ে গিয়েছিল। নিম্নলিখিত কারণে এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল।

১. লবণের চাহিদা অনমনীয় বলে সরবরাহের সামান্য স্বল্পতা খুচরা মূল্যে বিরাট হেরফের করতে পারে।

২. ১৯৭৩–৭৪ সালে লবণ উৎপাদন মৌসুমে বাদলা দিনের সংখ্যা স্বাভাবিক দিনের তুলনায় বেশি ছিল। অনুমিত হয়েছিল যে, ১৯৭৩–৭৪ সালে মাত্র ৬৮ লক্ষ মণ লবণ পরিশোধিত হয়েছিল। ১৯৭২–৭৩ সালে উদ্বৃত্ত ছিল মাত্র ৩৪ লক্ষ টন। এই হিসাব মতে এই বৎসর লবণের ঘাটতি ছিল ৯.০৬%

৩. স্বাধীনতার পর লবণ ব্যবসায়ে অচলাবস্থা শুরু হওয়ায় প্রতিযোগী পাইকারী ব্যবসায়ী ও মজুতদারের সংখ্যা কমে যায়। যে স্বল্পসংখ্যক ব্যবসায়ী ব্যবসা করছিল তারা অধিক হারে মজুত করতে থাকে। ফলে দাম বহুগুণে বেড়ে যায়।

লবণ বাজারজাতকরণের মৌলিক সমস্যা

বাংলাদেশের লবণ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে যখন পাইকার বা সওদাগর লবণ ক্রয় করে এবং এগুলো বিভিন্ন স্থানে শোধন ও ভোক্তাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন সমস্যা দেখা দেয়। স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। তারপর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা মাত্র ২২টি গুদাম তৈরি করেছে যার ধারণক্ষমতা মাত্র ৮০০০০ মণ। ফলে লবণ চাষে এবং বন্টনে নিয়োজিত লোকদের লবণ সংরক্ষণের জন্য প্রভূত ঝামেলায় পড়তে হয়। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে লবণ সংরক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কিছুসংখ্যক উৎপাদনকারী ও পাইকার তাদের নিজস্ব লবণ গুদামজাতকরণের জন্য গুদাম ঘর ব্যবহার করে। তবে অধিকাংশ অশোধিত লবণ উৎপাদনের পরে সরাসরি ট্রলারে করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ ও চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমাদের দেশে লবণ পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত উৎপাদিত হয়। সে নিরিখে লবণ আমাদের মৌসুমি পণ্য। অথচ লবণ এমন একটি নিত্য ব্যবহার্য পণ্য যা সারা বৎসর ধরে নয় বরং বৎসরের প্রতিদিন এবং প্রতি নিয়ত আমাদের প্রয়োজন হয়। তাই এই মৌসুমি লবণের সারা বৎসরের ভোগ নিশ্চিত করার জন্য বড় দরকার সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার। আমাদের দেশ দরিদ্র। অতএব প্রয়োজনীয় বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব নয়। তবুও সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার দ্বারা আমাদের লবণের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটাতে হবে।

লবণ সাধারণত চটের বস্তা এবং পলিথিনের বস্তায় ২ থেকে ২.৫ মণ পর্যন্ত মোড়কীকরণ করা হয়। দেশের সর্বত্র লবণের চাহিদা মেটাতে এসব দুরদূরান্তের অঞ্চলগুলোতে বস্তায় করে লবণ পাঠানো হয়। লবণের পরিবহণের ক্ষেত্রে নৌপথই বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ নৌপথে পরিবহণ খরচ কম এবং দেশের সর্বত্র নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ নৌপথ রয়েছে। যা পরিবহণের অন্যান্য ক্ষেত্রে নাই। লবণ সাধারণত শোধিত অবস্থায় বিক্রয় করা হয়। তবে কখনো কখনো অশোধিত লবণও বাজারে দেখা যায়। লবণের মান নির্ধারণ করা হয় বা যায় লবণ কণা দ্বারা। কোন কোন লবণের কণাগুলো একটু বড়, কোনটার একটু ছোট, কোন লবণ অপেক্ষাকৃত সাদা ইত্যাদিভাবে লবণের মান নির্ধারণ করা হয়। তবে লবণের এরূপ পার্থক্য হয় শোধনের কারণে। শোধনের পূর্বে সকল লবণ প্রায় একই রকম থাকে।

লবণ বাজারজাতকরণে কতকগুলো মৌলিক সমস্যা

১. **জমি ও ঋণ ব্যবস্থা ঃ** সাধারণত গরীব কৃষকদের কোন জমি নেই। তারা সরকারী খাস জমিও অন্য মালিকদের জমিতে লবণ চাষ করে। স্থানীয় জমি মালিকদের সাথে কতকগুলো সরকারী প্রতিষ্ঠানও (উপকূল বাধ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চিংড়ি চাষ প্রকল্প, রাজস্ব বিভাগ) জমির ব্যাপারে কৃষকদের নিরূৎসাহ ও বিরক্তির কারণ। মালিকগণ লবণ চাষীদের কাছ থেকে উচ্চহারে খাজনা আদায় করে। অনেক সময় কৃষকেরা অগ্রিম টাকা দিয়েও জমি ভাড়া করে যা পরে তাদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা টেনে আনে। দুষ্ট চক্রের আবর্তে গরীব চাষীরা নানা কারণে জমির মালিক ও মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে সে ঋণের চাপের মুখে ও সংসারের অধিক অভাব-অনটনে ফসল তোলার মৌসুমে কম দামে সব লবণ বিক্রি করে দেয়। তাই তাদের ন্যায্য মূল্য ভাগ্যে জোটেনা। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন (১৯৮০-৮৫) লবণ উৎপাদনকারীদের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

২. **গুদাম ঃ** লবণ মৌসুমী ফসল ও শুধু উপকূলীয় অঞ্চলেই উৎপাদিত হয়। তাই সময় ও দূরত্ব উপযোগ সৃষ্টি কল্পে এ পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিসিক উপকূল এলাকায় মোট ২২ টি গুদাম তৈরি করেছে। এগুলোর প্রতিটির ধারণক্ষমতা ৮০০০০ মণ। কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। আবার এসব গুদামের মধ্যে ৩টি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ খাদ্য বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৬৪টি এল. এস. ডি, ১২টি সি. এস. ডি ও ৫টি সাইলো আছে। এসব গুদাম লবণসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য সুষ্ঠু বন্টনে নিয়োজিত। তাই শুধু লবণ গুদামজাতকরণের ব্যাপারে খাদ্য বিভাগ খুব একটা কাজ করতে পারবে বলে মনে হয় না। এ প্রেক্ষিতে সরকারকে বিসিকের অথবা অন্য কোন গুদামজাতকরণ সংস্থার মাধ্যমে লবণের জন্য পণ্যাগার স্থাপনে এগিয়ে আসা

এগিয়ে আসা উচিত। শুধু উৎপাদন এলাকায় গুদাম নির্মাণ করলে চলবে না, ক্রাশিং এলাকাতেও করতে হবে। তাছাড়া লবণ সঙ্কট এড়ানোর জন্য বাফার স্টকের মাধ্যমে পণ্যাগার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই পর্যাপ্ত গুদাম ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে লবণ সঙ্কট এড়ানো যাবে না।

৩. **পরিবহণ ঃ** সাধারণত অশোধিত লবণ নৌপথে সাম্পানের সাহায্যে ক্রাশিং মিলে পরিবহণ করা হয়। আসলে লবণ অপচনশীল পণ্য বলে নৌকা অথবা সাম্পানই উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা। তাই এ পণ্য কোন দ্রুতগামী যান বা অন্য কোন পন্থায় বেশি খরচ দিয়ে পরিবহণ করা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অলাভজনক। অথচ দুঃখের বিষয় বিভিন্ন কারণে লবণ শিল্পে নিয়োজিত সাম্পান বা নৌকার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

৪. **গ্রেডিং ঃ** বাংলাদেশে প্রচলিত স্বীকৃত কোন লবণের গ্রেড নেই। কিন্তু বাজারে সাধারণত দুই ধরনের লবণের গ্রেড চোখে পড়ে ; যেমন (ক) শোধিত লবণ ও (খ) বয়েল্ড লবণ। টেবিল সল্ট ও আয়োডাইজড সল্ট কোন গ্রেডের পর্যায়ভুক্ত না করলেও এটা এখন বাজারে বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। আর ঐ ধরনের লবণ শোধিত বা বয়েল্ড লবণের সাথে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য মিশিতে তৈরি করা হয় তাই দাম একটু বেশি।

৫. **অন্যান্য ঃ** আরো কতকগুলো কারণ লবণের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাহত করছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. খাস জমি আসল লবণ চাষীরা পাচ্ছে না। এসব জমি এক শ্রেণীর শক্তিশালী দালালের আয়ত্বে চলে যাচ্ছে এবং তাদের দৌরাত্ম্যে কৃষকের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা পর্যুদস্ত হচ্ছে। এটা লবণ শিল্পের জন্য পরোক্ষ হলেও একটি বড় ধরনের হুমকিস্বরূপ।

২. লবণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করবার মত নতুন জমি পাওয়া যাচ্ছে না।

৩. আগেই বলা হয়েছে লবণ একটি মৌসুমী ফসল। তাই শুকনো মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা বৃষ্টিপাত হলে লবণ উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩–৭৪ সালে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের দরুন লবণ উৎপাদনের পরিমাণ আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ২৩.০২ ভাগ কম হওয়ায় বাজারে লবণের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ঐ সময় ১ টাকা সের দরের লবণ ৬০ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়েছিল। তবে এর পেছনে অর্থলোভী মজুতদারের কালো হাতও কম কাজ করেনি।

বর্তমান বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও অদক্ষতার কারণ

ক. উৎপাদনের পর লবণের উৎপাদক যখন লবণ পাইকার বা সওদাগরের কাছে বিক্রয় করে তখন ওজনে কারচুপি হয়।

খ. লবণের মাঠ থেকে লবণ সাম্পানে তোলার পথ খরচ পাইকার বা সওদাগর উৎপাদনকারীর কাছ থেকে লবণ ক্রয়ের সময় সুকৌশলে রেখে দেয়। এই পরিবহণ ব্যয় এলাকায় পথ-ঘাটের অভাবে প্রায়ই অত্যধিক হয়।

গ. দালালেরা লবণ চাষীদের নিকট থেকে বাকীতে লবণ ক্রয় করে এবং অন্য পক্ষের নিকট বিক্রয় করে। ফলে অনেক সময় দেখা যায় লবণ চাষী দালালদের নিকট হতে সময় মত লবণের মূল্য পায় না। আর দালাল বিভিন্ন বাহানার পর যখন চাষীদের টাকা দেয় তখন ঐ টাকা পুনর্বার লবণ চাষে নিয়োগ করা যায় না। ফলে লবণ চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘ. অনেক সময় দালাল ও লবণের পাইকারী ক্রেতাদের মধ্যে যোগসাজোশের সৃষ্টি হয় যার ফলে লবণের মূল্য কম হয়। এ কারণে কৃষক তার লবণের জন্য ন্যায্য মূল্য পায় না।

ঙ. কোন কোন বৎসর আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ উৎপাদন না হলে সাধারণ খরিদ্দার বা ভোক্তাদের পর্যায়ে লবণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যার কোন অংশ লবণের প্রকৃত উৎপাদক পায় না। কারণ লবণের বাজারের সমুদয় কর্তৃত্ব লবণ পরিশোধনে যে সব ব্যবসায়ী জড়িত তাদের নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সমুদয় খুচরা বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় লবণের বাজারে মূল্যের পরিবর্তনের সমুদয় সুফল তারাই ভোগ করে। পক্ষান্তরে লবণের বাজার যদি কোন কারণে মন্দা যায় তাহলে তার সমস্ত প্রভাব পড়ে উৎপাদকের উপর।

লবণ উৎপাদন ও বণ্টনে সরকারের ভূমিকা

লবণ একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। অতএব কোনভাবে বাজারে লবণের অভাব সৃষ্টি করতে পারলেই এর মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাজারে লবণের অভাবের ফলে অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ কম থাকায় লবণের মূল্য প্রতি সের ১ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছিল। লবণের এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ ছিল উৎপাদনের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি এক শ্রেণীর কালো ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য সর্বোপরি আবহাওয়া বাদলা থাকার কারণে লবণ উৎপাদন এসময় ব্যাহত হয়েছিল অপর দিকে কালোবাজারীরা উৎপাদিত লবণ মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। আর সে কারণেই বাজারে লবণের মূল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। অতএব সরকারকে বাজারে লবণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে

সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে সরকার লবণের বাজারে কোনরকম শূন্যতা যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য দেশীয় বাজার থেকে লবণ ক্রয় করেন এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে লবণ আমদানির ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশ সাধারণত ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও থাইল্যাণ্ডের কাছ থেকে লবণ ক্রয় করে। এসব লবণ সরকার ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য রেশন ও ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। সরকারী ব্যবস্থাপনা উন্নত হলে অন্তত এই পণ্যটি এ দেশে বাহির থেকে আমদানি করার প্রয়োজন হতো না।

আমাদের দেশের লবণ চাষীরা অত্যন্ত দরিদ্র। অনেক সময় এরা অন্যের বা সরকারের জমিতে লবণ চাষ করেন। এসব লবণ চাষীদের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হবার কারণে তারা অগ্রিম লবণ বিক্রি করে এবং লবণ উৎপাদনের পর অত্যন্ত অল্প দামে বাজারে বিক্রয় করে। বাজারে লবণ বিক্রয় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার মত সময় তাদের পক্ষে লবণ ধরে রাখা সম্ভব হয় না। কৃষকের এসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে সরকার লবণ চাষীদের একর প্রতি ২৫০০ টাকা ঋণ দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঋণের টাকাটা পর্যন্ত টাউট বাটপারের খপ্পরে পড়ে কৃষির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা ঋণ পেতে পারছে না। এরপর সরকার লবণ চাষীদের স্বার্থরক্ষার্থে বাজারে লবণের সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করে দিলেও চাষীরা সে মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক শ্রেণীর সওদাগর ও পাইকারদের যোগসাজশে বাজারে লবণ সরকারী বেধে দেয়া দর ২৭ টাকা মণ দরের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় হয়।

সর্বোপরি লবণ শিল্পের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত বিসিক সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। লবণ সংরক্ষণের জন্য উৎপাদন এলাকায় বিসিকের সহযোগিতায় এপর্যন্ত মোট ২২টি গুদাম তৈরি করা হয়েছে যার প্রতিটির ধারণক্ষমতা মাত্র ৩০০০ মণ। এই পরিমাণ দেশে উৎপাদিত লবণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

লবণ শিল্পে বিরাজমান আরও অন্যান্য অসুবিধা এবং এ শিল্প সংরক্ষণের জন্য সরকার লবণ নীতির চিন্তাভাবনা করছেন। লবণের সর্বনিম্ন মূল্য এই নীতিতে ৩০ টাকা ধার্য করার কথা চিন্তা ভাবনা চলছে। সরকারের বর্তমান চিন্তা ও কাজের সাথে যদি মিল থাকে এবং লবণের সর্বনিম্ন মূল্য যদি ৩০ টাকা ধার্য করা হয় তাহলে লবণ চাষীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়বে।

লবণ শিল্পের জন্য সুপারিশ

১. প্রকৃত লবণ চাষীদের মধ্যে খাস জমি চূড়ান্তভাবে বন্টন করতে হবে। কোন অবস্থায় যেন এসব জমি নিয়ে কোনরকম ছলচাতুরী না চলতে পারে। প্রকৃত চাষী যাতে এসব জমি পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবস্থায় যেন কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণে দুর্নীতি না চলে এবং কৃষকদের ব্যবহার করে গ্রাম্য বা এলাকার টাউট ও দালালেরা ঋণের টাকা আত্মসাৎ করতে না পারে।

৩. পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। কোন পণ্য উৎপাদন খরচ আর পরিবহণ খরচ প্রায় সমান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হলে তা নিশ্চয়ই দুঃখজনক। কিন্তু আমাদের দেশে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত না হবার কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. উৎপাদন এলাকায় এবং প্রত্যন্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় গুদাম নির্মাণ করতে হবে। উৎপাদন এলাকায় উৎপাদিত লবণ নিয়ে যাতে কৃষক বিপাকে না পরে এবং সে তার লবণের জন্য বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে তার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম তৈরি করতে হবে। তাছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের লবণের ভোগ নিশ্চিত কল্পে প্রত্যন্ত এলাকায় লবণের জন্য গুদাম তৈরি করতে হবে।

৫. জাতীয় লবণ বোর্ড গঠন করতে হবে। সুষ্ঠু লবণ নীতি প্রণয়ন এবং লবণ শিল্পে বিরাজমান সমস্যা কাটিয়ে উঠতে লবণ বোর্ড গঠন করতে হবে।

৬. যথাযথ জাতীয় লবণ নীতি ঘোষণা করতে হবে। লবণ চাষে সম্পৃক্ত এবং লবণ শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় ২ লক্ষ মালিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারীর ও উৎপাদকের স্বার্থরক্ষার জন্য সুষ্ঠু লবণ নীতি ঘোষণা করতে হবে।

৭. দালালদের দৌরাত্ম্যরোধ করতে হবে। লবণ চাষীদের সব চেয়ে বড় ক্ষতির কারণ লবণ শিল্পে দালালদের প্রভাব। দালালরা যাতে পাইকার বা লবণের ক্রেতাদের সাথে যোগসাজসে লবণ উৎপাদকদের কোন ক্ষতি না করতে পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. বর্তমান লবণ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা লবণ শিল্পকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত করতে হবে।

৯. কয়েক বছরের জন্য বাফার স্টক তৈরি করতে হবে। যেহেতু লবণ একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সে কারণে জনসাধারণের লবণ ভোগ নিশ্চিত করতে লবণের স্টক করতে হবে। আবহাওয়াগত বা অন্য কোন কারণে যদি লবণের উৎপাদন ব্যাহত হয় তাহলে দেখা যাবে যে, ১৯৭৩ সালের মত লবণের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে সরবরাহ হচ্ছে না এবং লবণের মূল্য দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু লবণ যদি স্টকে থাকে তাহলে এই অসুবিধার স্বীকার হতে হয় না। এর ফলে একদিকে যেমন লবণের মূল্য বাড়তে পারে না অন্যদিকে দেশে লবণের সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে না।

১০. বাম্পার উৎপাদনের কারণে লবণের দাম কমে গেলে কৃষকদের নিকট থেকে সরকার লবণ কিনে তা গুদামজাত করতে পারে। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, লবণ উৎপাদনের জন্য কৃষকদের অনুপ্রাণিত করা হলো। লবণ চাষীরা সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট সফলতা অর্জন করলো। কিন্তু অতিরিক্ত লবণ উৎপাদন অবশ্যই লবণের বাজারে প্রভাব ফেলবে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান সহজ। যেহেতু লবণ কোন পচনশীল দ্রব্য নয়।

১১. অনেক সময় দেখা যায় আবহাওয়ার কারণে কোন বৎসর উৎপাদন কম হয় এবং বাজারে কৃত্রিমভাবে লবণের অভাব সৃষ্টি করা হয়। অনেক মজুতদার অধিক মুনাফা লাভের আশায় বাজার হতে অতিমাত্রায় লবণ ক্রয় করে মজুত করে। এভাবে বাজার থেকে অধিক পরিমাণ লবণ ক্রয় করে মজুদ করার মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়। এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোন ব্যবসায়ী লবণের বাজারে এরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে।

১২. লবণ আমদানির উপর অতিমাত্রায় কর আরোপ করা এবং প্রয়োজনবোধে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় সরকার টেণ্ডারের মাধ্যমে লবণ ক্রয় করেন। এসব লবণ বেশিরভাগই বিদেশ যেমন ঃ ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও থাইল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা হয়। দেশীয় লবণের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে এই লবণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বিদেশী লবণ আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

"নুন খাই যার গুণ গাই তার" – এই প্রবাদটির মাধ্যমে লবণের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। লবণ একটি ভোগ্যপণ্য অতএব লবণ উৎপাদন ও ভোগ নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকারকে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু সরকারের একক প্রচেষ্টা দ্বারাও কিছু সম্ভব নয়। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি লবণচাষী, দালাল, সওদাগর, পাইকার সকলকে একত্রে সহযোগিতা করতে হবে। বিশেষ করে লবণ চাষীদের একতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন মানুষ তার অধিকার হারা হলে বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে চাই বঞ্চিতের ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে কেউ কারো অধিকার হরণ করতে পারে না। তাই লবণ চাষীদের লবণের বাজার পেতে এবং দালাল, ফড়িয়া ও ফটকা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পেতে হলে চাই জমি পর্যায়ে লবণ চাষীদের ঐক্য। লবণ চাষীরা ঐক্যবদ্ধভাবে একের অভাব অসুবিধার জন্য সবাই ব্যথিত হলে লবণ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কালোবাজারীরা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। অধুনা লবণ চাষীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবণ চাষীরা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াসে গঠন করছে লবণ চাষী সমবায় সমিতি। এই সমিতির মাধ্যমে লবণ চাষীরা সমিতির নিয়ম অনুযায়ী লবণ বিক্রয় করে।

দশম অধ্যায়

আখ

ভূমিকাঃ আখ বা ইক্ষু বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল এবং প্রধানত একটি শিল্প পণ্য। আখ থেকে চিনির উৎপাদন শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগের মত। আখ চাষের জন্য প্রচুর সস্তা ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। নভেম্বর—ফেব্রুয়ারীতে কাটিং রোপণ করে ১২ থেকে ১৮ মাস পর আখ কাটা যেতে পারে। আখের একর প্রতি ফলন ৫০০ থেকে ১৫০০ মণ দাঁড়াতে পারে। চিনি বা গুড়ের হিসাবে ৫০ থেকে ১৫০ মণ। পৃথিবীর মোট চিনির তিন ভাগের দু'ভাগ উৎপাদিত হয় আখ থেকে। বাকি একভাগ উৎপাদিত হয় বিট থেকে। বাংলাদেশে চিনি বা গুড় আহরণের প্রধান উৎস হচ্ছে আখ।

আখ খাদ্যের যোগান হিসাবে ঃ প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি সঞ্চারের জন্য শক্তির ইন্ধন হিসাবে চিনি বা শর্করার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য, বিকল্প হিসেবে গুড়ের ব্যবহার চলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে সুস্থ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারণের জন্য একজন মানুষের বছরে কমপক্ষে ৪৪ পাউণ্ড চিনি বা গুড় অথবা অন্য কোন মিষ্টিজাতীয় সামগ্রীর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশে এর পরিমাণ বড়জোড় ১১ পাউণ্ড যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৪ ভাগের ১ ভাগ। কারো কারো মতে এর পরিমাণ আরো কম। কেননা, চিনি বা গুড় কিনে খাওয়ার মতো অর্থ সামর্থ্য অনেকেরই নেই। আমাদের দেশে খেজুর, তাল, নারকেল, মধু ও অন্যান্য ফলমুল থেকে কিছু শর্করা আহরিত হয়। তবু আখই হচ্ছে আমাদের শর্করার প্রধান উৎস।

আখের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের প্রধান ফসলগুলোর মধ্যে আখের স্থান তৃতীয় এবং শিল্পে ব্যবহৃত পণ্য হিসাবে এর স্থান দ্বিতীয়। আখ নগদ অর্থ আয়ের জন্য চাষীদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীস্টপূর্বকাল থেকে বাংলাদেশে আখের চাষ হয়ে আসছে।

বিশ্ব ব্যাংক থেকে পরিচালিত এক মৃত্তিকা জরীপে বাংলাদেশের ৪০ লাখ একর জমি আখ আবাদের উপযোগী বলা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের অনুরূপ ১০ লাখ একর জমির মধ্যে ৫/৬ লাখ একরে খুব সহজেই আখ আবাদ করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪ লাখ একর জমিতে আখ চাষ হয়। এর মধ্যে মিল এলাকায় জমির পরিমাণ প্রায় ২ লাখ একর। ১৯৬৯-৭০ সালে এ অঞ্চলে ৩ লাখ ৯৯ হাজার একর জমি ব্যবহার করে একর প্রতি ৫০৬.৬২ মণ হিসেবে প্রায় ৭৪.১৮ লক্ষ টন আখ উৎপাদন করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সাথে আখের সরকারী দাম না বাড়ায় বহু আখ চাষী চাষ থেকে বিরত থাকে। যার ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার একর জমিতে মাত্র ৫৩.৭৮ লক্ষ টন আখ উৎপাদিত হয়। এ সময় একর প্রতি আখ উৎপাদনের পরিমাণ ও ১৯৭০-৭১ এর তুলনায় প্রায় ৫৩ মণ কমে যায়। ১৯৭৮-৭৯ সালে একর প্রতি ৪৮৫ মণ হিসেবে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে প্রায় ৬৮ লক্ষ

২৮ হাজার টন আখ উৎপাদিত হয়। অথচ পরের পছর ১০ হাজার একরেরও বেশি জমিতে আখের পরিবর্তে রবি শস্য বোনা হলে মোট আখের উৎপাদনের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে কমে যায় প্রায় ৪ লক্ষ টন। আখ থেকে চিনি আহরণের পরিমাণ ৭.০০% থেকে ৭.৭৫% মাত্র। পক্ষান্তরে বিদেশে একর প্রতি ফলন ৩৫ টন এবং চিনি আহরণের হার শতকরা ১২ ভাগ। হাওয়াই, অস্ট্রেলিয়ায় এ হার আরও বেশি। চিনি শিল্পের উপজাত দ্রব্য হচ্ছে কাগজ ও কার্ডবোর্ড, ডিস্টিলারী, পশুখাদ্য, জ্বালানি, মোম, মদ, কাগজ তৈরির কাঁচামাল ও কৃত্রিম রাবার তৈরির কাঁচামাল হিসাবে বেগাসী, মোলাসিসের ব্যবহার চলে। অবশ্য আমাদের দেশে চিনি শিল্পের উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার খুবই কম।

আখ চাষের এলাকা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই কোর্ট চাঁদপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহনী, ঝিকরগাছা, নারিকেলবাড়ী, চাঁদগাজী, চিত্রা এবং ভৈরব এলাকা আখ চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বলে বিবেচিত হতো। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই আখ চাষ হয় তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আখ চাষ চিনিকল এলাকাগুলোতেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ১৬টি চিনিকল আছে এবং এগুলো দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, কুষ্টিয়া, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, নরসিংদী এবং ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। মিল এলাকায় প্রায় ২,৪৬,০০০ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়। এছাড়াও মিল কর্তৃপক্ষের ৫টি নিজস্ব খামার আছে এবং এগুলোর আয়তন প্রায় ১৬,৫০০ একর। বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির ১.৩% জমিতে আখ চাষ করা হয়। নিম্নে চিনিকলগুলো এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা দেয়া হলো যা থেকে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আখ চাষ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। [দ্রষ্টব্য তালিকা – ১]

তালিকা – ১

বাংলাদেশের চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতা

	চিনিকলের নাম	স্থান	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (টন)
১.	পঞ্চগড় চিনিকল	দিনাজপুর	১০,০০০
২.	ঠাকুর গাঁও চিনিকল	ঠাকুরগাঁও	১৫,০০০
৩.	রংপুর চিনিকল	রংপুর (মহিমাগঞ্জ)	১৫,০০০
৪.	শ্যামপুর চিনিকল	রংপুর	১০,০০০
৫.	রাজশাহী চিনিকল	রাজশাহী (হরিয়ান)	১৫,০০০
৬.	উত্তর বঙ্গ চিনিকল	রাজশাহী	১৪,০০০
৭.	জয়পুরহাট চিনিকল	বগুড়া	২০,০০০
৮.	কেরু এণ্ড কোং চিনিকল	দর্শনা, কুষ্টিয়া	১২,০০০
৯.	মোবারকগঞ্জ চিনিকল	যশোর	১০,০০০
১০.	জিল বাংলা চিনিকল	ময়মণসিংহ	১০,০০০
১১.	কালিয়াচাপড়া চিনিকল	কিশোরগঞ্জ	১০,০০০
১২.	দেশবন্ধু চিনিকল	চরসিন্ধু, নরসিংদী	২,০০০
১৩.	ফরিদপুর চিনিকল	ফরিদপুর	১,০০০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা

আখ চাষের জমির প্রকৃতি ঃ দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল ও কাদা মাটিতে আখ চাষ করা যায়। বেলে মাটিতে আখের চাষ ভাল হয় না। এঁটেল ও কাদা মাটি আখ চাষের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। আখ চাষের জন্য উঁচু জমি সবচেয়ে ভাল তবে মাঝারি উঁচু জমিতেও এর চাষ করা যায়। বৃষ্টি বা বর্ষার প্লাবনে প্লাবিত হয়ে পানি দাঁড়িয়ে থাকে বা জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এমন জমিতে আখের চাষ করা উচিত নয়।[১]

১. মুহম্মদ ছমিরুদ্দীন খাঁ—"আখ চাষ" শীর্ষক প্রবন্ধ 'কৃষি কথা' পৌষ ১৩৮৯

আখের বিভিন্ন জাতঃ জমির অবস্থান বা মাটির প্রকারভেদে আখের ফলনের তারতম্য ঘটে। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি জাত সর্বত্র অধিক পরিমাণে আবাদ করা হয়।

তালিকা - ২

বিভিন্ন জাতের আখ

ঈশ্বরদী	—	২/৫৪
ঈশ্বরদী	—	১৬
ঈশ্বরদী	—	৯/৫৭
সি, ও	—	১১৫৮
সি, ও	—	৯৭৫
বি, এস	—	৯৬

সূত্র ঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা

উপরিউক্ত জাতগুলোর মধ্যে ঈশ্বরদী ২/৫৪ ও ৯/৫৭ এবং সি, ও ১১৫৮ উন্নতমানের জাত হিসাবে অনুমোদিত। এসব জাতের আখ থেকে চিনি বেশি পাওয়া যায় এবং এদের রোগ বালাই কম হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আখের নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে। সাধারণত একর প্রতি বেশি ফলন, চিনি উৎপাদনের বেশি ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আখের নতুন জাত উদ্ভাবনে প্রচেষ্টা হচ্ছে।

আখের বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ঃ ১৯৬৫ সালের অধ্যাদেশটি ১৯৮৫ সালে রহিত করা হয়। এর ফলে চিনি কলগুলোতে আখ সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৮৬ সালে পুনরায় মিল এলাকায় বিদ্যুৎ চালিত কলে আখ মাড়াই নিষিদ্ধ করে সরকারী সার্কুলার জারি করা হয়।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে বর্তমানে চিনিকলগুলোর অধীনে মোট ৫,৯১,৮৪৬ একর জমি আছে। উপরিউক্ত অধ্যাদেশের ফলে ক্রেতা আখের দাম নির্ধারন করে বিক্রেতা নয়। যেখানে কৃষকের জন্য বিকল্পের সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশের আখের বাজারে মনোপসনি বাজারের প্রায়

সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। এ ধরনের বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে। অন্যদিকে ক্রেতা থাকে একজন। যেহেতু মিলগুলো সবকটিই রাষ্ট্রায়ত্ব এবং আখ ক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ নেই সেহেতু আখের এ মনোপসনি বাজারে 'বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থা' একমাত্র ক্রেতা। মূল্য ক্রেতাই নির্ধারণ করে। বিক্রেতার কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট মূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে তার সমুদয় আখ মিলের ক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া।

আখ বপণ করার সময়ে চিনিকলগুলোর অধীন এলাকায় মিল কর্তৃক নিয়োজিত ফিলড কর্মচারীরা কত একর জমিতে আখ চাষ করা হচ্ছে তার হিসাব নিয়ে বিভিন্ন চাষীকে একটি করে কার্ড দিয়ে দেয়। যাতে কত একর জমির কত মণ আখ তার কাছ থেকে মিল কর্তৃপক্ষ কিনবে তার হিসাব দেয়া থাকে।

আখ যখন থেকে কাটা শুরু হয় সে সময় থেকেই ঐ কার্ড অনুযায়ী মিল অনুমোদিত পুর্জি কমিটি প্রতি আখ চাষীকে একটি করে পুর্জি (পারমিট) দেয়; এক একটি পুর্জির অধীনে প্রত্যেক জন আখ চাষী গাড়ীসহ ৩৫ মণ ৩৫ সের ওজনের আখ বিক্রয় করতে পারে। যেখানে গাড়ী ছাড়া আখের ওজন দাঁড়ায় ২৫ মণের মতো। উল্লেখ্য যে পুর্জি ছাড়া মিলে আখ বিক্রয় করা যায় না।

বর্তমান বাজারজাতকরণ সঙ্কট

১. প্রথম সঙ্কট সৃষ্টি হয় উল্লেখিত পারমিট বা পুর্জি নিয়ে। পুর্জি কমিটি গঠিত হয় প্রতিটি আখ ক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকার জন্য এবং এ কমিটির মধ্যে থাকেন মিলের একজন প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় মাতব্বর ইত্যাদি) কার্ডে আখ ক্রয় করার পরিমাণ বর্ণিত থাকে। সে অনুযায়ী পুর্জির কোটা নির্ধারিত হয়। আখ কাটা শুরু হয় পুর্জি দেবার পরই। কিন্তু প্রতিটি চিনি কল এলাকায় যেটি ঘটছে তা হচ্ছে অপ্রভাবশালী ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষক কখনোই সময়মত পুর্জি পায় না। অন্যদিকে প্রতিটি এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের প্রাপ্য পুর্জির চেয়ে অধিকসংখ্যক পুর্জি নিয়ে নেয়। তাদের প্রতিপালিত টাউট মধ্যস্বত্বভোগিরা আখের জমি না থাকলেও পুর্জি পায়। এ ঘটনা বার্ষিক নিয়মিত ঘটনা। দরিদ্র এবং মাঝারি কৃষকরা পুর্জির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সামর্থ্য থাকলে টাউট ব্যক্তিদের নিকট থেকে কালোবাজারীতে পুর্জি কিনে সে পুর্জি দিয়ে আখ বিক্রয় করে। কৃষকদের সামর্থ্য না থাকলে আখ, ক্ষেতেই শুকিয়ে যায়। সে আখ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জানা গেছে, এক একটি পুর্জি ২০/২৫ টাকা থেকে ১০০/১২৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

২ আখ ক্রয় কেন্দ্র বা মিলগেটে আখ ওজন করার সময় কারচুপি প্রতিটি এলাকারই বৈশিষ্ট্য। এ নিয়ে প্রায়শ সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি।

৩. আখ ক্ষেত থেকে যেহেতু আখ ওজন করে নিয়ে আসা সম্ভব নয় সেহেতু আখ উৎপাদকেরা একটা আন্দাজমত আখ কেটে তা গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে আসে। এক একটি পুর্জি বা পারমিটের জন্য নির্ধারিত থাকে ২৫ মণ। ওজনে যদি কিছু আখ বেশি হয় তা মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে না। এসব বাড়তি আখ ক্রয়ের জন্য কিছু দালাল ব্যক্তি ক্রয় কেন্দ্রে সর্বক্ষণ থাকে। যারা কৃষকদের এ অসহায় অবস্থার সুযোগে প্রতিমণ আখ ৩/৪ টাকায় ক্রয় করে নেয়।

৪. আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ চাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক যারা ৫ মাস ধরে (নভেম্বর-মার্চ) মিলের আখ ক্রয় এর সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। জমির আখ আগেই বিক্রি করে দেয় অত্যন্ত কম দামে।

৫. চিনিকল নির্ধারিত সময়ে এবং নিয়মিত না চলার দরুন আখ ক্রয়ে বিলম্ব হয়; কিংবা পুর্জি দেরীতে পাবার দরুন আখ চাষীরা দেরী করতে বাধ্য হয়। যার ফলে আখের ওজন কমে যায়।

৬. প্রতিমণ আখ বিক্রির সময় ১২ পয়সা পথ কর এবং কোথাও ৫ পয়সা শিক্ষা করও নেয়া হয়। কিন্তু এ পথ কর নেয়া সত্ত্বেও চিনিকল এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোন সড়ক উন্নয়ন হয়নি। গরুগাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় এ সকল সড়ক দিয়ে কৃষকদের পক্ষে আখ নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। এছাড়া রাস্তা দিয়ে মিলের ট্রলি চলাচল করাও ঝুঁকিপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, ক্ষেত থেকে আখ ক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য কোন রকম পরিবহণ খরচ দেয়া হয় না।

৭. সেচ ব্যবস্থা না থাকার দরুন আখ চাষের প্রধান এলাকা উত্তরবঙ্গে নদী শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আখ শুকিয়ে যেতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যখন কৃষক পুর্জি পেয়েছে তখন তার আখ শুকিয়ে গেছে।

৮. আখ চাষীদের আখ চাষে বাধ্য করার পরোক্ষ ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। মিল এলাকাগুলোতে কখনোই সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়নি। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন না করার ফলে ধান কিংবা পাট উৎপাদনে অনিশ্চয়তা অনেক বেশি, সেজন্য তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত ফসল আখ উৎপাদনে করা বাধ্য হয়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না।

গুড় তৈরি ঃ কৃষকের জন্য লাভজনক বিকল্প (নিষিদ্ধ) ১৮ মাসের দীর্ঘ মেয়াদী এ প্রক্রিয়া হিসেব করে দেখা যায় দীর্ঘ মেয়াদের হিসেব বাদ দিলেও পুর্জি ক্রয়, আখ ক্রয়ে কারচুপি ইত্যাদিতে আখের মণ প্রতি উৎপাদন খরচ ১৫ টাকা পার হয়ে যায়। উপরন্তু থাকে এক বিরাট ধরনের অনিশ্চয়তা এবং পাশাপাশি আখের জন্য জমি মাসের পর মাস আটকে থাকে যা সঠিক সময়ে কাটলে ক্ষেতে অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। অন্যদিকে আখ ক্রয় কেন্দ্রে সরকার

নির্ধারিত আখের দাম হচ্ছে মণ প্রতি ২১.০০ টাকা; মিলগেটে ২১.৫০ টাকা। ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখের পর থেকে প্রতি ১৫ দিন পর পর আখের দাম মণ প্রতি ৫০ পয়সা করে বাড়াবে যা আখ শুকিয়ে যাবার হারের চেয়ে অনেক কম দর। উল্লেখ্য এরকম একটা অসহায় অবস্থার জন্যই আখ চাষীরা গুড় উৎপাদনে বেশি উৎসাহি হয় না। পাশাপাশি রয়েছে গুড় উৎপাদনের লাভজনক দিক। আখ যদি নিকৃষ্টও হয় তবু দেখা যায় ১ মণ গুড় করতে ৮/১০ মণ আখ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১ মণ আখ থেকেই ন্যূনতম ৪ সের গুড় উৎপাদন করা যায়। যার বাজার দাম ৫০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত। খরচ বাদ দিতে যা থেকে গড়পড়তা আয় হতে পারে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা।

গুড় তৈরির প্রতিবন্ধকতা ঃ আখ ও চিনি উৎপাদনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক শক্তি হচ্ছে পাকিস্তান শাসন আমলে জারিকৃত "গুড় নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ"। উৎপাদক তখনই তার সমস্ত শ্রম; মনোযোগ দিয়ে তার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে যখন সে তার উৎপাদিত ফসল ভোগ করতে পারবে। তার উৎপাদিত ফসল তার জন্য বোঝা হিসেবে সৃষ্টি না হয়। একই সাথে তার উৎপাদিত ফসল তাকে ভোগ করার সুযোগ না দিয়ে তা ছিনিয়ে নিয়ে অধিকতর উৎপাদন আশা করা মূর্খতা।

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন মানুষ গুড় খেতে অভ্যস্থ। তাদের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে গুড় যেমনি সঙ্গতিপূর্ণ তেমনি তাদের সামর্থ্যের সাথেও গুড় মানানসই। চিনি কিনে খাবার ক্ষমতা কিংবা অভ্যাস কোনটাই তাদের নেই। সেজন্যই গুড়ের চাহিদা সারা দেশেই অত্যন্ত বেশি। এছাড়া গুড় শিল্প একটি বিকাশযোগ্য শিল্প। এই বিস্তৃত বাজারে চাহিদার জন্য গুড় উৎপাদনে কৃষকের বর্তমান ঝোক যাতে বাধা দিয়ে একদিকে কৃষকের নিজের ফসলের উপর মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে অন্যদিকে গুড় ভোগকারীদের বেশি দামে চিনি বা গুড় কিনে খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। একই সময়ে গুড় উৎপাদনে বাধা দিয়ে আখ কেনা হচ্ছে অত্যন্ত কম দামে। যেগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে আখ উৎপাদন কমছে। এতে গুড় শিল্প ধ্বংস হচ্ছে।

গুড় নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ তুলে দিলে কৃষকরা শুধু গুড় উৎপাদন করবে চিনি কলে আখ বিক্রি করবে না; এ ধরনের ধারণা প্রচার করে এ অযৌক্তিক এবং যুক্তিহীন আইনের স্বপক্ষে বলা হয়। কিন্তু এ অধ্যাদেশ তুলে দিলে কৃষকেরা অধিক হারে আখ উৎপাদন করতেন। কেননা তখন জমিতে আখ আটকে থাকতো না এবং চিনি কলে আখ জমা দিতে না পারলে তারা গুড় করতে পারতেন। বর্ধিত হারে গুড় উৎপাদনের ফলে দাম কমতো। কৃষকেরা তখন চিনিকলগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই আখ বিক্রি করতে উৎসাহিত হতেন। কেননা এটা সর্বজন বোধগম্য সত্য যে, আখ উৎপাদকেরা আখ উৎপাদন করে মূলত অর্থকরী ফসল হিসাবে বিক্রি করে নগদ অর্থ আয়ের জন্য। গুড় উৎপাদনের জন্য যে জটিল প্রক্রিয়া তাতে গরীব বিপুল সংখ্যক কৃষকরা যেতে চান না। ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া গেলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই তা বিক্রি করবেনই।

আখের মূল্য ঃ বর্তমানে আখের যা দাম হচ্ছে তা ন্যায্য দাম নয়। এক মণ আখের বর্তমান দাম ২১ টাকা। কিন্তু চিনি শিল্পের জন্য লাভজনক অবস্থায় থেকেও আখ চাষীদের জন্য ন্যায্য দাম এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব। নিম্নে হিসাব থেকে তা বুঝা যাবে।

ক. ১ মণ আখ থেকে চিনির উৎপাদন হার শতকরা ৭.৪২ ভাগ ধরলে মোট চিনি উৎপাদন ৩.২ সের যার দাম ২০ × ৩.২= ৬৪.০০ টাকা।

খ. সমপরিমাণ আখ থেকে শতকরা ৩.৫ ভাগ অর্থাৎ ১.৪ সের মোলসিস যার দাম ৩.০০ টাকা।

গ. সমপরিমাণ আখ থেকে বেগাস ও আবর্জনা ৩.০০ টাকা।

১ মণ আখ থেকে উৎপাদিত চিনি ও অন্যান্য উপ–উৎপাদনের মোট দাম (৬৪+৩+৩) =৭০.০০ টাকা। যদি চিনি উৎপাদনের খরচ বেশি করে ৪০ ভাগও ধরা হয় তবু ১ মণ আখ থেকে মোট আয় হচ্ছে (৭০–২৮) = ৪২ টাকা। যদি মণ প্রতি আখের দর ৩৫ টাকা করা হয় তবু চিনি শিল্পের লাভ থাকছে মণ প্রতি ৭০০ টাকা।

ক্ষুদ্র চিনিকল ঃ বে–সরকারী খাতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের পর্যাপ্ত সংখ্যক লাল চিনির খান্ডেশ্বরী মাড়াইকল স্থাপন করা গেলে আখ বাজারজাতকরণের জটিল সমস্যাগুলোর কিছুটা সমাধান আনা যাবে। এ সকল চিনিকল স্থাপনে ধনাঢ্য কৃষক ও কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে সহায়তাদানের জন্য সরকারী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়া গেলে এ ধরনের যথেষ্ট চিনিকল গ্রামে–গঞ্জে স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়। এতে পারমিটের সমস্যা থাকবে না। সমবায় সমিতিগুলো তাদের ইচ্ছামত পরিমাণ লাল চিনি তৈরি করতে পারবে। যার ফলে সদস্যদের কারোই ক্ষেতে আখ শুকিয়ে যাবে না। আখের উৎপাদন বেড়ে গেলে আরও নতুন লাল চিনির কল স্থাপিত হবে। এ সকল চিনি কলের মালিক হবে কৃষক অথবা তার সমবায় সমিতি। তবে এতে বাংলাদেশে চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি চিনি কলের কাঁচামালের সঙ্কট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরিবর্তন সাধন করে এগুলোকে রিফাইনারীতে পরিণত করা। অর্থাৎ এদের কাঁচামাল হবে লাল চিনি, গুড় ও চিটা গুড়। এসকল কাঁচামাল থেকে এরা উন্নতমানের চিনি, স্পিরিট, সিরকা ও অন্যান্য পণ্য তৈরি করবে। এ ধরনের একটা ব্যবস্থা চালু হলে কৃষক একদিকে যেমন তার উৎপাদিত পণ্য মজুত রেখে ন্যায্য মূল্যের দরকষাকষির সুযোগ পাবে। অন্য দিকে মিলগুলোতে কাঁচামাল মজুত রেখে সারা বৎসর মিল চালু রাখতে পারবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ তফসিলে বেসরকারী খাতে দু'হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন চিনিকল স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। লাল চিনির খান্ডেশ্বরী মাড়াইকলও হয়তো এর আওতায় কিছু কিছু চালু হতে পারে। এ লক্ষ্যে বে–সরকারী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত

আহ্বানও করা হয়েছে। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকা থেকে প্রচুর দরখাস্তও জমা পড়েছে। কিন্তু তিন বছর সময় চলে গেলেও এখন পর্যন্ত সে সকল দরখাস্ত বিবেচিত হচ্ছে না।

সুপারিশ

১. চাপ প্রয়োগ ও ঋণ দিয়ে চিনি শিল্পের কাঁচামাল যোগানের পরিবর্তে ভারতীয় পদ্ধতি ও সুগার শেয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

ক. **ভারতীয় পদ্ধতিঃ** ভারতীয় পদ্ধতি হচ্ছে চিনি গুড়ের অবাধ প্রতিযোগিতা। এ পদ্ধতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ভারতীয় চিনিকলের মোট উৎপাদনের ৬০% সরকার লেভির মাধ্যমে সংগ্রহ করে রেশনে বন্টন করে থাকে। অবশিষ্ট ৪০% ভাগ চিনি খোলা বাজারে বিক্রয় করে চিনি কল বেশি দাম পায়। ঐ বেশি দর দিয়ে চিনি কলগুলো প্রতিযোগিতামূলক দরে আখ কিনতে পারে। চিনিকলগুলো বেশি দরে আখ কিনতে না চাইলেও কৃষকের কোন দুর্ভাবনা থাকে না। কেননা, গুড় উৎপাদক শ্রেণী যে কোন পরিমাণ আখ কিনতে প্রস্তুত থাকে এবং গুড় উৎপাদন করতে পারে।

খ. **সুগার শেয়ারিং পদ্ধতিঃ** সুগার শেয়ারিং পদ্ধতি অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। এ পদ্ধতি উৎপাদনের গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। মরিশাস ও প্রভৃতি স্থানে আখ চাষী তার আখ চিনি কলে পৌছে দিয়ে বিনিময়ে উৎপাদিত চিনির ৭০% ভাগ পেয়ে থাকে।

২. চিনিকল ও আখ চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও মিল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং তাদের ব্যাপক অংশের মধ্যে বিরাজমান দুর্নীতি, কারচুপি, কৃষক স্বার্থবিরোধী তৎপরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

৩. আখ চাষীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের জন্য ট্রেনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর সহায়ক উপকরণ যথাঃ সেচ যন্ত্র, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সময়ে প্রয়োজন মত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বল্প ভাড়ায় ও সুলভে জমি চাষ ও পানি সেচের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন সরবরাহ করতে হবে।

৪. ১লা নভেম্বর থেকে মিলগুলোতে আখ মাড়াই শুরু করতে হবে।

৫. গুড় নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ সংশোধন। বাতিল করতে হবে।

৬. পুর্জি বিতরণ ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

৭. ওজনের ক্ষেত্রে কারচুপি বন্ধ করতে হবে।

৮. আখের মণ প্রতি মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা নগদ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. উৎপাদন খরচের মূল্যে চাষীদের মধ্যে চিনি বিতরণ করা যেতে পারে।

১০. বন্ধ হয়ে যাওয়া চিনিকলগুলো অবিলম্বে চালু করতে হবে।

১১. মিল ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করতে হবে।

১২. মিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডে আখ চাষী সমিতির প্রতিনিধি নিতে হবে।

১৩. আখ চাষী সমবায়গুলোকে আখচাষীদের স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হবে।

এ সমস্ত বিষয়গুলো ১৯৮১ সালের ৩১শে অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর বগুড়ার জয়পুর হাটে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আখ চাষী সমিতির দ্বিতীয় জাতীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত দাবিনামা থেকে সংগৃহীত।

শেষ কথা চিনি শিল্পের প্রতি আখ চাষীদের মনোভাব বিরোধাত্মক নয় এবং গুড় নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ চালু করে এবং উত্তরোত্তর কৃষকদের মধ্যে এ মনোভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। বর্তমান সঙ্কট যে বিরোধকে কেন্দ্র করে সে বিরোধ মৌলিক। যে কোন কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তুললে তাতে সে কাঁচামালের উৎপাদনের বিকাশ এবং শিল্পের বিকাশ একই সাথে হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু বর্তমানে আখ উৎপাদন কিংবা চিনি শিল্প কোনটিই বিকাশ লাভ করছে না। ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে গুড় শিল্প। একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আখ চাষী অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি। বর্তমান অবস্থা দূর করতে হলে প্রাথমিকভাবে আখচাষীদের নিজেদের উৎপাদিত ফসল নিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের ফসলর ন্যায্য দাম দিতে হবে। এজন্য সরকারের নমনীয় নীতিও চাষীদের সংগঠিত ভূমিকা আবশ্যক।

একাদশ অধ্যায়

তামাক

তামাক বাংলাদেশের অন্যতম কৃষিপণ্য। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসলের মধ্যেও তামাক অন্যতম। তামাকের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং এই ফসলের বিকাশ সাধন করা উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৯৭৩ সালে "তামাক উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করা হয়। বাংলাদেশ তামাক উন্নয়ন বোর্ড কৃষিজ ও বনজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারী সংস্থা।

১৯৬৯-৭০ সনের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪০,৫৮৫ টন। এবং তামাক উৎপাদনকারী জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার একর। ১৯৭৮-৭৯ সনে ১ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৩ হাজার টন। ১৯৮০-৮১ সালে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টন। তামাক উৎপাদনে এই বৎসর জমির পরিমাণ ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার একর। ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় উপরিউক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তামাকের উৎপাদন কিছুটা বেশি ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ১,৩১,৩০০ একর জমিতে তামাকের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৪,৬০০ টন। তবে ১৯৮৭ সালে ২৫ হাজারেরও বেশিসংখ্যক চাষীকে ৩২ হাজার একর জমিতে তাপশোধিত ও বায়ুশোধিত বালি তামাক উৎপাদনের জন্য সিগারেট কোম্পানীর তালিকাভুক্তি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই কম বেশি তামাকের চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেই সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপাদন হয়। বিশেষ করে রংপুরে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপাদন হয়। দেশের মোট তামাক উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ একমাত্র রংপুর জেলাতেই জন্মে। বর্তমানে কুষ্টিয়া এবং যশোর জেলাতেও উৎকৃষ্টমানের তামাক উৎপাদন হয়।

তালিকা – ১

বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতের তামাকের উৎপাদনের পরিমাণ (উৎপাদন টন হিসাবে)

জেলাভিত্তিক	মতিহারী		জাতি		ভার্জিনিয়া		অন্যান্য		মোট	
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪
চট্টগ্রাম	১০৮	১০৩	১৪৩	১৪৩	৪১৮	৪১৩	৭১৫	—	১২৪০	১২১০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪৯	৫০	৮৪	৭৯	২০	৫	২২৫	১৯৪	৪১৪	১২২৫
কুমিল্লা	৬৯৪	৬৬৪	—	—	—	—	১১৮	১৬৩	৯০০	৮৩৬
নোয়াখালী	—	—	২৮৫	২৯৫	—	—	—	৯৩	—	৬৪
সিলেট	১০৫৩	৯০০	৪২৮	৩৯৩	৪৪৩	—	১৫৭	(০.৬৪)	১৪৯৬	১৩৩৩
ঢাকা	৮৬১	৭৭৭	৭৮৯	১১১২	—	৮১৩	২৫১	১৩৮	১৭০২	১৫৮৩
ফরিদপুর	২৬৬	৩১০	৯৭৪	১০০৯	—	—	—	২৯৫	১৫০৬	১৭১৭
জামালপুর	৩৪	৩৪	২৫১	৩০৫	—	—	—	—	১০০৯	১০৪৩
কিশোরগঞ্জ	২২৬	২৫৬	৫৩৬	৫০৭	—	—	—	—	৪৭২	৫৬১
ময়মনসিংহ	৪৪	৪৯	২০৭	২০৭	—	—	—	—	৫৭৬	৫৫৬
টাঙ্গাইল	২৮৫	২২৬	—	—	—	—	—	—	৪৯৭	৪০৩
বরিশাল	১২২০	৮৫৬	১১৩	৩৯	—	—	—	—	১২২০	৮৫৬
যশোর	৮৪	৮৪	২৫	৬৯	১৭০৩	১৪৭৬	১৪৮	১৬৭	১৯৫৮	১৭৬৬
খুলনা	১১৩	৭৯	২৫	১৫	৬৪	৫	১৫	১০	৩০৫	১৬৩
কুষ্টিয়া	১০	২০	—	—	১০১২৭	৮০৪৫	৪৯	৪৪	১২,০২১১	৮১২৪
পটুয়াখালী	১০৮	১০৮	—	—	—	—	১৩৩	১৩৩	২৪১	২৪১
বগুড়া	৭৪	৬৪	৮৪	৭৪	১৫	১৫	—	—	১৭২	১৫৩
দিনাজপুর	১৩৮	১৩৮	১৩৮	১২৩	২১২	২০৭	—	১৫	৪৮৭	৪৫৩
পাবনা	৩০৫	২৯৫	৩০৫	৩১৫	—	—	৫৪	৫৪	৬৫৯	৬৬৪
রাজশাহী	৬৪	৬৪	২৮৩	২৪৬	—	(০.৭৭)	৪৯	৩৯	৪০৫	৩৫৯
রংপুর	১০,৯৫০	১১,৪৯০	৬৮৬৪	৬৬১৩	৬৩২৩	৬৫৬৪	—	—	২৪,১৩৬	২৪,৬৬৭
বাংলাদেশ	১৬৬৮৬	১৬,৫৪৭	১১৭২৬	১১৫৪৪	১৯৩২৪	১৭১৪৩	১৯১৪	১৮৪৫	৪৯৬৫০	৪৭০৭

সূত্রঃ – Statistical year book of Bangladesh 1984

তামাকের শ্রেণী বিভাগ পরিচিতি

তামাকের শ্রেণী বিভাগ বা পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের তামাকের ব্যবহার বা জাত সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে হবে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে নিকোটিয়েনা টাকোমে ও নিকোটিয়েনা রাশটিকা পরিবার নামে তামাক পরিচিত। বাংলাদেশে কেবলমাত্র মতিহারী তামাক নিকোটিয়েনা রাশটিকা পরিবারভুক্ত। বাকী সব নিকোটিয়েনা টাকোমে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের তামাক রয়েছে। ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে এদের নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়।

ব্যবহার	জাত
১. সিগারেট তামাক	
সিগারেট তামাকের আবাদ প্রাক-স্বাধীনতা আমলে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পরীক্ষা-মূলকভাবে সামান্য উৎপাদন হত। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে সিগারেট তামাকের বিপুল পরিমাণে ঘাটতি দেখা যায়। কার্যত ১৯৭৩-৭৪ সালে থেকে তামাক উন্নয়ন বোর্ড সিগারেট তামাক চাষের সার্বিক সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সিগারেট তামাকের চাষ বাংলাদেশে প্রায় নতুন। কয়েক বৎসর আগেও আমাদের দেশি চাষীরা এই তামাক সম্পর্কে অপরিচিত ছিল। বর্তমানে এই তামাকের উৎপাদন এবং ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।	হ্যারিশন স্পেশাল, ম্যাকনিয়র-১২ এন, সি-৯৫, এন সি -২,৫১২, পোকার-২৫৪, বালি-২১, ওয়াবব, সেমৎসরিয়া, হিকস, ওরিনোকো, ভার্জিনিয়া গোল্ড, হোয়াই, বালি ইত্যাদি।
২. হুক্কা	
হুক্কা ব্যবহার আদি থাকে প্রচলিত। তামাক পাতাকে বিভিন্ন উপাদনের সাথে মিশ্রিণ করার পর হুক্কায় ব্যবহার করা হয়। হুক্কার ব্যবহার গরীব চাষী থেকে জমিদার পর্যন্ত বিস্তৃত।	ডেংগী, সূর্যমুখী ডেংগী, নাওবেল, মতিহারী, জাতি ইত্যাদি।

৩. বিড়ি তামাক হিসাবে বিড়ি এখন খুবই জনপ্রিয়। এর ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে প্রচুর।	নিপণী, বিড়ি ৫২০/২, গান্ডি–ও–৬, মতিহারী জাতি ইত্যাদি
৪. জর্দা, কিমাস, নাষ্যি, সাদাপাতা ও গুল এগুলোর ব্যবহার সর্বজন বিদিত। জর্দা ও সাদাপাতা মানুষ পানের সাথে ব্যবহার করে থাকে। এগুলো মতিহারী এবং জাতি তামাক দ্বারা উৎপন্ন হয়।	মতিহারী, জাতি
৫. চুরুট বা সিগার চুরুট বা সিগারের প্রচলন দেশের শহরাঞ্চলের বেশি, অত্যন্ত 'কড়া' হিসাবে এর ভাল পরিচিতি আছে। সিগার ম্যানিলা, সুমাত্রা এবং মতিহারী দ্বারা প্রস্তুত হয়।	ম্যানিলা, সুমাত্রা, জাতি কিলো নং ৪৯, এবং মতিহারী।

দেশী তামাক

দেশী তামাকের চাষ আমাদের দেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে চলে আসছে। দেশের যে পরিমাণ জমিতে এর চাষ এবং উৎপাদন হয় তা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। বাংলাদেশের বড় বড় তামাক কোম্পানীগুলো এই দেশি তামাকের প্রধান ক্রেতা। এই তামাকের উল্লেখযোগ্য জাত হলো মতিহারী এবং জাতি।

তামাকের শ্রেণী বিভাগ এবং পরিচিতিতে আমরা দেখতে পাই যে, সবচেয়ে ব্যবহৃত এবং প্রচলিত তামাক হলো জাতি এবং মতিহারী। পেশাগত শ্রেণী বিন্যাসকারীরা তামাক পাতাগুলোর শ্রেণী বিন্যাস ও মাননির্ধারণ করে এবং সেগুলো বস্তায় ভর্তি করে বিভিন্ন ব্যবসা ভিত্তিক নাম দিয়া থাকে। নিম্নে তাহা দেখানো হলো ঃ

মতিহারী	জাতি
১. পানপাত বা চাটাই	১. তালিম
২. চন্দ্রা	২. চন্দ্রা
৩. জিরান	৩. জিরান
৪. জারা	৪. কাটচাকটে।

সূত্রঃ বাংলাদেশে পণ্য বিপণন ব্যবস্থা, ডঃ আব্দুল্লাহ্ ফারুক

তামাকের বণ্টন প্রণালী

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত তামাকের সবটুকু বাজারে আসে না। বিক্রয়যোগ্য তামাকের পরিমাণ মোট উৎপাদিত তামাকের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ বা ২৫%। বাকী তামাক উৎপাদনকারীরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। বিক্রয়যোগ্য তামাক কয়েকটি স্তর পার হয়ে ভোক্তা বা সাধারণ ক্রেতার হাতে পৌছে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী এবং সাধারণ ক্রেতার মাঝখানে বেশ কিছু মধ্যস্থকারবারী থাকে। নিম্নের চার্টের মাধ্যমে তা দেখান হলো ঃ

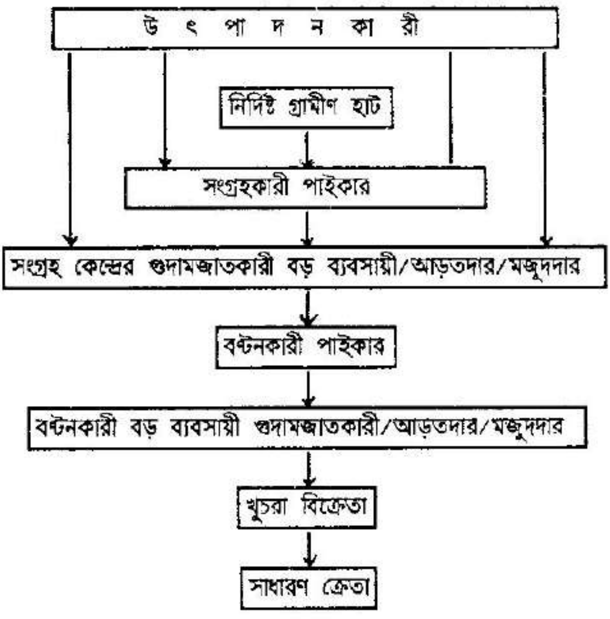

সূত্রঃ বাংলাদেশের পণ্য বিপণন ব্যবস্থা ডঃ আব্দুল্লাহ্ ফারুক

তামাকের বণ্টন প্রণালীর চিত্র অনুযায়ী তামাক চাষী বা উৎপাদনকারীরা প্রথমে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য নির্দিষ্ট গ্রামীণ হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। হাট থেকে সংগ্রহকারী পাইকাররা তামাক ক্রয় করে নিকটস্থ সংগ্রহ কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সংগ্রহ কেন্দ্রের আড়তদার বা মজুতদারগণ দামদস্তর ঠিক হওয়ার পর সংগ্রহকারী পাইকারের নিকট থেকে তামাক ক্রয় করে রাখে। অনেক সময় তামাক চাষীরা (বিশেষ করে বড় চাষীরা, যাদের উদ্বৃত্ত বেশি থাকে) নিজেরা সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে তামাক বিক্রি করে। সংগ্রহ কেন্দ্রের আড়তদারগণ অতঃপর বণ্টনকারী পাইকার কিংবা বণ্টনকারী আড়তদারের নিকট পণ্য বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতাগণ বণ্টনকারী আড়তদারের নিকট থেকে তামাক ক্রয় করার পর সাধারণ ক্রেতার নিকট বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতারা সাধরণ ক্রেতার কাছে তামাক পাতা অবস্থায় (যা সাধারণ্যে পানের সাদা নামে পরিচিতি) বিক্রি করে থাকে।

তামাকের বণ্টনপ্রণালী দীর্ঘ হওয়ার কারণে প্রায়শই চাষীরা তামাকের ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়। সাধারণ ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যের মাত্র শতকরা ২৯.৫ ভাগ চাষীরা পেয়ে থাকে। বাকী অংশ মধ্যস্বত্ব ভোগীদের লাভসহ বিভিন্ন প্রকার খাতে যেমন দালালী, পরিবহণ খরচ, বাজারশুল্ক, নগরশুল্ক, আবগারী শুল্ক, কাটিং ও গ্রেডিং বা প্যাকিং এবং ঝাড়ুদারদের মুজুরী ও দান বাবদ খরচে ব্যায়িত হয়। বিপণনের খরচ অধিক হওয়ায় বিপণন দক্ষতাও বিঘ্নিত হয়।

সিগারেট তামাকের মান নিয়ন্ত্রণ

সিগারেট তামাকের উৎপাদনের সাথে মানের সম্পর্ক অতি নিবিড়। সিগারেট তামাকের পাতার গ্রেডিং করে মান সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়।

গ্রেডিং

ক্রেতার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস বা বাছাই করাকে গ্রেডিং বলে, পাতা সিগারেট তামাকের মূল ফসল। পাতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সিগারেট তামাকের গ্রেডিং করা হয়। গ্রেডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাতার দাম গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ক্রেতা হয়তো নিকৃষ্ট মানের পাতা সম্পূর্ণ নাকচ করিতে পারে। তাই সিগারেট তামাকের পাতা কিভাবে গ্রেডিং করতে হয় তা আলোচনা করা হলো।

গ্রেডিং পদ্ধতি

গ্রেডিং তিন প্রকারে করা যায়।

১. কিউরিং এর প্রকৃতি
২. সিগারেট তামাক গাছে পতার অবস্থান।
৩. মানের বৈশিষ্ট্য

১. কিউরিং এর প্রকৃতি

কিউরিং অনুযায়ী পাতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

১. তাপ শোধিত পাতা
২. বায়ু শোধিত বা সূর্যালোকে শোধিত এবং
৩. ধোঁয়া শোধিত পাতা

২. পাতার অবস্থান

সিগারেট তামাক গাছে পাতার অবস্থান অনুযায়ী পাতাগুলোকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. নীচের পাতা
খ. নীচের উপরের পাতা
গ. কাটার এর উপরের পাতা
ঘ. উপরের পাতা

৩. মানের বৈশিষ্ট্য

মানের বৈশিষ্ট্য প্রধানত নির্ভর করে পাতার রং , গঠন ও দাগের উপর। যে সব রঙের উপর ভিত্তি করে পাতা বাছাই করা হয় তা হলো লেবুর রং, কমলা রং, হলুদ রং, বাদামী রং, মেহগিনি রং, ধুসর রং, সবুজ–কমলা রং ও চরালাল রং। পাতার গঠন মসৃণ, মাঝারি মসৃণ, অ-মসৃণ হতে পারে। পাতার মধ্যে বিভিন্ন রকম দোষ এটি দেখা যায়। প্রধানত যে সমস্ত দোষএটি পাতার মধ্যে রয়েছে তা হলো সবুজ সূক্ষ্ম ছিদ্র, বাদামী দাগ, পোকামাকড় ও রোগ–বালাইর আক্রমণজনিত ক্ষয়ক্ষতি, পোড়া কালদাগ, নাড়াচাড়াজনিত ভাঙ্গাসহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি। আবার কোন কোন দেশে সিগারেট তামাক পাতাকে অতি উত্তম, উত্তম, ভাল, মোটামুটি, সাধারণ ও নিকৃষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করে পাতার মানের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়।

চাষীরা সাধারণভাবে তামাকের যে শ্রেণীবিন্যায় ও বেল করে থাকে ক্রেতা তা ক্রয় করার পর আবার সাবধানতার সাথে শ্রেণীবিন্যাস ও বেল তৈরি করে থাকে। তামাক কেনার পর পুনরায় শ্রেণীবিন্যাস ও বেল করার কারণ হলো।

ক. স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন

চাষীদের কাছ থেকে যে সব তামাকের বেল ক্রয় করা হয় তাদের গ্রেড ও ওজন বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু আধুনিক সিগারেট শিল্পে স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড তামাকের চাহিদা খুব বেশি। এবং এসব শিল্পে স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড তামাক ছাড়া অন্য কোন তামাক ব্যবহার করা হয় না। আবার তামাক পাতা অনেক দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক। পরিমিত হয় না বলে এদের ভালভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় না। তামাকের গুণাগুণ এর বিশেষত্ব এবং কি পদ্ধতিতে এর এজিং করা হয় তার উপর নির্ভর করে ফারমেন্টশন এর পরিবর্তন হবে কিনা।

খ. গ্রেডিং

তামাক পাতার সাদৃশ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাতাগুলোকে নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে একজন চাষী গড়ে যে পরিমাণ তামাক উৎপাদন করে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের তামাককে পৃথকভাবে বেল করা সম্ভব নয়। কারণ কারিগরি এবং অর্থনৈতিক কারনে এবং বেল করার যন্ত্রপাতির অভাবে বেল করা সম্ভব হয় না। উল্লেখিত কারণে চাষীরা ঠিকমত গ্রেডিং করতে পারে না।

গ. ফারমেন্টেশন

তামাক পাতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফারমেন্টেশন করতে হলে পাতাগুলোকে মান অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়। অর্থাৎ রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে তামাক পাতাগুলোকে একই রকম আকার ও ওজনের গাঁইট স্তূপ করা হয়।

ঘ. বিভিন্ন মিশ্রণ

বিভিন্ন স্বাদের সিগারেট মিশ্রণ তৈরি করার জন্য তামাক পাতাগুলোকে এদের জাত ও মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে শ্রেণীবিন্যাস ও মিশ্রণ করতে হয়।

ঙ. ক্রেতার চাহিদা

তামাক ব্যবসায়ে মানের মূল্যায়ন সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য এটা ব্যবহারকারীদের প্রবণতার উপর নির্ভর করে। কোন নির্দিষ্ট গ্রুপের ধূমপায়ীদের মনোরঞ্জন বা সন্তুষ্টির জন্য যে মিশ্রণ তৈরি করা হয় তা সাধারণ প্রবণতার সাথে উপযোগী হয়ে সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

চ. গুদামজাতকরণ এবং পরিবহণ সুবিধা

তামাক পাতাগুলোকে এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করা দরকার যাতে পাতাগুলো আকৃতি, ওজন ও মানের দিক থেকে সমতা অর্জন করে। এতে তামাকের গুদামজাত, গ্রেডিং, পরিবহণ এবং পরিদর্শনে বেশ সুবিধা হয়। তামাকের বেলগুলো সমপরিমাণ হওয়া উচিত। তাতে তামাকের মান সংরক্ষণে নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়াও বাজারজাতকরণে অধিক আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে। সিগারেট তামাকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রসেসিং স্তর হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্যিক মূল্যায়ন অনুযায়ী সিগারেট তামাকের পৃথক পৃথক গ্রেডিং এবং বেল তৈরি করা, এতে পাতার ফারমেনটেশন, স্টোরেজ, এজিং ও পাতার মূল্যায়ন বেশ সহজ হয়। পাতার বিভিন্ন অর্থ মূল্যকে গ্রেড হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ক্রেতা এই গ্রেডগুলোকে দেখে, স্পর্শ করে এবং প্রয়োজন হলে ধূমপান করে মান নির্ধারণ করেন।

গ্রেড নির্ধারণে নিচের বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

ক. জাত ঃ তামাকের মান নির্ধারণের ভিত্তি যদিও একই রকম কিন্তু বিভিন্ন জাতের ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য (গ্রেড এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী) যখন প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং তামাক পাতা চাহিদা অনুযায়ী বাছাই করে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

খ. হাত ঃ তামাক গাছে পাতার অবস্থান অনুযায়ী একবারে তোলা একই আকারে গঠন ও একই রকম পরিপক্ব তামাক পাতার প্রতিটি গ্রুপকে হাত বলা হয়। বাহ্যিক এবং রাসায়নিক গুণাগুণের দিক থেকে একই হাতের পাতাগুলো প্রায় সাদৃশ্য কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এক পাতা অন্য পাতা থেকে ভিন্নতর। সিগারেট তামাক গাছে পাতা থেকে যে সব হাত হয় তাদের নাম হচ্ছে– বালি পাতা, নিচের পাতা, প্রথম মাঝের পাতা, দ্বিতীয় মাঝের পাতা, তৃতীয় মাঝের পাতা, উপরের নিচের পাতা, উপরের পাতা।

গ. আকৃতি ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত তামাক পাতার আকৃতি জাত ভেদে ভিন্নতর হয়। যদি কোন জাতের তামাকের পাতা স্বাভাবিক মান অনুযায়ী না হয় তবে পাতার গ্রেডিং বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

ঘ. রং ঃ তামাক পাতার রং পাতার মূল্য নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। রং পাতার রাসায়নিক গঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু প্রত্যেক জাতের তামাক পাতার রং ও স্বাদ ভিন্নতর সেহেতু নির্দিষ্ট কোন মান বের করা সম্ভব হয়নি।

ঙ. সৌরভ ঃ তামাকের গ্রেডিং নির্ধারণে যে সব বিষয় অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে, তন্মধ্যে সৌরভ অন্যতম।

চ. গঠন ঃ গ্রেডিং ও মূল্য নির্ধারণে তামাক পাতার গঠন, মসৃণতা, প্রতিরোধ শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চমানসম্পন্ন তামাক পাতার গঠন অতি মসৃণ, প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন এবং স্থিতিস্থাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছ. অক্ষত পাতাঃ পাতার কিনারা অক্ষত থাকতে হবে। পাতার কিনারা বা অন্য কোন অংশ ছেড়া বা ছিদ্র থাকলে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হবে।

জ. ত্রুটি বিচ্যুতি এবং রোগবালাইঃ তামাকের গ্রেডিং ও মূল্য নির্ধারণে পাতার ত্রুটি বিচ্যুতি ও রোগবালাই এর আক্রমণকে ববেচনা করা হয়। এর ফলে পাতার মান দারুণভাবে ব্যাহত হয়। কোন কোন সময় তামাক পাতা রোগ বালাইর আক্রমণ এবং অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে এর বাণিজ্যিক মূল্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে পারে। অতএব খুব সাবধানে তামাক পাতা নাড়াচাড়া করতে হবে।

বাংলাদেশের সিগারেট তামাক কোম্পানীর শ্রেণী বিভাগ

বাংলাদেশের তামাক কোম্পানীর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বাংলাদেশে বিভিন্ন সাইজের তামাক কোম্পানী আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ১৯টি উল্লেখযোগ্য তামাক কোম্পানী আছে যেগুলোকে গ্রেড অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

গ্রেড 'এ'

গ্রেড 'এ' তে চারটি কোম্পানী (যাদের নাম তালিকা – ২ এ দেখানো হলো) যারা বেশ বড় কোম্পানী হিসাবে পরিচিত। এই সমস্ত কোম্পানী শুধু সিগারেট তামাক জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনই করে না তারা দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর বিদেশে রপ্তানিও করে থাকে। তারা তামাক চাষীদের নিকট থেকে তামাক ক্রয় করে থাকে। দেশের বাইরেও এই সমস্ত কোম্পানী বিশাল পরিচিত আছে। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তামাক ক্রয় করে উন্নতমানের তামাক জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। এই সমস্ত কোম্পানী কোন কোন ক্ষেত্রে

আন্তর্জাতিক কোম্পানী হিসাবে পরিচিতি। এদের অনেক সময় বহুজাতিক কোম্পানী হিসাবেও কাজ করতে দেখা যায়। বি. টি. সি. তাদের অন্যতম।

গ্রেড 'বি'

এই গ্রুপে যে সমস্ত কোম্পানী আছে তারা স্থানীয় কোম্পানী হিসাবে পরিচিত। তারা সাধারণ নিম্নমানের সিগারেট তথা বিড়িমানের সিগারেট তৈরি করে। এই জাতীয় কোম্পানীর উৎপাদিত তামাক জাতীয় দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ চাহিদা ভাল।। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এঁদের চাহিদা খুব বেশি।

তালিকা - ২

বাংলাদেশের সিগারেট তামাক কোম্পানীর শ্রেণী-বিভাগ

গ্রেড 'এ'

১. বাংলাদেশ টোবাকো কোং লিঃ (বিটিসি)

২. বাংলাদেশ লীফ টোবাকো কোং লিঃ

৩. হোসনা টোবাকো কোং লিঃ

৪. ডেলটা টোবাকো কোং লিঃ

গ্রেড 'বি'

১. আলফা টোবাকো কোং লিঃ
২. ন্যাশনাল টোবাকো কোং লিঃ
৩. টোবাকো কোম্পানী লিমিটেড
৪. আজিজউদ্দীন কোং লিঃ
৫. গোল্ডেন বেঙ্গল টোবাকো কোং লিঃ
৬. এশিয়ান টোবাকো কোং
৭. ভারজিনা টোবাকো কোং
৮. ঢাকা কোম্পানী লিঃ
৯. চাঁদপুর টোবাকো লিঃ
১০. সোনালী টোবাকো কোং লিঃ

১১. কমনওয়েলথ টোবাকো কোং লিঃ
১২. আজিজ বিড়ি কোম্পানী
১৩. ভাইয়া টোবাকো কোম্পানী
১৪. খুলনা টোবাকো কোম্পানী
১৫. গোল্ড হিল টোবাকো কোং

তালিকা – ৩

তামাকের উৎপাদন, একর ভিত্তিক উৎপাদনের হার

বৎসর	একর	উৎপাদন (টন হিসাবে)	উৎপাদনের হার (একর প্রতি, পাঃ হিসাবে)
১৯৭২–৭৩	১,১৬,৩৫০	৩৯,৪৫৯	৭৬০
১৯৭৩–৭৪	১,৬৪,৬৪০	৪০,৯৪২	৫৫৭
১৯৭৪–৭৫	১,১২,৭৪০	৩৯,৭৩২	৭৮৯
১৯৭৫–৭৬	১,২১,৫৭৫	৪৪,৪৬২	৮১৯
১৯৭৬–৭৭	১,৬৪,১৬০	৬২,৫৩০	৮৩৩
১৯৭৭–৭৮	১,৩৭,১৫২	৪৯,০৮৫	৮০২
১৯৭৮–৭৯	১,২৩,০৫২	৪৩,০৫৩	৭৮৪
১৯৭৯–৮০	১,১১,৪২০	৩৮,৯০০	৭৮২
১৯৮০–৮১	১,২৬,৯৮০	৪৬,৬৩০	৮২৩
১৯৮১–৮২	১,৩৫,৯২০	৫০,২৪০	৮২৪
১৯৮২–৮৩	১,২৯,৪১০	৪৯,৬৫০	৮৬০
১৯৮৩–৮৪	১,২৭,৭৯০	৪৭,০৭৯	৮২৬

সূত্র ঃ Statistical year book of Bangladesh 1984.

তামাকের আমদানি

দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্যে বিদেশ হতেও তামাক আমদানি করা হয়। অবশ্য বিদেশ হতে যে সমস্ত তামাক আমদানি করা হয় তাদের অধিকাংশই উন্নতজাতের তামাক। তামাকের আমদানি বাবত রাজস্ব খরচ এবং যে দেশ হতে আমদানি করা হয় তা তালিকা–৪ এ দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৪

বাংলাদেশে তামাক আমদানি

বৎসর	রাজস্ব খরচ (লক্ষ টাকা)	যে সব দেশ হইতে আমদানি করা হয়
১৯৮১–৮২	·৮৬	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পাকিস্তান
১৯৮২–৮৩	০·৯২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ভারত
১৯৮৩–৮৪	১.৯৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
১৯৮৪–৮৫	·৬৬	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন
১৯৮৫–৮৬	১·৫৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, ভারত এবং কোরিয়া
১৯৮৬–৮৭	—	ভারত, বৃটেন

সূত্র ঃ খামারবাড়ী, ঢাকা

তামাকের রপ্তানি

দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর কয়েক জাতের উদ্বৃত্ত তামাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশ আমাদের এই তামাক ও তামাক জাতীয় দ্রব্যাদির ক্রেতা। তালিকা–৫ এর মাধ্যমে তামাকের রপ্তানি, রাজস্ব আয় এবং যে দেশে রপ্তানি করা হয়েছে সে দেশের নাম দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ৫

বাংলাদেশের তামাক রপ্তানি

বৎসর	মোট রপ্তানি (মেট্রিক টন)	রাজস্ব খরচ (কোটি টাকায়)	যে দেশে রপ্তানি করা হয়েছে
১৯৮১-৮২	১৬৭০	৫.৭০	পঃ জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, চীন।
১৯৮২-৮৩	১৬৭১	৬.০৭	পঃ জার্মান বেলজিয়াম, হংকং, চীন।
১৯৮৩-৮৪	৬৫৯৮	৭.৯৬	পূঃ জার্মানী, বৃটেন, ইটালী, বেলজিয়াম, মিশর, সিঙ্গাপুর, অসোভিয়েটইউনিয়ন।
১৯৮৪-৮৫	১৫২৪	৬.৬৫	সোভিয়েট ইউনিয়ন, নেদারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, শ্রীলঙ্কা।
১৯৮৫-৮৬	৫৮৭	২.৫০	পূঃ জার্মানী, বেলজিয়াম, বৃটেন, থাইল্যাণ্ড, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর।
১৯৮৬-৮৭	৭৩৭	৩.৭০	পূর্ব জার্মানী, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর।

সূত্র ঃ খামারবাড়ী, ঢাকা

তামাক উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অর্থকরী ফসল শাখা তামাক উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত তামাকের মোট উৎপাদন, রপ্তানি, আমদানি এবং রাজস্ব আয় তালিকা-৬ এ এর মাধ্যমে দেখান হলো।

তালিকা- ৬

বাংলাদেশে তামাকের উৎপাদন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাজস্ব আয়

বৎসর	উৎপাদন (লক্ষ/পাঃ)	রপ্তানি (কোটি টাকায়)	আমদানি (লক্ষ/পাঃ)	মোট রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)
১৯৭২-৭৩	৬.০০	—*	৪৫.০০	২৩.৬৭
১৯৭৩-৭৪	৭.৭০	—	১০.৫১	৫২.৯২
১৯৭৪-৭৫	১৩.৩২	—	১৪.৯০	৮৯.০১
১৯৭৫-৭৬	১৮.৪০	—	১৪.৮০	১০৮.৯১
১৯৭৬-৭৭	৪৬.৪০	—	৯.৫০	১২১.১৯
১৭৭-৭৮	৩৭.০০	—	০.৮০	১২৯.৩৮
১৯৭৮-৭৯	৪০.০০	—	০.৪৫	১৩২.০০
১৯৮০-৮১	৫৫.৬০	৪.০০	১.০০	১৯৯.০০
১৯৮১-৮২	৪৬.৬৫	৫.৭৫	১.৪১	২৩১.৩২
১৯৮২-৮৩	৫১.৫০	৬.০৭	—	২৩৯.৪০
১৯৮৩-৮৪	৪১.৪৫	৭.৯৭	—	২৪৬.৬৯
১৯৮৪-৮৫	৫৫.৫২	৬.৬৫	—	৩০৭.৮২
১৯৮৫-৮৬	৫১.১২	২.৩৫	—	৩৫৩.০০
১৯৮৬-৮৭	৪৫.২৮	৪.০০	৪.২৪	৪১৯.০৭

সূত্র : বাংলাদেশ কৃষি বাজার বিভাগ, ঢাকা

* তথ্য পাওয়া যায়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৭-৮৮ সালের তামাকের মূল্য নির্ধারণ করেছে। এখানে তামাকের গ্রেড অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তামাক পাতাকে তাপ শোধিত এবং বায়ুশোধিত এই দুই ভাগে ভাগ করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাপ শোধিত সিগারেট তামাকের মূল্য বায়ুশোধিত সিগারেট তামাকের তুলনায় বেশি।

তালিকা - ৭

১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য সুপারিশকৃত সর্ব নিম্নদর

তাপশোধিত	কেজি/টাকা
বাংলা-১	৪০.৫০
বাংলা-২	৩৬.০০
বাংলা-৩	৩১.৫০
বাংলা-৪	২৬.৫০
বাংলা-৫	২৩.০০
বাংলা-৬	২০.০০
বাংলা-৭	১৮.০০
বাংলা-৮	১৬.০০
বায়ুশোধিত	কেজি/টাকা
ডিভি-১	১৮.৫০
ডিভি-২	১৬.২৫
ডিভি-৩	১৪.২৫
ডব্লিউ, এ, এফ-১	১৮.৫০
ডব্লিউ, এ, এফ-২	১৬.২৫
ডব্লিউ, এ, এফ-৩	১৪.২৫
বার্লি-	২০.৫০

সূত্র : বাংলাদেশ কৃষি বাজার বিভাগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।

তামাকের বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশে তামাক বাজারজাতকরণে বহুবিধ সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত সমস্যা তামাকের বাজারজাতকরণের দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে। এই সমস্ত সমস্যার কারণে তামাকের বাজার প্রসারিত হচ্ছে না। নিম্নে তামাকের বাজারজাতকরণ দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বা তামাকের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. মধ্যস্থকারবারীদের সংখ্যাধিক্য

তামাকের বাজারজাতকরণে মধ্যস্থকারবারীদের আধিক্যের দরুন বিপণন খরচ বেড়ে যায়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, তামাকের জন্য সাধারণ ক্রেতা যে মূল্য প্রদান করে এতে মধ্যস্থকারবারীদের লাভের অংশই হলো ৩৩.১ শতাংশ। এতদ্ব্যতীত মধ্যস্থকারবারীর সংখ্যাধিক্যের ফলে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌছাতে একদিকে সময় বেশি লাগে এবং অন্যদিকে ভোক্তাদেরকে বেশি খরচের বোঝা বহন করতে হয়। সুতরাং মধ্যস্থকারবারীর আধিক্যকে তামাকের অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

২. করের চাপ

তামাকের উপর উৎপাদন পর্যায় থেকে আরম্ভ করে চূড়ান্ত ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ কর ধার্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বাজার কর, নগর কর, আবগারী কর, ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এসব করের ফলে বিপণন খরচ যেমন বৃদ্ধি পায়, বাজারজাতকরণ দক্ষতাও বিঘ্নিত হয়। এবং এই সমস্ত করের বোঝার অধিকাংশই বহন করতে হয় সাধারণ ক্রেতাদের।

৩. অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সমস্ত বাংলাদেশে তামাক জন্মালেও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা বিশেষ করে রংপুর জেলায় সর্বাধিক পরিমাণ তামাক উৎপাদিত হয়। অথচ দেশের এই অংশটিতে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। দেশের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার সাথে এই অঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা তামাক বিপণনের উপরও প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া তামাক বাজারজাতকরণে পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সড়ক পরিবহণ প্রধান। সড়ক পরিবহণের মাধ্যমে ট্রাক অন্যতম অথচ ট্রাক শ্রমিকদের কার্যবিরতি, ঘন ঘন হরতাল, ট্রাফিক জ্যাম, ফেরীর অভাব, পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদি কারণে তামাকের বাজারজাতকরণ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

৪. ফটকা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য

তামাক চাষীরা প্রায়ই সঠিক সময়ে ক্রেতার অভাবে বিক্রির ব্যাপারে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। ফলে উৎপাদনকারী আর্থিক সংকটে নিপতীত হয়। তামাক উৎপাদনকারীর আর্থিক সঙ্কটের সুযোগে এক ধরনের ফটকা ব্যবসায়ী পানির দামে তামাক ক্রয় করে। এসব ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বেঁধে দেয়া তামাকের সর্বনিম্ন দামের প্রতি কোন তোয়াক্কা করা হয় না।

৫. তামাক ক্রেতাদের শঠতা

তামাকের প্রধান ক্রেতা বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানী (বিটিসি)। অন্যান্য দুই একটি কোম্পানীও সরাসরি তামাক ক্রয় করে। অনেক সময় দেখা যায় তামাক কোম্পানীগুলো এক বৎসর পর মূল্য পরিশোধের শর্তে তামাক ক্রয় করে। যথেষ্ট সংখ্যক ক্রেতার অভাবে উৎপাদকরাও এই শর্তেই তামাক বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এমনি ভাবে ক্রীত তামাকের মূল্যও কোম্পানীগুলো ঠিকভাবে পরিশোধ করে না। আবার বি. টি. সি. সরকারী দামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তামাক কিনলেও গ্রেডিং এর মারপ্যাচের চাষীরা ঠকে থাকে।

৬. সরকারী তৎপরতার অভাব

তামাক উন্নয়ন বোর্ডের সুপারভাইজারসহ কিছু কর্মকর্তা তামাক ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার নির্দেশ থাকলেও অধিকাংশ সময় তারা অনুপস্থিত থাকেন। মুলত তামাক উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবস্থার কারণে তামাক চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে তামাকের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায়ও অদক্ষতার কালো ছায়া নেমে আসে।

৭. রাজনৈতিক অস্থিরতা

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ও তামাকের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার দক্ষতা বিঘ্নিত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কৃষক সময়মত দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে না ফলে তামাক জাতীয় দ্রব্যাদির দাম বেড়ে যায় এবং এই অস্থিরতার সুযোগে উচ্চ পর্যায়ে তামাকের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এবং এর ফলে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধান

আমরা তামাকের বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করেছি। এখন আমরা তামাকের বাজারজাতকরণের সম্ভাব্য সমাধানসমূহ আলোচনা করব।

(১) অযৌক্তিক ব্যয় হ্রাস

তামাকের বাজারজাতকরণে অযৌক্তিক ব্যয় হ্রাস করতে হবে। অযৌক্তিক ব্যয় বলতে আমরা দান, বাজার কর, আনুষ্ঠানিক খরচ ইত্যাদি বুঝে থাকি।

(২) সমবায় সমিতি গঠন

সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ে উৎসাহদান এবং এব্যাপারে সরকারী সাহায্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে।

(৩) সঠিক মূল্য বেধে দেয়া

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন জাতের তামাকের সঠিক মূল্য বেধে দেয়া এবং এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে পালন করা উচিত।

(৪) মধ্যস্থকারবারীর সংখ্যা হ্রাস

তামাকের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হলে মধ্যস্থকারবারীর সংখ্যা হ্রাস করতে হবে।

(৫) সরকারী তৎপরতা বৃদ্ধি

তামাকের বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সরকারী তৎপরতাও বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই তামাকের বাজারজাতকরণ সমস্যা হ্রাস পেতে পারে। এই ব্যাপারে সরকার ও তামাক উন্নয়ন বোর্ডকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) কর ও শুল্ক কমানো

তামাকের বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধান করতে হলে কর ও শুল্ক কমাতে হবে। সরকারকে তামাকের বিক্রয় করসহ অন্যান্য শুল্ক ও করের চাপ কমাতে হবে।

(৭) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

তামাকের বাজারজাতকরণে পরিবহণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নতি না হলে কৃষকগণ তামাকের ন্যায্য মুল্য পাবে না। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়ন আবশ্যক। কারণ দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে রংপুরে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক।

(৮) ফটকা ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য হ্রাস

ফটকা ব্যবসায়ীরা তামাকের বাজারজাতকরণে অংশগ্রহণ করে তামাকের বাজারজাতকরণে প্রচুর সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং ফটকা ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য হ্রাস করা তামাকের বাজারজাতকরণে অন্যতম সমাধান।

তামাকের বাজারজাতকরণে উন্নয়নের জন্য আরো কয়েকটি সুপারিশ

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদানুযায়ী দেশের মাটিতে তামাকের (জাতি, মতিহারী ও সিগারেট) উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সে সাথে উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ এবং সর্বোপরী জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করা দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করা হল।

(১) দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তামাকের সুষ্ঠু বাজারজাতকণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

(২) তামাক অর্ডিন্যান্স পাস করে সব জাতের তামাকের সরকার নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়ন করা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এ যাবত জাতি ও মতিহারী তামাকের উন্নয়নকল্পে কোনরূপ ব্যবস্থা এমন কি এর গ্রেড ও মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি ফলে তামাক চাষিরা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে তামাক চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সিগারেট তামাকের ন্যায় এদের উন্নয়নের ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত।

(৩) তামাক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে প্রশাসনিক আদেশ বহাল রাখা।

(৪) তামাক পাতা ক্রয়ের এবং তামাক পাতা ঘরে ধরে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যথাক্রমে সিগারেট প্রস্তুতকারক কারখানাগুলো ও তামাকচাষীদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

(৫) তামাক আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং সে সাথে উৎপাদিত সিগারেট তামাকের মান উন্নয়নের জন্য পুনঃশুল্ক পদ্ধতির বাস্তবায়ন করা।

(৬) উন্নত বীজ, আধুনিক উৎপাদন প্রণালী, যথা সময়ে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের আধুনিক কৌশল, পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করা।

(৭) তামাক চাষের জন্য শস্য বীমা প্রথা চালু করা।

(৮) তামাক চাষীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধিকল্পে প্রতি বৎসর আদর্শ তামাক চাষীদের জন্য পুরস্কার প্রদান প্রথা চালু করা।

(৯) তামাক চাষী যাতে মৌসুমের সময়ে ন্যায্য মূল্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে সক্ষম হয় সেজন্য সরকারী তরফ থেকে ফলপ্রসূ সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ফট্‌কা ব্যবসায়ীরা যাহাতে চাষীদের আর্থিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত কম দামে তামাক ক্রয় করতে না পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হলে তামাক বিপণনের অদক্ষতা অনেকটা দূরীভূত হবে এবং বিপণন ব্যবস্থায়ও গতিশীলতার সঞ্চার হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

চা

ভূমিকা ঃ চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর পরিমাণে চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চা থিয়া সাইনেনসিস নামক এক প্রকার চির সবুজ গাছের পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহ করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। চা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের ফসল। প্রথমে চীনে চা উৎপাদন করা হতো। পরে ইংরেজগরা ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চা-এর চাষ আরম্ভ করে। ১৮৪০ সালে সর্ব প্রথম আমাদের দেশে চা উৎপাদন শুরু হয়। পরে ব্যাপকভাবে চাষ আরম্ভ হয়। বাংলাদেশের চায়ের রং উৎকৃষ্ট কিন্তু গন্ধের দিক দিয়ে তত উন্নত নয়। আমাদের দেশে চায়ের ভোগ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে ১৯৭৪ সালে সর্বমোট ভোগের পরিমাণ ছিল ৬৯৬৫ মেট্রিক টন। যা ১৯৮৫ সালে বৃদ্ধি পায় ৯০০০ মেট্রিক টনে। সেই সাথে আমাদের দেশে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে বিদেশে রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমাদের দেশের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। ১৯৫১ সালে চায়ের সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখাশুনা করার জন্য পাকিস্তান চা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে এই বোর্ডের নাম পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। চা বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের অধীনে কাজ করে। এই বোর্ডের কাজ হচ্ছে উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে রপ্তানি করা পর্যন্ত সমস্ত কার্যাবলী দেখাশুনা করা। বর্তমানে এই বোর্ড চা বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বেশ সহায়তা করে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপাদন ভোগ, রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের উপর চা শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করছে। তাই চায়ের বাজারজাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

চা উৎপাদনের ইতিহাস

বাংলাদেশে চা উৎপাদন শুরু হয় ১৮৪০ সাল হতে। বাংলাদেশে কিভাবে চায়ের উৎপাদন আরম্ভ হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে দেয়া হলো।

বৃটিশ শাসন আমলে ১৮৩৫ সালে এই উপমহাদেশের আসাম এলাকায় প্রথম চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে আসামের বিরাট এলাকা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় চা চাষের উপযোগী জমি পাওয়া যায় এবং সে থেকেই উল্লেখিত এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে চায়ের চাষ শুরু হয়। ভারতের দারজিলিং, পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুরি এবং বাংলাদেশের সিলেট এলাকায় চা বাগান তৈরি করা হয়েছিল। উনিশ শতকের ৬ষ্ঠ দশকের শেষের দিকে ঐ সব এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে উৎপাদন আরম্ভ হয়। জলপাইগুরি জেলার চা

উৎপাদনকারী এলাকা "ডুয়ার্স" হিসাবে পরিচিত। দারজিলিং জেলার চা উৎপাদনকারী এলাকাকে "টেরাই" বলা হয়।

সিলেটের চা উৎপাদনকারী এলাকা ৬টি উপত্যকায় বিভক্ত। এদের নামগুলো নিম্নে দেয়া হলো।

* বলীশিয়া উপত্যকা।
* লস্করপুর উপত্যকা।
* মনোদোলাই উপত্যকা।
* লংলা উপত্যকা।
* গুরী উপত্যকা।
* উত্তর সিলেট উপত্যকা।

সিলেটের পরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় চা উৎপাদন শুরু হয়েছিল। এই চট্টগ্রাম এলাকাকে চা উৎপাদনের ৭ম উপত্যকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকের দিকে সিলেট জেলায় চা উৎপাদন শুরু হয়েছিল। সর্ব প্রথম "ডানকান ব্রাদার্স" কর্তৃক ১৮৫৪ সালে প্রথম চা বাগান সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে ঐ এলাকায় চা বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশের সিলেট জেলা প্রধান চা উৎপাদনকারী এলাকা হিসাবে পরিচিত। তারপর ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে একেকটি করে চা বাগান স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের এই সমস্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতে থাকে। যার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের চা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

চা বাগানের সংখ্যা ও মালিকানা

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫৪ টি চা বাগান আছে। চা বাগানগুলো সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অবস্থিত। কোন জেলায় কতটি বাগান আছে তার হিসাব ১ নং তালিকায় দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ১

বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বাগানের সংখ্যা
১	সিলেট	১৯ টি
২	মৌলভীবাজার	৮৯ টি
৩	হবিগঞ্জ	২২ টি
৪	চট্টগ্রাম	২২ টি
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১ টি
৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১ টি
	মোট	১৫৪ টি

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড

এই সমস্ত বাগানগুলোর (এস্টেট) মধ্যে কিছুর মালিক স্টারলিং কোম্পানী যা বৃটিশ কোম্পানী নামে পরিচিত। কিছু কিছু বাগানের মালিক বাংলাদেশী কোম্পানীসমূহ। এবং বাকি কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানা (স্বত্বাধিকারী) অধীনে আছে।

চা বাগানের মালিকানার একটি তালিকা দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ২

(ক) স্টারলিং কোম্পানীর আওতায় কোম্পানীসমূহ

[১৯৮৬ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত]

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম	বাগানের সংখ্যা
১	দি কনসোলিটেড টি এণ্ড ল্যাণ্ডস কোং (বাংলাদেশ) লিঃ	৪ টি
২	বরোয়া (সিলেট) টি কোং লিঃ	৩ টি
৩	দি নিও সিলেট টি এস্টেট লিঃ	১ টি
৪	এমো টি কোং লিঃ	২ টি
৫	অলীনগর টি কোং লিঃ	২ টি
৬	মাজদিহী টি কোং লিঃ	১ টি
৭	দি চাঁদপুর টি কোং লিঃ	১ টি
৮	দি লংলা (সিলেট) টি কোং লিঃ	৪ টি
৯	দি সুরমা ভেলী টি কোং লিঃ	৩ টি
১০	ডুনডি টি কোং লিঃ	৩ টি
১১	নোয়াপাতা টি কোং লিঃ	১ টি
১২	দি দুলাই টি কোং লিঃ	১ টি
	মোট	২৬ টি

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড

তালিকা - ৩

(খ) বাংলাদেশী কোম্পানীসমূহ

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম	বাগানের সংখ্যা
১	ন্যাশনাল টি কোং লিঃ	১২ টি
২	আহম্মদ টি এণ্ড ল্যাণ্ডস কোং লিঃ	৪ টি
৩	কেদারপুর টি কোং লিঃ	৩ টি
৪	গাজীপুর এণ্ড মিরজাপুরা টি এস্টেট লিঃ	২ টি
৫	এম. এম. ইস্পাহানী লিঃ	২ টি
৬	দি নিউ দাহমাই টি এস্টেট লিঃ এণ্ড দি সোনা রূপা টি কোং লিঃ	২ টি
৭	প্লানটার্স বাংলাদেশ লিঃ	২ টি
৮	অন্যান্য কোম্পানীসমূহ	৩৭ টি
	মোট	৬৪ টি

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

তালিকা - ৪

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহ

	কোম্পানীর নাম	বাগানের সংখ্যা
১	ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহ	৪০ টি
	মোট	৪০ টি

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

চা বাগানের আয়তন এবং উৎপাদন

বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ১১০ হাজার একর জমিতে চা চাষ করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে ১০৭ হাজার একর জমিতে চা চাষ করা হতো। বাংলাদেশের চা বাগানগুলো বেশির ভাগই বৃহত্তর সিলেট জেলায় অবস্থিত। আয়তনের দিকে সিলেট এলাকাই বৃহৎ। এর পর চট্টগ্রামে বেশ কিছু চা বাগান আছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় একটি করে চা বাগান আছে। ৫ নং তালিকায় বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক চা বাগানের আয়তনের পরিমাণ দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ৫

(৩১-১২-৮৪ সাল পর্যন্ত)

বাংলাদেশে চা বাগানের মোট আয়তন

ক্রমিক নং	জেলা	আয়তন (একর)	মোট আয়তনের শতকরা হার (চা বাগানের)
১	সিলেট	১১,০৮৭.০৭	৯.৯০
২	মৌলভীবাজার	৬৯,০৫৮.২৮	৬১.৬৫
৩	হবিগঞ্জ	২৪,০৩৫.৪১	২১.৪৬
৪	চট্টগ্রাম	৭,৬১০.৪৩	৬.৮০
৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৫০.৪২	০.১৩
৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৬৮.০০	০.০৬
	মোট	১,১২,০০৯.৬১	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

আমাদের দেশের বাগানগুলো ছোট বড় বিভিন্ন আয়তনের। কোন কোন বাগান একেবারে ছোট এবং কোনটি বেশ বড়।

আমাদের দেশের চা বাগানগুলো আয়তনের পরিমাণ নিম্নে তালিকায় দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৬

বাংলাদেশের চা বাগানের আয়তন (নার্সারী বাদে)

(১৯৮৪ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

বাগানের আয়তন (একর)	বাগানের সংখ্যা		
	বিদেশী মালিকানা কোং	বাংলাদেশী ব্যক্তি মালিকানা কোং	মোট বাগান
১ হতে ১০০ একর	—	১৫	১৫
১০১ ,, ২০০ ,,	—	১৮	১৮
২০১ ,, ৩০০ ,,	—	১৫	১৫
৩০১ ,, ৫০০ ,,	—	২৮	২৮
৫০১ ,, ৭০০ ,,	১	১৫	১৬
৭০১ ,, ১,০০০ ,,	৩	১৯	২২
১০০১ ,, ১,৫০০ ,,	৯	১৩	২২
১৫০১ ,, ২,০০০ ,,	৬	৪	১০
২,০০১ ,, ২,৫০০ ,,	৪	—	৪
২,৫০১ ,, ৩,০০০ ,,	—	১	১
৩,০০১ ,, ৩,৫০০ ,,	৩	—	৩
মোট	২৬	১২৮	১৫৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

বাংলাদেশ পৃথিবীর মোট চা উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ উৎপাদন করে। তবে আমাদের দেশে প্রতি বছর চায়ের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে একর প্রতি চায়ের উৎপাদন খুবই কম। ভারতের তুলনায়ও আমাদের দেশে প্রতি একরে চা উৎপাদনের পরিমাণ কম। আমাদের দেশে ১৯৭৯–৮০ সালে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯.৭৩ মিলিয়ন কেজি। ১৯৮৪–৮৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪২.৯০ মিলিয়ন কেজিতে।

আমাদের দেশে ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত চা চাষাধীন এলাকা, উৎপাদন এবং একর প্রতি ফলনের একটি তালিকা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ৭

বাংলাদেশে চা চাষ ও উৎপাদন

বছর	চাষাধীন এলাকা (০০০ একর)	উৎপাদন (মিঃ পাউণ্ড)	একর প্রতিফলন (মণে)
১৯৭৫-৭৬	১০৩	৬৭.৮৪	৭.৪২
১৯৭৬-৭৭	১০৭	৭৮.২৯	৮.৭৬
১৯৭৭-৭৮	১০৬	৭৯.৮৫	৮.০৭
১৯৭৮-৭৯	১০৭	৭৯.৪৩	৯.৫২
১৯৭৯-৮০	১০৭	৮৪.২২	৭.৫৬
১৯৮০-৮১	১০৮	৯২.১০	৯.৫৬
১৯৮১-৮২	১১২	৮৫.৪৮	৯.৩১
১৯৮২-৮৩	১১০	৯৪.২৫	৯.২১
১৯৮৩-৮৪	১১০	৯৩.৯৩	৯.৭২
১৯৮৪-৮৫	১০০	৮৩.০৫	৯.৪২
১৯৮৫-৮৬	১১০	৭৭.৮০	৯.৯২
১৯৮৬-৮৭ [আনুমানিক]	১১০	৮২.৪৮	৮.৪৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৮৬-৮৭

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের চা উৎপাদিত হয়ে থাকে। যেমন পাতা চা, ডাস্ট চা এবং সবুজ চা। এই সমস্ত চাগুলোর মধ্যে পাতা চা আমাদের দেশে বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ১৯৮২-৮৩ সালে পাতা চা উৎপাদিত হয়েছিল ৬২২৯ মিলিয়ন পাউণ্ড, ডাস্ট চা উৎপাদিত হয়েছিল ৩২.৩৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ঐ একই বছরে সবুজ চা উৎপাদিত হয়েছিল ০.৫৯ মিলিয়ন পাউণ্ড। আমাদের দেশে বিভিন্ন বাগানে একর প্রতি চায়ের উৎপাদন বিভিন্ন

পরিমাণে হয়ে থাকে। যেমন কোন কোন জমিতে একর প্রতি উৎপাদন ৮১২ পাঃ হয়ে থাকে এবং সর্বনিম্ন একর প্রতি উৎপাদন ১২০ পাঃ হয়ে থাকে। বাগানের গুণ ও মানের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকার কারণেই একর প্রতি উৎপাদনে তারতম্য হয়ে থাকে। আবার একই বাগানে বছরের বিভিন্ন সময়ে চায়ের উৎপাদনে তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন মাসে চায়ের উৎপাদন বেশি হয় এবং আবার কোন কোন সময়ে চায়ের উৎপাদন কম হয়। সাধারণত আমাদের দেশে, এপ্রিল মে ও ডিসেম্বর মাসে চায়ের উৎপাদন কম হয়। আবার জুন মাস হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত চায়ের উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে। জানুঃ, ফেব্রুঃ ও মার্চ মাসে সাধারণত আমাদের দেশে চা উৎপাদন হয় না। বাংলাদেশে মাসিক কয়েক বছরের মোট চা উৎপাদনের পরিমাণ তালিকা ৮–এ দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ৮
বাংলাদেশে চা উৎপাদন (মাসিক ভিত্তিতে)

(কে জি)

মাস	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮১	১৯৮৪	১৯৮৫
এপ্রিল	৩৮৬৪৭২২	৪৪১৭৫৮১	২৯৪৬৮২৫	৪৩৪৫১৬০	২০৪০৯৭৩	৪১৩৫৭১৭
মে	৩৭৪৬২২৯	৪৩৭৮৮৭৪	৩১৭৫৯৫১	৩৩১২৭৭১	২৮৯৫৬৮০	৪৬১২৯২৪
জুন	৪৬২৪৫৯১	৫৩০৫০৯৮	৫২০৬৯৩৭	৫৫৯২০৫৭	৪০৩৭৮৯৯	৪৯১২৮৫৬
জুলাই	৬০০৬৬৩৭	৬১১২৫৪৫	৫৫৪৫৯৮৪	৬১০৩৮২৪	৬০৩৮০৭৬	৬৪৯১৪৬৭
আগস্ট	৫৯৩৭০৮৫	৫৯১৯৮৯৭	৬১১১৬৬৩	৬০৩৭২২০	৫৭৫৫৬২২	৫৮৫৭০৭০
সেপ্টেম্বর	৫১৯৫৮৬৪	৫৬৪৪০১২	৫৮৬০৭৩৪	৬১৩৯৯৭১	৫৪৯৪৯৭৩	৬৩৬৪৩৮৮
অক্টোবর	৫০৭৪৫১৭	৪৮৫৮৬০৩	৫২৭৫৯৮৬	৫৫৯৮৯৭৫	৫৩০৪২৪৬	৫০৮১৬৭৬
নভেম্বর	৩৬৯৭৫৮১	৩২৭৮৩৬৩	৪৭৬০৩১৫	৪৪৮৩৩৪১	৪৪৭৪৫৫৫	৪০৯৬৪৯৪
ডিসেম্বর	১৮৯০১৯৭	১৩৯৮৯৮৯	২০১৩৯৪৪	২১১৫৮৫৯	২১৬৯১৭৭	১৭২৬৫৮৮
মোট	৪০০৩৭৪২২	৪১৩১৫৯৬২	৪০৯৩৮৩৩৯	৪৩৭২৯১৭৮	৩৮২১১২০১	৪৩২৮৫১৮০

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে চা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। ফলে চায়ের মান বিভিন্ন ধরনের হয়। আমাদের দেশে সাধারণত চায়ের মান খুব উন্নত নয়, তথাপিও দেশের ভিতরে এবং বাইরে জাতীয় রুচি ও বিভিন্ন পছন্দের কারণে সকল প্রকার চায়েরই যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই চাহিদা থাকার ফলে উৎপাদন ও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৮৫ সালে আমাদের দেশে জেলা ভিত্তিক চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ, তালিকা ৯–এর মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

তালিকা –৯

বাংলাদেশে চা উৎপাদন (জেলা ভিত্তিক)

জেলা	উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)	উৎপাদনের শতকরা হার
সিলেট	৩,৭৩৩,১২৮	৮.৬২
মৌলভীবাজার	২৭,৫১৪,৪৩৪	৬৩.৫৭
হবিগঞ্জ	১০,২১৩,৮৪৮	২৩.৬০
চট্টগ্রাম	১,৮২০,৫১৫	৪.২১
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩,২৫৫	—
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	—	—
মোট	৪৩,২৮৫,১৮০	১০০.০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

চায়ের গ্রেডিং

চা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পর্যায়িতকরণের প্রয়োজন খুব বেশি। চা বাজারজাতকরণের পূর্বে তাদের মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। চায়ের বিভিন্ন মান, গুণ, বৈশিষ্ট্য, গন্ধ, রং অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে বাজারজাত করা হয়। তাছাড়া চা প্রস্তুতপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে চা কে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশের চা বিদেশে রপ্তানি করা হয় সেহেতু চায়ের পর্যায়িতকরণ অপরিহার্য। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের চা উৎপাদন হয়ে থাকে। এমন কি একই বাগানের চা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোন সময় উৎকৃষ্টমানের চা উৎপন্ন হয়। আবার কোন সময় নিকৃষ্টমানের চা উৎপাদিত হয়। এই তারতম্য বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। তার মধ্যে সাধারণত মৃত্তিকাবস্থা, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সূর্যকিরণের প্রখরতা, আর্দ্রতা এবং অন্যান্য পরিবেশজনিত কারণে আমাদের দেশের চায়ের গুণাগুণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই তারতম্যের কারণে চায়ের বাজারজাতকরণের পূর্বে পর্যায়িতকরণ করতে হয়। চায়ের গ্রেডিং সাধারণত চা পাতা এবং উৎপাদনের প্রকৃতি অনুযায়ী

করা হয়। তাছাড়া পাতা প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বিভিন্ন বাগানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন বাগানের চায়ের গুণাগুণের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। চা পর্যায়িত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রেড আছে। যেহেতু বাংলাদেশ বিদেশে চা রপ্তানি করে, সেহেতু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক গ্রেডগুলো অনুসরণ করে থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত নিম্নলিখিত গ্রেডগুলো অনুসরণ করে থাকে।

তালিকা – ১০

চা-এর গ্রেড

এফ. ও. পি.	ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ পিকো।
ও. পি.	অরেঞ্জ পিকো।
এফ. বি. ও. পি.	ফ্লাওয়ারী ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো।
বি. ও. পি.	ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো।
বি. পি.	ব্রোকেন পিকো।
বি. পি. এস.	ব্রোকেন পিকো সাউচং।
এফ. ও. এফ.	ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ ফেনিংস।
ও. এফ.	অরেঞ্জ ফেনিংস।
পি. এফ.	পিকো ফেনিংস।
পি. ডি.	পিকো ডাস্ট।
ফেনিংস	
ডাস্ট	
এল. ডি.	লীফি ডাস্ট।
এস. ডি.	স্মল ডাস্ট।
লেগ কাট ফেনিংস	
সি. টি. সি. ফেনিংস	
এফ. এন. জি. এস	
ও. এফ. এল.	
আর. ডি	
ডাস্ট (এস. পি. এল)	
সি. এইচ. ইউ. আর.	

উৎস : বাংলাদেশ টি ব্রোকার্স লিমিটেড

চা মিশ্রণ ও আভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশে প্রধাণত দুই ভাবে চা বাজারজাত করা যায়। প্রথমত বাগানের মালিকগণ বা দালালরা খোলা চা পাতা ডিলার কিংবা পাইকারদের নিকট সরাসরি বিক্রয় করে। ডিলার বা পাইকাররা খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। আর খুচরা ব্যবসায়ীরা ভোক্তাদের নিকট অল্প অল্প পরিমাণে বিক্রয় করে থাকে। দ্বিতীয়ত চা উৎপাদনকারী কিংবা মালিক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার চায়ের পাতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একত্রে মিশ্রিত করে বিভিন্ন গুণ বা মান অনুযায়ী চা তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করে থাকে। তা ছাড়া কতিপয় মিশ্রণ প্রতিষ্ঠান চা মিশ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পূর্বে ৫টি মিশ্রণ কোম্পানী ছিল। এগুলো হলোঃ

মেসার্স ব্রুক বণ্ড, মেসার্স লিপটন, আদম লিঃ, এ্যারোমা কোং লিঃ, ইস্পাহানী লিঃ

এ জাতীয় মিশ্রণ কোম্পানীগুলো বিভিন্ন প্রকার চায়ের পাতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মিশ্রিত করে বিভিন্ন গুণের ও মানের চা তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করে। যেমন ইস্পাহানী চা, লিপটন চা ইত্যাদি। অর্থাৎ এই জাতীয় মিশ্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার ব্রাণ্ডের চা তৈরি করে বাজারজাত করে। বর্তমানে এই জাতীয় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন এলিট কোং লিঃ, রাজ লিঃ, বাংলাদেশ টি এক্সপোর্ট কোং ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন প্রকার চায়ের পাতাকে মিশ্রিত করে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাত করে থাকে। প্রত্যেকটি কোম্পানীর নিজস্ব কয়েকটি ব্র্যাণ্ড আছে। তারা বিভিন্ন উপায়ে চায়ের গুণাগুণ বা মান বৃদ্ধি করে বাজারজাত করে থাকে।

বাংলাদেশে চা বাজারজাতকরণের ধরন

চা সাধরণত বিবিধ উপায়ে বাজারজাত করা যায়। তবে বাংলাদেশে ত্রিবিধ উপায়ে চা বাজারজাত করা হয়।

(ক) বাগান মালিকগণ কর্তৃক স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট চা বাগান থেকে সরাসরি বিক্রয়।

(খ) চট্টগ্রামে নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় এবং

(গ) লণ্ডন নিলাম বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি লণ্ডন প্রেরণ।

বাংলাদেশের চা বাগানের মালিকগণ অনেক সময় নিজেদের বাগান থেকে চা পাতা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে। তারা সাধারণত চা পাতাগুলো খোলা অবস্থায় বিক্রি করে। বর্তমানে বাংলাদেশের চা

বাগানসমূহকে তাদের বাৎসরিক উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট কোটা চা এর ডিলার ক্রেতাদের নিকট সরাসরি বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই তারা নির্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী তাদের উৎপাদিত চা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

চা বাজারজাতকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো নিলাম কেন্দ্রের মাধ্যমে চা বিক্রয়। বাগানগুলোর উৎপাদিত চায়ের বেশিরভাগই চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এই নিলাম বাজার সরকার নিয়োজিত দালালদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ চা ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই কাজ সম্পন্ন হয়। আবার বাংলাদেশ চা বোর্ড এতে সহায়তা করে থাকে। চা এস্টেটসমূহ কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ পণ্যাগারে প্রেরিত চা দালালরা গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন গ্রেডের চা এর ওজন ও বাক্সের সংখ্যা উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বাক্সসমূহ ওজন করা হয় এবং পণ্যাগার রেজিস্টারে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। দালালরা বিভিন্ন বাক্স পরীক্ষা করে দেখে। পরবর্তী পর্যায়ে নমুনা দেয়া হয় এবং নমুনা পরীক্ষা করার পর তা তালিকায় উল্লেখ করা হয়। তখন নিবন্ধনকৃত নিলাম ডাককারীদের মধ্যে উক্ত তালিকা বণ্টন করা হয়। এই নমুনার উপর ভিত্তি করেই নিলাম কার্য সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশে নিলাম সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

প্রডিউস ব্রোকার্স লিমিটেড।
ন্যাশনাল ব্রোকার্স লিমিটেড।
ইউনিটি ব্রোকার্স লিমিটেড।
বাংলাদেশ টি ব্রোকার্স লিমিটেড।
পূর্ব বাংলা ব্রোকার্স লিমিটেড।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে চা এর প্রথম নিলাম অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে ১৯৪৯ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে। সাধারণত বিক্রয় মৌসুমে প্রতি সাত দিনে একবার নিলাম ডাকা হয়। নিলাম সাধারণত প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল বার ডাকা হয়। নিলামে বিক্রিত চা এর মূল্য নগদ পরিশোধ করতে হয়।

চট্টগ্রামে সাধারণত দুই প্রকার নিলাম অনুষ্ঠিত হয়।

আভ্যন্তরীণ নিলাম।
রপ্তানি নিলাম।

আভ্যন্তরীণ নিলামে সাধারণত বিভিন্ন পাইকাররা অংশগ্রহণ করে। আর রপ্তানি নিলামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। তার কয়েকটির নাম দেয়া হলো ঃ

এ. কবীর লিমিটেড।
আমীন এক্সপোর্ট লিমিটেড।
বাংলাদেশ এ্যারোমা টি কোং লিঃ
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোং লিঃ
বাংলাদেশ টি এক্সপোর্ট কোং
সাউথ ইস্ট ট্রেডিং লিমিটেড।
এম, এম ইস্পাহানী লিমিটেড ইত্যাদি।

এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। যারা বিদেশে চা রপ্তানি করে থাকে।

আগে প্রক্রিয়াজাত ও মিশ্রিত চা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে লণ্ডনে নিলাম বাজারে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে লণ্ডন নিলাম কেন্দ্রে চা প্রেরণ বন্ধ করা হয়েছে।

চায়ের আভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চা ভোগ করা হয়ে থাকে। ফলে চায়ের আভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে কয়েক বৎসরের চা ভোগের পরিমাণ নিম্নের তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

তালিকা - ১১
আভ্যন্তরীণ বাজারে চা ভোগের পরিমাণ

সাল	ভোগের পরিমাণ (মেট্রিক টন)
১৯৭৪	৬৯৬৫
১৯৭৫	৮০১৭
১৯৭৬	৮০০০
১৯৭৭	৮০০০
১৯৭৮	৮৫০০
১৯৭৯	৮৫০০
১৯৮০	৮৫০০
১৯৮১	৯০০০
১৯৮২	৯০০০
১৯৮৩	৯০০০
১৯৮৪	৯০০০
১৯৮৫	৯০০০

উৎস ঃ বাংলাদেশীয় চা সংসদ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৬

প্যাকিং ঃ চা বাজারজাতকরণের পূর্বে প্যাকিং করা অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া আর্দ্র আবহাওয়ায় চা নষ্ট হয়ে যায় বিধায় চা মোড়কজাত করা হয়। আবার চা পরিবহণ ও সংরক্ষণের সময় যাতে চায়ের মান ঠিক থাকে সে জন্য প্যাকিং–এর ব্যবস্থা করতে হয়। চায়ের প্যাকিং–এর জন্য সাধারণত কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয়। কাঠের বাক্সের ভিতরে বিশেষ এক ধরনের পাতলা কাগজ ব্যবহার করা হয়। কাঠের বাক্স বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কাঠের বাক্সের উপরে বিশেষ এক ধরনের লোহার পাত ব্যবহার করা হয়। যাতে বাক্স নড়াচড়াতে কোন রকমের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। তার পর বাক্সের উপরে কোম্পানীর নাম, গ্রেড, ওজন ইত্যাদি লিখা থাকে। চায়ের প্যাকিং সঠিকভাবে করা না হলে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তা বাজারজাত করা যায় না।

পরিবহণ ঃ আমাদের দেশে চা উৎপাদন করার পর সাধারণত ট্রাকে, রেলওয়ে বা নৌযোগে চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আমাদের দেশের পাইকাররা এই নিলাম কেন্দ্র হতে সাধারণত ট্রাক–এর মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। তারপর খুচরা কারবারীরা পাইকারের দোকান হতে ট্রাক, লঞ্চ, ঠেলাগাড়ি, রিক্সার মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়।

গুদামজাতকরণ ঃ প্রথমে চা উৎপাদনের পর বাগানের মালিকগণ নিলাম কেন্দ্রে না পাঠানো পর্যন্ত গুদামজাত করতে হয়। তারপর চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রের গুদামে পাঠানো হয়। ঐখান থেকে নিলামের মাধ্যবে পাইকাররা চা ক্রয় করে পরিবহণের মাধ্যমে নিজস্ব বা ভাড়া করা গুদামে মওজুদ করে। খুচরাকারবারীরা পাইকারের নিকট থেকে ক্রয় করে নিজস্ব গুদামে বা দোকানে মওজুদ করে রাখে।

মূল্য ঃ আমাদের দেশে চায়ের মূল্য বেশি উঠানামা করে। ১২ নং তালিকায় গত কয়েক বৎসরের চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রের মূল্য দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১২

বাংলাদেশের চা এর মূল্য
(আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে)

সাল	মোট বিক্রয় (কেজি)	গড় মূল্য (কেজি প্রতি)	
১৯৭৩–৭৪	২০,৯৬৭৬০৪	৪.৬৭	টাকা
১৯৭৪–৭৫	২৮২৯৫০০৬	৭.১৭	"
১৯৭৫–৭৬	২৫০৬৫৫০২	৯.২৬	"
১৯৭৬–৭৭	৩০৫৯৫৯৬৬	১৭.০২	"
১৯৭৭–৭৮	৩৩২৫১০৭৮	১৮.৮১	"
১৯৭৮–৭৯	৩৪০৩২৬৫৫	১৮.৭৮	"
১৯৭৯–৮০	৩২০৬৬৫১৯	১৬.৪৭	"
১৯৮০–৮১	৩৫৮৫১৩৮৬	১৭.৯০	"
১৯৮১–৮২	৩৫৯০৯৮০৬	১৯.৬৯	"
১৯৮২–৮৩	৩৫৬৬৮৫০৭	৩২.৫০	"
১৯৮৩–৮৪	৩৮২৭৪৬০৪	৫০.০৩	"
১৯৮৪–৮৫	৩৩৬৩৫৭১৫	৫৩.০৪	"
১৯৮৫–৮৬	৩৮৩৬২৩০২	২৭.৩২	"

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

এই নিলাম ডাকার পর পাইকারদের অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে বর্তমানে কেজি প্রতি ৫.০০ টাকা সরকারী কর দিতে হয়।

আমাদের দেশে পাইকারেরা নিলামের পর খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। তারা বিভিন্ন বাগানের চা বিভিন্ন দামে বিক্রয় করে। বর্তমানে প্রতি কেজি গড়ে ৬৫.০০ টাকা ধরে বিক্রয় করে।

বর্তমানে কয়েকটি বাগানের বিভিন্ন গ্রেডের পাইকারী চায়ের মূল্য দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১৩

দেশের বাজারে চায়ের পাইকারী মূল্য

বাগানের নাম	গ্রেড	মূল্য (প্রতি কেজি)	
খাদিম	পিডি	৬৩.০০	টাকা
সাতগাঁও	আর, ডি	৭০.০০	"
জগদিসপুর	আর, ডি	৬৫.০০	"
করিমপুর	পি, ডি	৬৪.০০	"
মির্জাপুর	বি, ও, পি	৬৮.০০	"
চণ্ডিসরা	বি, ও, পি	৬৭.০০	"
সাধন	ও, এফ	৫৬.০০	"
চাঁনবাগ	এফ, পি	৬৫.০০	"
মনিপুরা	এফ, পি	৬৫.০০	"

সূত্র ঃ হিল টপ টি হাউজ

আভ্যন্তরীণ বণ্টন প্রণালী ঃ চা উৎপাদনের পর মালিকগণ নিলাম কেন্দ্রে পাঠায়। এখান থেকে পাইকারেরা ক্রয় করে থাকে। তারপর পাইকারের নিকট থেকে খুচরা কারবারীর নিকট বিক্রয় করে। খুচরা কারবারীরা মুদির দোকান ও ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। খুচরা কারবারীরা গড়ে কেজি প্রতি ৮০.০০ টাকা ধরে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে।

চায়ের আন্তর্জাতিক বাজার

বাংলাদেশ পৃথিবীর মোট রপ্তানির প্রায় ৩ ভাগ চা রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালে ৩০,০০০ মেট্রিক টন চা বিদেশে রপ্তানি করেছে। যা পৃথিবীর ৮ম রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে নিম্নলিখিত দেশগুলো চা সংগ্রহ করে থাকে। পাকিস্তান, মিশর, ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়, পোলাণ্ড, পশ্চিম র্জামানী, নিউজিল্যাণ্ড, ইরান, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশসমূহ। ১৪ নং তালিকায় বাংলাদেশ থেকে চা রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানি আয় ও কেজি প্রতি রপ্তানি মূল্য দেখানো হলো।

তালিকা – ১৪

চা-এর রপ্তানি আয়

বর্ণনা	৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭ আনুমানিক
রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন কেজি)	২৩.৮৮	২৯.৭৯	৩১.৩২	৩০.৮১	৩০.৭৮	২৫.৮৫	২৯.৮২	২৩.৪৯
মোট রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)	৫১.০০	৬৬.৪৮	৭৬.০৩	১০৯.৬৪	১৬৯.০৯	১৫৭.৭৩	৯৭.৩১	১০২.০০
প্রতি কেজি চায়ের গড় (রপ্তানি মূল্য টাকায়)	২১.৩৬	২২.৩২	২৪.২৮	৩৫.৫৯	৫৫.০১	৬১.০২	৩২.৬৩	৪৩.৪২

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

বাংলাদেশ প্রতি মাসেই কিছু না কিছু চা রপ্তানি করে থাকে। ১৫ নং তালিকায় মাসিক ভিত্তিতে চা রপ্তানির পরিমাণ এবং মূল্য দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১৫

চা রপ্তানী (মাসিক ভিত্তিতে)

মাস	রপ্তানি ১৯৮৪-৮৫		রপ্তানি ১৯৮৫-৮৬		রপ্তানি ১৯৮৬-৮৭	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
জুলাই	২৪৯	১৫৩৩২	৬২৬	২৪৭৩৮	৭১৭	২৮৯৫০
আগস্ট	১৬৯৭	১০৪৩৮৩	২৪০২	৭৮০৩৫	২৩০৮	১০২১৪৪
সেপ্টেম্বর	১৩৫৮	৮২৫১৮	২১৬০	৭৮৫৮৪	১৮০৭	৮৫৫৮৪
অক্টোবর	২৪১১	১৬৩৭০৩	৩২৪৭	১৩০৩৫৩	২৬৬৫	১১৭৩২৪
নভেম্বর	৫২৯৫	৩৫১০৯৯	৫০৪২	১৫৩৩৯৮	২৭৪৬	১১৩৭৭৪
ডিসেম্বর	১৩৮৬	৯৩৯৮৫	৩৩৩৫	১১১৭৪৫	৪৪২২	১৯৪১০৪
জানুয়ারী	৪৫১৫	২৮০২৮৩	৩৮৪৭	১০৪৭০২	২২০৫	৮৯২৩৬
ফেব্রুয়ারী	৯২৫	৬০৪৪৭	২৬৯৭	৯৯৪৭৯	১৩২৫	৬১৩২০
মার্চ	৩৪৬২	২০৫৩২৪	২৬৫৯	৮১১০১	১৫৯৯	৫৯২৬৮
এপ্রিল	১০০৯	৫৭৪২৬	২৮৫৫	৮৩৩৯২	৮৪৩	২৬৬০৩
মে	১৪৭৭	৬২১৩২	৫১৬	১১৬৯৩	৪৯৯	২১১৪২
জুন	২০৬৩	৮৩০৫১	৪৩৬	১৫৮৮০	৬৩	১৮৬৮
মোট	২৫৮৪৭	১৫,৬০,৬৮৩	২৯৮২২	৯,৭৩১০০	২১,৪০৯	৯০,১৩২১

উৎস : টি পলিসি ফর ১৯৮৭-৮৮।

বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত দেশ চা কিনে থাকে, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের চায়ের পরিমাণ, মূল্য এবং মোট রপ্তানির শতকরা হার ১৬ নং তালিকায় দেয়া হলো।

তালিকা – ১৬

বাংলাদেশের চায়ের বৈদেশিক ক্রেতা

দেশ	১৯৮৫-৮৬			১৯৮৬-৮৭		
	পরিমাণ	মূল্য	শতকরা হার	পরিমাণ	মূল্য	শতকরা হার
পাকিস্তান	১২৫৫৯	৩৪৩৮৫২	৪২.১১	৬৩৭৫	২৪৬১৮০	২৯.৭৮
মিসর	৪৪৮৭	১২০৪৭২	১৫.০৫	৩৩৪৪	১২৩৮৭৪	১৫.৬২
বৃটেন	২৯৬৫	১১৬৮৭২	৯.৯৪	৩৭৩৬	১৭৪৭৯৪	১৭.৪৫
আফগানিস্থান	১১৫৩	৫৪০৪১	৩.৮৭	৫১৩	২৫১৪১	২.৪০
রাশিয়া	২০০০	৮৭৩০৬	৬.৭১	২০০০	৯৫৬৩৫	৯.৩৭
পোলাণ্ড	১৬৯৭	৬২৯১	৫.৬৯	১২৪	৪৮৩২	০.৫৮
চেকোসলাভিয়া	৮৭	৩২৪১	০.২৯	৭২	৩০৭২	০.৩৪
পঃ জার্মানী	৪১৪	১৩০৮৯	১.৩৯	৩৭১	১৬৭৩৯	১.৭৩
বুলগেরিয়া	৬৬	৪১৫২	০.৩৩	৭৬	২৯১৩	০.৩৫
নিউজিল্যাণ্ড	৯	২৮৭	০.০৩	—	—	—
ইরান	৩৪০	১৫২৪০	১.১৪	৮৭৯	৩৮১৮০	৪.১১
সৌদি আরব	১৮৩	৪২৫১	০.৬০	৬১	৪০৪২	০.২৮
সিঙ্গাপুর	২৩	৮২০	০.০৮	১০৪৩	৪৩৬৩৭	৪.৮৭

উৎস : টি পলিসি ফর ১৯৮৭-৮৮

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

আমাদের দেশে অতীতে চা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা ও অসম বাজারের ফলে চা এর বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির পরিমাণ কম ছিল। চা উৎপাদনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উৎপাদন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন লণ্ডনে চা কেন্দ্র স্থাপন, চা রোপণ এবং পুনঃরোপণের মাধ্যমে পুনর্বাসন উৎপাদন কার্যক্রমের শনাক্তকরণ ইত্যাদির ফলে উৎপাদন

আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৯-৯০ সালে চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫২.১৬ মিলিয়ন কেজি ধরা হয়েছে। যা ১৯৮৪-৮৫ সালে ছিল ৪৩.৯১ মিলিয়ন কেজি। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পর ১৯৮৯-৯০ সালে চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৩৪ মিলিয়ন কেজি ধরা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে চা রপ্তানির মূল্য ১৫৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৯-৯০ সালে ১৯০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে।

তালিকা -১৭

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চায়ের উৎপাদন, মূল্য ও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা।

বর্ণনা	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৯-৯০
উৎপাদন	৪৩.৯১ (মিঃ কেজি)	৫২.১৬ (মিঃ কেজি)
রপ্তানি	২৫.৯ (মিঃ কেজি)	৩৪.০০ (মিঃ কেজি)
মূল্য	১৫৬ (কোটি টাকা)	১৯০ (কোটি টাকা)

উৎস ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

চা বাজারজাতকরণের সমস্যা

বাংলাদেশে চা বাজারজাতকরণে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত সমস্যার কারণে সুষ্ঠুভাবে চা বাজারজাতকরণ করা যায় না। যে সব কারণে বাজারজাতকরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহা নিম্নে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

১. অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদন হ্রাস

বাংলাদেশে চায়ের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হয়, যদিও চা চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। যদি কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই বেশি বা কম হয় তবে সেই বছর চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় যদি আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ স্থির থাকে তবে রপ্তানির পরিমাণ কমে যাবে, ফলে রপ্তানি আয় কমবে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণে প্রতিকূল সৃষ্টি হবে।

২. উৎপাদন খরচ

আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন খরচ খুব বেশি হয়। ফলে চা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এক বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে একর প্রতি চা উৎপাদনের খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি হওয়াতে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। কারণ উৎপাদন করচ বেশি হওয়াতে আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য প্রতিযোগীদের সাথে মূল্যের প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে চা বাজারজাতকরণের জন্য আমাদের দেশের সরকার প্রচুর ভর্তুকী দিতে হয়। কারণ আমাদের দেশের সরকার এই ভর্তুকীর মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের চায়ের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের বাজারজাতকরণের নানা প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে।

৩. অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা

চায়ের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হলো উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপস্থিতি। কিন্তু আমাদের দেশে অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য চায়ের বাজারজাতকরণের ব্যয় বেশি হয়। তাছাড়া চা উৎপাদন করার পর ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য যে ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন তা আমাদের দেশে খুবই কম। আমাদের দেশে সাধারণত চা পরিবহণের জন্য ট্রাক, রেলওয়ে, লঞ্চ, ঠেলা গাড়ি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে চা বাজারজাতকরণে অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা বিশেষ করে রেলওয়ের ওয়াগনের স্বল্পতা, অতিরিক্ত পরিবহণ ভাড়া, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে চা পাঠানো সম্ভব হয় না এই অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার কারণে। কারণ আমাদের দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। রাস্তা, ঘাট, পরিবহণের সংখ্যা খুবই কম থাকার কারণে সঠিক সময়ে চা বাজারজাত করা যায় না। ফলে পরিবহণ ব্যয় বেশি হয়।

৪. চা বাক্সের অপ্রতুল সরবরাহ

চা উৎপাদন করার পর আর্দ্র আবহাওয়া তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে সতর্কভাবে প্যাকিং করতে হয়। তাছারা ভাল প্যাকিং না হলে দূরদুরান্তে প্রেরণকালে চা এর গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। চট্টগ্রাম নিলাম বাজারে কিংবা বিদেশী বাজারে পাঠানোর পূর্বে ভালভাবে চা পাতা বিশেষ ধরনের নির্মিত কাঠের বাক্সে প্যাকিং করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় এমনভাবে প্যাকিং করা হয় যা চা বাজারজাতকরণে মোটেই উপযুক্ত নয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে চায়ের মান নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে সাধারণত পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে চা মোড়কজাত করা হয়। তাছাড়া অনেক সময় এই বাক্সে অভাবে সঠিক সময়ে প্যাকিং করা হয় না। আবার এই সমস্ত বাক্সের মূল্য অত্যধিক।

৫. গুদামঘরের অভাব

চা বাজারজাতকরণে গুদামঘর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ চা উৎপাদন করার পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত গুদামঘরে করে রাখতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গুদামের অভাবে চা করে রাখা যায় না। যদিও কিছু কিছু গুদাম আছে যা চা করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই গুদামঘর চা বাজারজাতকরণে একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত।

৬. গ্রেডিং-এর সমস্যা

বাংলাদেশে যে চা উৎপাদন হয় তার সঠিক গ্রেডিং করা হয় না। যা বাজারজাতকরণে একটি মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে যে চা উৎপন্ন হয় বাগান ভেদে এর মান তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। একই বাগানের চায়ের মান এক এক সময় ভিন্ন ধরনের হয়। ফলে সেই অনুযায়ী চায়ের মান নির্ধারণ করা খুবই কষ্ট সাধ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে তা আসলে সেই গ্রেডের নয়। আমাদের দেশে যারা গ্রেডিং করে তারা খুব একটা দক্ষ নয়। অনেক সময় চায়ের মান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। ফলে বাজারজাতকরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৭. মিশ্রণজনিত সমস্যা

চা বাজারজাত করার পূর্বে উপযুক্ত স্বাদ এবং গন্ধের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর চা পাতা মিশ্রণ করে নিতে হয়। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চা মিশ্রণ করা হয়। চা মিশ্রণের জন্য বাংলাদেশে যে ব্লেণ্ডার রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। এই অপর্যাপ্ততার জন্য বাংলাদেশের চা বাজারজাতকরণের আরেকটি অন্যতম সমস্যা। আমাদের দেশের মিশ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রকার পাতাকে মিশ্রিত করে যে চা তৈরি করে তা সঠিক মান বজায় থাকে না। এটাও বাজারজাতকরণের একটি সমস্যা।

৮. অস্থিতিশীল বাজার মূল্য

সকল কৃষিজ পণ্যের মতোই বাংলাদেশে চায়ের মূল্যও প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। ফলে ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীরা উভয় পক্ষই অসুবিধার সম্মখীন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারেও একই কারণে মূল্যর ওঠা নামা হয় বলে চায়ের বাজার যেমন অস্থিতিশীল তেমনি এই পণ্যের বাজারজাতকরণে মূল্য নিয়ন্ত্রণ খুব একটা কাজে দেয় না। তবে এতে ব্যবসায়ীরা কোন সময় যেমন অপ্রত্যাশিত লোকসান দেয় তেমনি আবার কখনো কখনো তারা আশাতীতভাবে লাভও করে থাকে।

চা বাজারজাতকরণের সমস্যা সমাধানের কতিপয় সুপারিশ

চা বাজারজাতকরণের বহুবিদ সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার কারণে আমাদের দেশে চা সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করা যায় না। এই সমস্ত সমস্যা থাকার ফলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে। কারণ বিদেশের বাজারে আমাদের চায়ের চাহিদা কমে যাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তাই এখন থেকে এই সমস্যাগুলো তাড়াতাড়ি সমাধা করা দরকার। যে সকল উপায়ে সমস্যা সমাধা করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. বাগানের উন্নয়ন

আমাদের চা বাগানগুলো বেশ পুরানো এবং গাছগুলো বেশ রুগ্ন অবস্থায় আছে। কাজেই আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন কম হয় এবং নিকৃষ্টমানের হয়। তাই এই বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করতে হবে।

চা বাগানের আয়তন বৃদ্ধি।

পুনঃ আবাদের প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

প্রয়োজনীয় সারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা ইত্যাদির মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২. উত্তম বিক্রয় পদ্ধতি

বিদেশে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজনে উত্তম বিক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশের চা নিম্নমানের জন্য বাজারজাতকরণে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ আমাদের দেশে অনুপযুক্ত মৃত্তিকার কারণে সুগন্ধযুক্ত চা উৎপাদন করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু তার জন্য বসে থাকলে চলবে না। আমাদের দেশের চায়ের সুগন্ধ না থাকলেও চমৎকার রং আছে। আর এই রং –এর জন্যই বিদেশীরা আমাদের চা পছন্দ করে। এই সুযোগটুকু পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য উত্তম বিক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ উত্তম বিক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমেই ক্রেতাদিগকে ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. প্যাকিং –এর উন্নয়ন

চায়ের জন্য যে ভাবে প্যাকিং করা হয় তা মোটেই আন্তর্জাতিকমানের নয়। অদক্ষভাবে মোড়কজাত করার ফলে অনেক সময় চা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া বাক্সের অভাবে সঠিক সময়ে

মোড়কজাত করা সম্ভব হয় না। এজন্যে সঠিক সময়ে চা মোড়কজাত করার জন্য বাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. গুদাম ব্যবস্থার উন্নয়ন

আমাদের দেশের গুদামগুলো বেশ পুরানো এবং মান্দাতার আমলের। অনেক সময় এই সমস্ত গুদামে মজুদ করার ফলে চায়ের মান নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বর্তমানে গুদামের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন -এর জন্য জোর দিতে হবে।

৫. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বাংলাদেশে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন অপরিহার্য। বিশেষ করে আমাদের দেশের চা বাগান এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা অপরিহার্য। কারণ আমাদের দেশে পরিবহণ যানের সংখ্যা খুবই কম। তাই ট্রাক, রেলওয়ের বগী, জাহাজ বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে যথাসময়ে পরিবহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে চা পৌছানো যায়। তাছাড়া আমাদের দেশের রাস্তা, ঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত করা দরকার। সারা বছর যাতে নদী পথে চলাচল করতে পারি সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৬. মূল্য স্থিতিশীলতা

চায়ের মূল্য স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে হবে। যাতে ঘন ঘন মূল্য উঠা-নামা না করে সেই দিকে জোর দিতে হবে।

৭. চা মিশ্রণ পদ্ধতি উন্নয়ন

চা বাজারজাতকরণের পূর্বে পাতা মিশ্রণ বা ব্লেনডিং করে নিতে হয়। বাংলাদেশে মিশ্রণ পদ্ধতি খুবই অনুন্নতমানের এই জন্য চা বাজারজাত করার জন্য মিশ্রণ পদ্ধতির উন্নয়নসাধন অপরিহার্য।

৮. সরকারী উদ্যোগে বিদেশে অধিক পরিমাণে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারকে চা শিল্পের জন্য সুষ্ঠুনীতি প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া চা বোর্ডকে বাজারজাতকরণের ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপরিউক্ত কৌশলগুলো অনুসরণ করলেই চা শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মৎস্য

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এ কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। মাছ শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের প্রত্যহ খাদ্য তালিকার অবিচ্ছেদ্য অংশই নয় বরং এটা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করে থাকে। যেহেতু মাছ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে সেহেতু মাছের দক্ষ বাজারজাতকরণ কার্য সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। উৎপাদন যতই হোক তা যদি সঠিকভাবে, সঠিক পরিমাণে, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা না হয় তবে প্রকৃত দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চার করার জন্য কৃষিজাত মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিপণন, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জলাধার মিলিয়ে মোট মৎস্য এলাকার পরিমাণ ৬,৪০,০০০ একর। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ১,১৪০ বর্গ মাইলেরও বেশি এলাকা। এইসব মৎস্য এলাকায় ২৫০ রকমের মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮০ লক্ষেরও বেশি লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছের উপর নির্ভরশীল। মাছের বাৎসরিক মোট উৎপাদন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টন ও মোট রফতানী আয় প্রায় ৩ কোটি টাকা। বর্তমান কৃষিখাত থেকে প্রাপ্ত জি. ডি. পি'র ৬ ভাগ আসছে মৎস্য সম্পদ থেকে।

বন্টন প্রণালী

মৎস্যের বন্টন প্রণালীতে তেমন কোন জটিলতা নেই। শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের বন্টন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কারণ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-কূয়া, হাওড়, বাধ, জলাশয় ইত্যাদি স্থান থেকে জেলেরা মাছ শিকার করার পর তাদের কাছাকাছি স্থানীয় হাট বা বাজারে বিক্রয় করে। ফলে গ্রামের ভোক্তারা জেলেদের কাছ থেকে সরাসরি মাছ ক্রয় করে। এখানে শূন্য লেভেল চ্যানেল ব্যবহৃত হয়ে বন্টন কার্য সমাধা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, জেলেরা পেশাদার মাছ বিক্রেতাদের নিকট সংগৃহীত মাছ বিক্রি করে দেয়। পরে ঐ পেশাদার মাছ বিক্রেতারা প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট পৌছায়। এখানে চ্যানেলের অবস্থা এক লেভেল। শহরাঞ্চলে মাছের বন্টন প্রণালীতে ৩ লেভেল চ্যানেল ব্যবহৃত হয়। যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো। বহু মধ্যস্থকারবারী মৎস্য বিপণনে নিয়োজিত রয়েছেন। সাধারণভাবে মহাজন, মালিক, আড়তদার মৎস্যের মূল উৎস ক্ষেত্রগুলো হতে বিভিন্নভাবে ৬০% মৎস্য সংগ্রহ করে এবং এ ছাড়াও ধীবরগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোগকারীদের নিকট প্রায় ৭% এবং খুচরা বিক্রয়কারীদের নিকট প্রায় ১২% বিক্রয় করে।

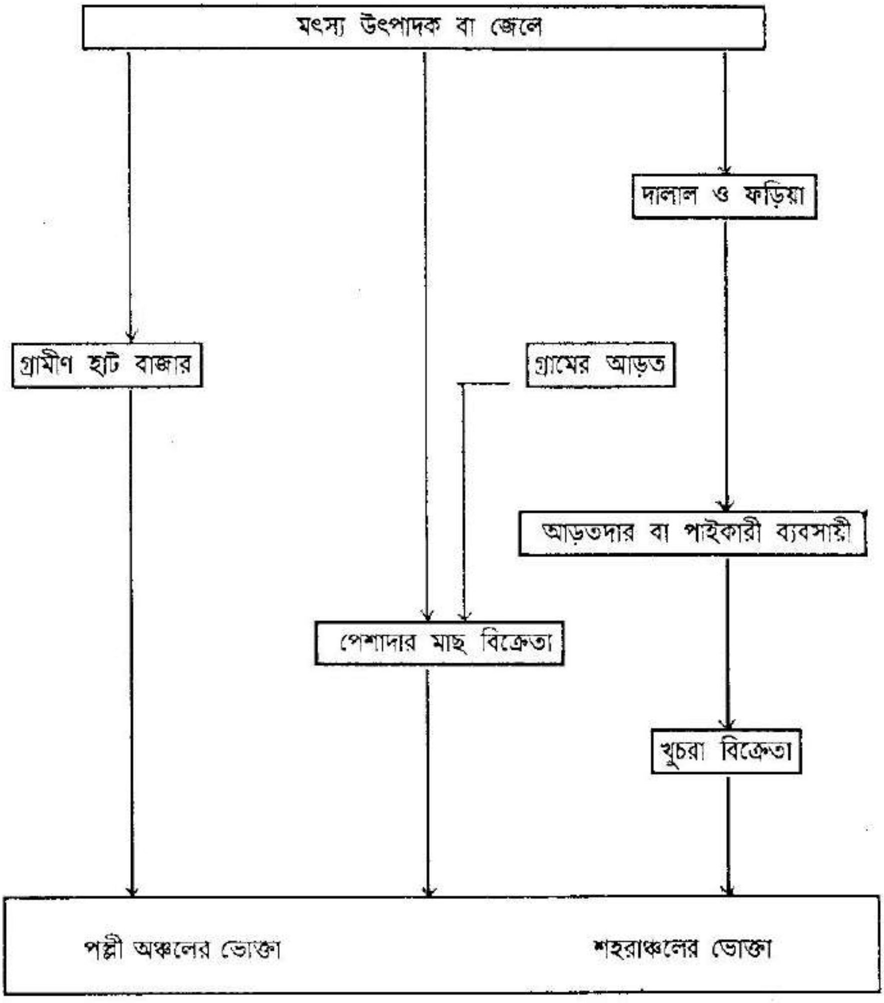

চিত্র ঃ ১ মৎস্যের বন্টনপ্রণালী

তাছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি. এফ. ডি. সি.) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে থাকে এবং কিছু মৎস্য আভ্যন্তরীণ মৎস্য সংগ্রহকারীদের নিকট হতেও ক্রয় করে থাকে। বি. এফ. ডি. সি. কর্তৃক ট্রলারে ধৃত মাছ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে সংরক্ষণ করা হয়। সেখান হতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয়। চট্টগ্রাম হতে ফিসভ্যান বা পরিবহণ ভ্যানের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প পাগলাতে পাঠানো হয়। পাগলা প্রকল্পে মাছ গুদামজাত করার পর সেটা খুচরা বিক্রয়ের জন্য কাওরান বাজার মৎস্য বিক্রয় উপকেন্দ্রের

মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্যান ও রিক্সা ভ্যানে (কমিশন ভিত্তিক) শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করা হয়। কাপ্তাই হ্রদ হতে প্রাপ্ত সরকারী ও বেসরকারী উৎস হতে সংগৃহীত মাছ ফিসভ্যান বা যন্ত্রচালিত নৌকার মাধ্যমে পাগলায় আনা হয় এবং সেখান হতে উল্লেখিত একই পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়।

২নং চিত্রের মাধ্যমে বি. এফ. ডি. সি'র মৎস্য বণ্টন পদ্ধতি দেখানো হলো ঃ

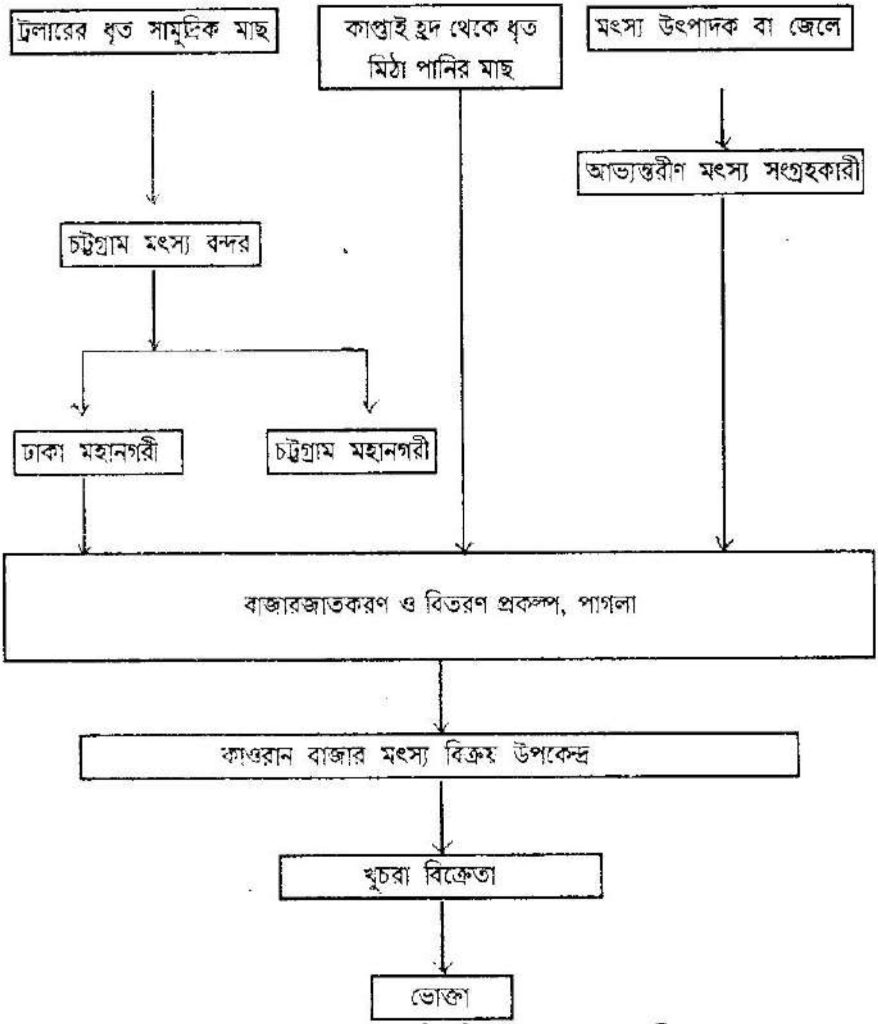

চিত্র নং –২ বি. এফ. ডি. সি.'র বৎস্য বন্টনপ্রণালী

এছাড়াও বাংলাদেশ মৎস্য সমবায় সমিতি নিজস্ব পরিচালনায় কিঞ্চিত পরিমাণে (প্রায় ২৫%) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে। সমবায় সমিতিসমূহ এবং সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন শুধু বিদেশের বাজারে মৎস্য বিক্রয় করে। বাংলাদেশে মৎস্য বাজারজাতকরণের প্রথম হতে শেষ পর্যায়ে মোট চার ধরনের বাজার পরিলক্ষিত হয়। যেমন, প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, হাইয়ার সেকেণ্ডারী এবং চূড়ান্ত মার্কেট। প্রতিষ্ঠানগত দিক দিয়ে মহাজন এবং পাইকাররা খুচরা বিক্রেতা ও অন্যান্যদের তুলনায় খুব বেশি ঝুঁকি বহন করে। তাছাড়া আড়তদারগণ বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। সামগ্রিক বিপণন কর্মকাণ্ডে এদের স্থান এবং ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারীভাবে কিছু ব্যবসায়ী ও প্রসেসিং ফার্ম হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য এবং শুটকী রপ্তানি করে। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যে মান থাকা উচিত সেই মান সর্বদা বজায় রাখতে পারছে না। এতে করে ব্যাপক চাহিদা থাকাসত্ত্বেও মাছ প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা হারাতে হচ্ছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ সরবরাহ এবং বৈদেশিক সরবরাহের দিকগুলোয় ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবদান রাখছে। লক্ষ্য করা যায় যে, আভ্যন্তরীণ সরবরাহের ক্ষেত্রে বা আভ্যন্তরীণ বন্টন প্রণালীতে মধ্যস্থ কারবারীগণ প্রায় সবটাই বাজারজাত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে সামান্য ভূমিকা থাকলেও সমবায় সমিতির কোন ভূমিকা নেই। বাজারজাতকরণের খরচের দিক বিবেচনা করলে মৎস্য সংস্থাকে বেসরকারী সংস্থাগুলোর তুলনায় আকাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন বলে ধরা যায় না। যদিও বর্তমানে এদের দক্ষতা কিঞ্চিত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে নজির পাওয়া যায়। তবে সামুদ্রিক মৎস্যকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের গুরুত্ব শুধু ব্যবসায়িক দিকই নয় সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে এর সেবামূলক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সরবরাহ ও মূল্য

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রলারে ধৃত মাছ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা মৎস্য অবতরণ ঘাটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোট উৎপাদিত মৎস্যের প্রায় ৯৫% বাজারে আসে বাকী ৫% উৎপাদকের ব্যবহারে আসে, চোরা পথে সীমান্তের ওপারে চলে যায় এবং কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় বা পচে যায়। বাজারে আনীত মৎস্যের মধ্যে ৮০% তাজা এবং ১৫% শুটকী ও লবণাক্ত। বাজারে সরবরাহকৃত মোট মৎস্যের প্রায় ৮৯% গ্রামাঞ্চলে, ১০% শহরে এবং ১% বৈদেশিক বাজারে স্থান পায়। গ্রামের চেয়ে শহরে মোট যোগানের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বলে কোন না কোন কারণে স্বাভাবিক সরবরাহ হঠাৎ হ্রাস পেলে বা বিঘ্নিত কিংবা বিলম্বিত হলে ঐ সব এলাকায় মৎস্যের মূল্য আনুপাতিক হারের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ হ্রাস পেয়েছে। এদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্যের চাহিদা বৃদ্ধি

পেয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে ভাল মাছের কথা দূরে থাক এক বেলা প্রতিদিন ছোট মাছও তাদের পক্ষে জোটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মূল্য তো উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছেই।

ঢাকার পাইকারী বাজারে প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের মাছ আসে। এসবের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, চিতল, কই, মাগুর, শৈল, বাইন, ফলি ইত্যাদি মিঠা পানির মাছ। এছাড়া মিঠা পানির কিছু বিদেশী জাতের মাছ যেমন তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ও তেলাপিয়া মোজাম্বিকা ইত্যাদি বাজারে আসে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ক্যাটফিস, জাটিনা, রূপচান্দা, ভেট্‌কী ইত্যাদিও বাজারে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ ইলিশ মাছ বাজারে আসে।

নিম্নে ঢাকার পাইকারী বাজারে সরবরাহকৃত মৎস্যের হিসাব দেখানো হলো (তালিকা-১)

তালিকা – ১
ঢাকার পাইকারী বাজারে মৎস্যের সরবরাহ

অর্থ বৎসর	পরিমাণ
১৯৭৭–৭৮	২১৬১ টন
১৯৭৮–৭৯	১৯১৩ টন
১৯৭৯–৮০	২৪৪৩ টন
১৯৮০–৮১	৩১০২ টন
১৯৮১–৮২	২৯৮১ টন
১৯৮২–৮৩	২৮৬১ টন
১৯৮৩–৮৪	৩১৬১ টন
১৯৮৪–৮৫	২৮১০ টন
১৯৮৫–৮৬	২৯০০ টন
১৯৮৬–৮৭	২৯২০ টন

উৎস ঃ সোয়ারীঘাট মৎস্যের আড়তদার সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত

তালিকা-১ এ ছকে দেখা যায় যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে মৎস্যের সরবরাহ ছিল ২১৬১ টন; কিন্তু তার পরের বৎসর মৎস্যের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়ে ১৯১৩ টনে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, ঐ বৎসর মৎস্যের সরবরাহ কম থাকার ফলে মূল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে পর পর দুবছর আবার মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে চাহিদার সাথে সরবরাহের মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যতা আসে। কিন্তু ১৯৮১-৮২ সালে আবার সরবরাহ হ্রাস পায় এবং পরবর্তী বৎসরগুলোতে সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শহরের গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছের চাহিদা মেটানোটা একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্তরা কিছু চাহিদা মেটালেও মাছ গরীব মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এছাড়াও মাছের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাছের গা-পচা রোগ দেখা দেয়। এবং সেই রোগের ফলে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এ কারণে শহরে মাছের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং মাংসের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। মাছের উপর চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে স্বভাবতই মাছের সরবরাহ কিছুটা কমে গেছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে, চাহিদা কমে গেলেও মাছের মূল্য সেই পূর্বের মতই রয়ে গেছে। কিন্তু মৎস্যজীবীরা সব সময়ই অভয় দিচ্ছে যে, গা-পচা রোগে আক্রান্ত কোন মাছই শহরে প্রবেশ করছে না।

তালিকা - ২: ঢাকার মৎস্যের (সোয়ারী ঘাট) পাইকারী বাজারে সরবরাহকৃত বিভিন্ন জাতের মৎস্যের মাসিক হিসাব

অর্থ বৎসর	মাসের নাম	বিভিন্ন জাতের মৎস্যের নাম ও পরিমাণ (মণ হিসাবে)											
		ইলিশ	চিংড়ি	মাগুর	শিং	কই	তেলাপিয়া	রুই	কাতলা	রূপচাঁদা	মৃগেল	পাঙ্গাস ও আইড়	অন্যান্য
১৯৯৪-৯৫	জুলাই	১,৫৬০	১,৪৪০	৫৯০	৬৫০	৩৪০	৪৫০	৮৮০	৪৩০	২৬০	৫৮০	১,১৮০	১,৩১০
	আগস্ট	১,৪১০	১,১৫০	৪৩০	৫৬০	২২০	৩৩০	৫৮০	৩৭০	১৮০	২২০	৮৮০	১,২২০
	সেপ্টেম্বর	২,১০৫	১,০৪০	৩০০	৪০০	২১০	৫১১	৪১০	২১০	১৭৫	১১০	৫৭৫	১,৫১০
	অক্টোবর	২,২০০	১,২০৮	২১০	৫১০	২০০	৪৭০	৩৮০	২৫০	২০৫	১৭৫	৫৬০	১,৩১৫
	নভেম্বর	১,৪৫০	১,১৬১	৩৭৫	৪৭৫	২৮০	৩৭০	৪৯০	১১০	২০০	১১০	৪৮০	২,০১০
	ডিসেম্বর	১,২১০	১,০৭৫	৪১০	৫৬০	৪১০	৩৭৫	৬১০	৫১০	২১০	২০৯	৪১০	২,০৫১
	জানুয়ারী	১,০১০	৯৫০	৫৫০	৬৭৫	৬২৫	৪১০	৭১০	৬৭৫	১১০	৩৭৫	৩১০	১,৭১০
	ফেব্রুয়ারী	৯২৫	৮১০	৬৭০	৭৭৫	৭১০	৪০৫	৯২৫	৭১৫	২০৫	৪১০	৪১৫	১,৬২০
	মার্চ	৮৭৫	৭৭০	৬৭৫	৮০০	৭৭৫	৩৭৫	১,০৫০	৬২৫	২১০	৪৭৫	২০০	১,৪৭৫
	এপ্রিল	৭৮০	৬৮০	৬১০	৭৭৫	৬৯০	৩৭০	১,০৭৫	৭৭৫	৩১০	৫৫০	৩১০	১,৫০৫
	মে	৮০০	৭৭৫	৫৭৫	২৫০	৪০৫	৪১০	৭৮০	৫৭৫	২০৫	৩২৫	৪১০	১,৬৭০
	জুন	৯৭৫	৮১০	৩১৫	৪২৫	৩৭৫	৪২৫	৫১০	৪০০	১৯০	১৯০	৫৫০	১,২৭৫
১৯৯৫-৯৬	জুলাই	১,০৬০	৮৮০	৪১০	৩৭৫	২৯০	২৭৫	৪১৫	২৭৫	১১০	১২৫	৬১০	১,৯৫০
	আগস্ট	১,৪২৫	৯১০	৪১৫	৩৫০	২১০	৩১৫	৪০৫	২১০	১৩০	১০৫	৬৭৫	১,২৮০
	সেপ্টেম্বর	৩,৫২৫	৮৭০	৪২৫	৪৫০	২৯০	৪১০	২১০	১৭৫	২০০	২১০	৭২৫	১,৪৫০
	অক্টোবর	৪,০১০	১,০৭৫	৩২০	৩২৫	১১০	৫০০	১৭৫	১৭৫	২২৫	৯০	৬১০	১,১২০
	নভেম্বর	১,০১০	৯৭০	৪১৫	৫৭৫	৬৭৫	২৭৫	১৫০	১২৫	১১০	১০০	২৫০	১,৩৪০
	ডিসেম্বর	৯৮০	৭৫০	৬৮০	৫৮০	৬৯০	২১০	২৫০	২২০	৯০	২১০	১৭০	১,৫৬০
	জানুয়ারী	৮৫০	৭৭৫	৬৭৫	৭২০	৮০৩	২১০	৩১০	৪৫০	২৫	৫০০	২০০	১,৬২০
	ফেব্রুয়ারী	৮১০	৮০৫	৬১০	৭৭৫	৬৯০	২৫০	৭৭৫	৫৭৫	১৭	৫১০	২৭৫	১,৩৭০
	মার্চ	৮৫০	৬১০	৬১৫	৬০৫	৮৭৫	২৭০	৮২৫	৭৭৫	২০	৫৭৫	২১০	১,৫২০

উৎসঃ সোয়ারী ঘাট মৎস্য আড়তদার সমবায় সমিতি হতে গৃহীত।

তালিকা-২ অনুযায়ী দেখা যায় যে, সোয়ারী ঘাটে প্রধানত ১১ রকমের মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে। এর মধ্যে ইলিশের সরবরাহ সবচেয়ে বেশি এবং ইলিশের পরই চিংড়ি মাছ। এরপর অন্যান্য যেমন—মাগুর, শিং, রুই, তেলাপিয়া, কই, কাতলা, রূপচান্দা, মৃগেল, পাঙ্গাস, আইড় ইত্যাদি মাছ সরবরাহ হয়। চার্টে দেখা যাচ্ছে যে, সেপ্টেম্বর মাসে ইলিশ এবং জুলাই মাসে চিংড়ি, পাঙ্গাস ও আইড় মাছের সরবরাহ খুব বেশি। কিন্তু মাগুর, কই, শিং ইত্যাদি মাছের সরবরাহ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে ইলিশ এবং চিংড়ি মাছের সরবরাহ সেপ্টেম্বর ও জুলাই মাসে কেন বেশি। কারণ ঐ মাসে বর্ষাকাল থাকে এবং এই মাছ বর্ষাকালে প্রচুর ধরা পড়ে। বিশেষত চিংড়ি মাছ বর্ষায় প্রচুর পাওয়া যায়। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা পরিবার তাদের আসেপাশে, ভাঙ্গা কালবার্ট বা পুলের নীচে, শুধুমাত্র চিংড়ি মাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনের ফাঁদ পাতে। গ্রামের ভাষায় এটাকে বইচনা বলা হয়। এই ফাঁদে প্রচুর পরিমাণ চিংড়ি প্রত্যেক দিন পাওয়া যায়। যেহেতু গ্রামের বেশির ভাগ লোকই গরীব সেহেতু তারা ঐ মাছ আসে পাশের মাছের আড়তে বিক্রয় করে দেয়। এ জন্যই সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

কই, শিং, মাগুর, রুই ইত্যাদি মাছ বর্ষাকালে খুব একটা পাওয়া যায় না। কারণ ঐ সমস্ত মাছ গ্রামের খোলা পুকুর, খাল ইত্যাদি জায়গায় নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে যখন বর্ষাকাল শেষ হয় তখন পানি শুকিয়ে যায় এবং মাছগুলো পুকুর, খাল ইত্যাদি জায়গায় আটকা পড়ে। পরে গ্রীষ্মের সময় জেলে দিয়ে পুকুরের মাছ ধরা হয় এবং বাজারে বিক্রয় করা হয়। ঐ সময় যে মাছ ধরানো হয় তার মধ্যে কই, শিং, মাগুর, পুটি, রুই এবং বিভিন্ন রকমের ছোট মাছ থাকে। তাই তালিকায় দেখা যায় যে, মার্চ মাসে এদের সরবরাহ বেশি। জুলাই মাসে ইলিশের সরবরাহ ১৫৬০ মণ এবং চিংড়ির সরবরাহ ১৪৪০ মণ। কিন্তু মার্চ মাসে ইলিশের সরবরাহ ৮৭৫ মণ এবং চিংড়ির সরবরাহ ৭৭০ মণ। দেখা যায় যে ইলিশের সরবরাহ ৬৮৫ মণ এবং চিংড়ির সরবরাহ ৬৭০ মণই কম। পক্ষান্তরে জুলাই মাসে মাগুর, শিং, কই মাছের সরবরাহ যথাক্রমে ৫৯০, ৬৫০ ও ৩৪০ মণ এবং মার্চ মাসে ৬৭০, ৭৭৫ ও ৭১০ মণ। দেখা যায় যে, মার্চ মাস থেকে জুলাই মাসে সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮০, ১২৫ ও ৩৭০ মণ। তেলাপিয়া, রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ সাধারণত পুকুরে চাষ করা হয়। তাই এই সমস্ত মাছের সরবরাহ খুব একটা তারতম্য থাকে না। তবে তালিকায় দেখা যায় যে, মার্চ, এপ্রিলে এদের সরবরাহ বেশি।

মার্চ, এপ্রিলে রুই মাছের সরবরাহ ১০৫০ ও ৬২৫ এবং কাতলা মাছের সরবরাহ ৬২৫ ও ৭৭৫। এখন বলা যায়, কেন সরবরাহ বেশি? কারণ বর্ষার মৌসুমে পুকুরে অনেক সময় বেশি পানি হলে ডুবে যায়। তাই মৎস্য চাষীরা বর্ষার পূর্বেই গ্রীষ্মকালে মাছ বেশিরভাগ ধরে ফেলে এবং বাজারে পাঠায়। ফলে ঐ সমস্ত মাসে সরবরাহ বেশি থাকে। এছাড়া অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের সরবরাহে প্রত্যেক মাসে তেমন একটা তারতম্য দেখা যায় না। তবে ১২ মাসের মধ্যে সবচেয়ে যে মাসে মাছের সরবরাহ বেশি সেই মাসটা হলো—অক্টোবর এবং সবচেয়ে কম হয় মার্চ মাসে।

তালিকা - ৩: ঢাকার মৎস্যের (সোয়ারী ঘাট) পাইকারী বাজারে সরবরাহকৃত ১৯৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের দৈনিক হিসাব

মৎস্যের নাম	তারিখ ও পরিমাণ (মণ হিসাবে)																													
	১লা	২রা	৩রা	৪ঠা	৫ই	৬ই	৭ই	৮ই	৯ই	১০ই	১১ই	১২ই	১৩ই	১৪ই	১৫ই	১৬ই	১৭ই	১৮ই	১৯শে	২০শে	২১শে	২২শে	২৩শে	২৪শে	২৫শে	২৬শে	২৭শে	২৮শে	২৯শে	৩০শে
ইলিশ	১২০	১৫১	১২৫	১২৫	১১৫	১১৭	১১০	১৩০	১২৭	১৪০	১৫১	১৪৫	১২৮	১৩০	১২০	১১৭	১১০	১৫০	১২০	১০২	১০৫	১৪০	১৫১	১৬১	১৭০	১৩৫	১২৭	১২০	১৫০	১৫৫
চিংড়ি	২২	২৫	২০	১৭	২৪	২৮	৩০	২২	২৪	২৭	২২	২৮	৩০	৩৫	২৫	২৮	২২	২০	২১	২৩	২৫	২৬	২৮	৩৫	২৬	২৭	৩১	৩৫	২১	২৩
মাগুর	১৫	১৪	১০	২০	২২	১৩	১৬	১৮	১০	১১	১৩	১৮	২০	১০	২২	১৪	৯	৫	৩	১১	১৮	১৬	২০	১৮	১৯	২২	১৯	২৪	১৭	২১
শিং	১৭	২২	১০	১৫	২১	১১	১৩	১২	১৭	১৯	২৭	২১	২০	২১	১৮	১০	১১	১২	৯	৮	১৫	১৭	১২	১০	১৮	১০	২১	২১	২০	২১
কই	৭	৫	২	৪	৫	৬	৭	৯	৬	৭	৫	৪	৩	২	৫	২	৭	৮	৯	৫	১০	১১	১০	৯	৮	৫	৪	৩	৭	৯
তেলাপিয়া	১৪	১৫	১০	১১	২১	২৫	১৭	১৭	১৮	২১	১৩	১৫	১৭	২১	২২	১৮	১২	১৭	১৪	৯	১৮	২৩	২৫	১৫	১০	১২	১৭	২২	২১	১৯
রুই কাতলা ও মৃগেল	১৬	১৯	২০	১৮	২২	২০	২১	১৭	১৬	১৮	১৫	২২	২৩	২৮	১৭	২১	২২	২৭	১৬	১৪	১৭	১৯	২২	২৪	১৬	১৯	১৮	১৫	১৪	১৯
পাঙ্গাস ও আইড়	২২	২৬	৩১	৩০	২৮	১৯	২২	১৫	২২	৩৫	২৮	২৭	২২	২৫	২২	২৭	২৯	২১	২০	২৫	২৬	২৪	২২	২০	১৫	১৭	২২	২০	২৭	২৮
সামুদ্রিক	৩১	২২	১৬	১৫	১৭	২৮	২২	১১	১৩	১৫	১৮	১৪	১৫	১২	২১	২০	২২	২৭	২৫	১৬	২০	২৬	২৯	২২	২৮	২০	১৫	২৬	২৭	৩৫
অন্যান্য	৫১	৫৬	৪০	৪২	৪৫	৫৫	৬১	৫৬	৫৮	৫৯	৬০	৫৭	৪৭	৫২	৬৮	৫৫	৫৩	৫১	৪১	৪৮	৪৪	৫২	৪৯	৫০	৫৭	৪৪	৪৭	৫৯	৫২	৪০

উৎসঃ সোয়ারীঘাট মৎস্য আড়তদার সমবায় সমিতি হতে গৃহীত

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘাটসমূহে ইলিশ মাছ অবতরণের একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

তালিকা – ৪

বিভিন্ন ঘাটে ইলিশ মাছের সরবরাহ

বৎসর	চাঁদপুর ঘাট	গোয়ালন্দ ঘাট	খুলনা	বরিশাল	ঢাকার পাইকারী বাজার	নারায়নগঞ্জের পাইকারী বাজার	চট্টগ্রাম	মোট
১৯৭২	১১,৭২৯	৯২১	২,০৯৫	৯,২১৬	—*	—	১০০	২৪,০৬১
১৯৭৩	১৩,৩৪১	১২,০১৪	৩,০৮৮	১০,৪৮২	—	—	২৩১	৩৯,১৫৬
১৯৭৪	১০,৪৭৪	২,৪৩৫	১,৯২৩	৮,২৩০	—	—	৪৮৩	২৩,৫৪২
১৯৭৫	১৬,০০৮	৩,৫৬৪	৩,৬৯৮	১২,৬৬৭	—	—	১,০৭৬	৩৭,০১৪
১৯৭৬	৫,০৭৭	২,৯৬০	১,৮১৪	৪,৬১১	১,৭৭২	৭০০	১,৫৫৩	১৮,৪৮৭
১৯৭৭	৪,৫৬৪	২,৪২৪	১,৪০৯	৩,৫৮২	২,৫১৭	৯৯৫	২,৫০০	১৭,৯৯৫
১৯৭৮	৭,৩৯৩	৩,৯৭৭	১,১৭৪	৫,১২০	৪,২৮৫	২,১১৮	৪,০০০	২৮,০৭২
১৯৭৯	৭,৪২৪	৩,২০৯	৬৮৯	৪,৪৮৬	৩,৭৭৯	১,৮৩৪	৫,১২৩	২৬,৫৪১
১৯৮০	৬,২৬৯	৩,১০১	৯০২	৫,৭১০	৬,৭০৫	২,৯৫২	৫,৭৮৩	৩১,৪৫৩
১৯৮১	৮,৬৩২	৪,৪২৬	১,০৪৯	৬,৮৪৪	১৪,১৯০	৬,১৭৭	৭,৪৮৫	৪৮৮০৬
১৯৮২	৯,৬০১	৫,৯৭৩	—	—	—	—	৯,৩৬৯	—
১৯৮৩	৯,৯২১	৪,৫২০	—	—	—	—	১৩,০৫২	—

* তথ্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র ঃ Melvin Investigation of the hilsa Fishary of Bangladesh, 1984

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ঢাকার পাগলায়, মংলা এবং অন্যান্য ল্যান্ডিং স্থলে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ঐ সব স্থান থেকে বিভিন্ন স্থানে মৎস্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ঢাকার পাগলায় এ জন্য একটি ফিস রিফ্রিজারেটর কমপ্লেক্স

স্থাপন করা হয়। এছাড়া রাজশাহীতে একটি সাব সেন্টার এবং উপকূলীয় মৎস্য চাষীদের সুবিধার্থে পাথর ঘাটা এবং খেপু পাড়ায় মৎস্য বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

বিপণন ব্যয় পদ্ধতি ও দক্ষতা

বাজার মূল্য, যোগানের স্বল্পতা, বিক্ষিপ্তভাবে মৎস্যের অবস্থান, নিম্ন ক্রয় ক্ষমতা, প্রযুক্তি বিক্রয়, তীব্র ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনা করলে বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবসায়ীদের দক্ষতা আশা করা যায় না। একটি গবেষণার রিপোর্টে দেখা গেছে যে, মৎস্যের মধ্যস্থকারবারী খুচরা মূল্যের ২৫% লাভ পেয়ে থাকে। তারা সে পরিশ্রম করে তাতে এ লাভ পরিশ্রমের তুলনায় অনেক কম। তাদের লাভের একটা বিরাট অংশ আড়তদারী সার্ভিস, পরিবহণ ও বরফজাতকরণে ব্যয় হয়। তাছাড়া ঝুঁকি গ্রহণ বাবদ বাজার, ব্যক্তিগত খরচ, খাজনা, চাঁদা ইত্যাদি ব্যয় হয়। অর্থাৎ তাদের মোট ব্যয় খুচরা মূল্যের ২০% এর কিছু বেশি। বেশিরভাগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অভাবে প্রচুর পরিমাণ মাছ নষ্ট হয় তবে মূলধনের অভাব, পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নত, হিমাগারের অভাব, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যা মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে মৎস্য বাজারজতকরণ দক্ষতা অর্জনে বাঁধার সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করা গেছে যে, নির্ধারিত কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ৩০% সংগ্রহকারী নৌকা মৌসুমের সময় প্রয়োজনীয় সরবরাহের অভাবে বসে থাকে। গড়ে প্রায় ৫০% সংগ্রহকারী নৌযানের তাপ নিরোধক খোলের ব্যবস্থা আছে এবং ৪০% নৌযান তাপ নিরোধক বাক্সের অপর্যাপ্ত যোগানের কারণে অব্যবহৃত অবস্থায় বসে থাকে।

মধ্যস্থ কারবারী মূলধনের অভাবে বেশি পরিমাণ মাছ জড়ো করতে পারে না। ফলে কম পরিমাণ মাছের জন্য বেশি টাকা খরচ করে হিমাগার ভাড়া নিতে হয়। অথচ আরো বেশি পরিমাণ মাছের জন্য ঐ একই খরচ স্থির অবস্থান করতো। তাতে দেখা যায় যে, একক প্রতি খরচ তাদের অনেক বেশি। তাই বেশি পরিমাণে বেশি সময়ের জন্য সংরক্ষণ করলে বা হিমাগারে রাখলে একক প্রতি খরচ কমে যায়।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিপণন ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে করা হয় এবং এর পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। কারণ তাদের নিজস্ব ট্রলার, পরিবহণ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ এবং সর্বোপরি নিজস্ব দায়িত্বে বন্টন ব্যবস্থা তাদের বিপণন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাসে সাহায্য করছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়নগঞ্জে মৎস্য বাজারজাতকরণ

বি, এফ, ডি, সি, রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের জনগণের মধ্যে নিয়মিত মাছ সরবরাহ করে আসছে। ঐ স্থানগুলোতে সামুদ্রিক মাছ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সংস্থা রাজধানীতে ৩১টি স্থায়ী স্টলের মাধ্যমে এবং ৩৬টি বিদেশী ভ্যানের মাধ্যমে প্রতিদিন মাছ বিক্রয় করছে। তাছাড়া রিক্সা ভ্যান দ্বারা প্রত্যেক দোকানে মাছ পৌছে দিচ্ছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম মৎস্য হারবারে প্রতিদিন অকশনের মাধ্যমে স্থানীয় জেলে এবং মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাছ বেচা-কেনা করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে মৎস্য বিক্রয়ের জন্য ৭টি স্থায়ী স্টল এবং ১০টি রিক্সা ভ্যান রয়েছে। খুলনা ও রাজশাহীতে শীঘ্রই ন্যায্য মূল্যে মাছ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মৎস্য বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধান

১. গুদামজাতকরণ

ঢাকার সোয়ারীঘাটে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোন হিমাগার নাই। ফলে প্রায়ই প্রচুর মাছ সংরক্ষণের অভাবে পঁচে যায়। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে বাহির হতে বরফ সংগ্রহ করে ট্রলারের ভিতরই মৎস্য সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া এই লোকসান পোষাণের জন্য তাদের বেশি দামে মাছ বিক্রয় করতে হয়। কিন্তু হিমাগারের ব্যবস্থা থাকলে ভোক্তাদের বেশি মূল্য দিতে হতো না। তাই মৎস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক মৎস্য হিমাগার সরকারীভাবে স্থাপন করতে হবে।

২. জেটি নির্মাণ

সোয়ারী ঘাটে মৎস্য নামানোর জন্য কোন জেটি নেই। ফলে মৎস্য উঠানো-নামানোর জন্য সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য অনেক সময় মাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আধুনিক জেটি নির্মাণ আশু প্রয়োজন।

৩. পরিবহণ ব্যবস্থার অসুবিধা

সাধারণত মৎস্য পচনশীল। তাই ভোক্তাদের নিকট মৎস্য ধরার পর পরই পৌছানো দরকার বাংলাদেশে মন্থরগতি সম্পন্ন রিক্সা ভ্যান দ্বারা মৎস্য পৌছানো হয়। কিন্তু এই সমস্ত রিক্সা ভ্যানে তাপ নিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে পথেই অনেক মাছ নষ্ট হয়ে যায়। আর রাস্তাও অনেক অনুন্নত। তাই রাস্তা নির্মাণ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পুঁজি সংস্থানের অভাব

সাধারণত নিজস্ব টাকায় মৎস্য আড়তদারদের নিকট থেকে ক্রয় করতে হয়। মাঝে মাঝে খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে বাকিতে মৎস্য সরবরাহ করতে হয়। অনেক সময় অর্থের অভাবে মৎস্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত পাইকারদের আর্থিক সাহায্যদানের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে অনেক ব্যবসায়ীকে ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয় মাঝে মাঝে। তাই মৎস্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পুঁজি সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. নিলাম ঘরের অভাব

মৎস্য নিলামে ক্রয়-বিক্রয় হয় বেশি। আর তা খোলা আকাশের নিচে হয়ে থাকে। ফলে বৃষ্টি বাদলের সময় মৎস্য ক্রয়-বিক্রয় অনেকটা বন্ধ থাকে আবার অবিক্রিত মৎস্য পচেও যায়। তাই নিলম ঘর নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৬. বরফ কলের অভাব

পাইকারী বাজার সোয়ারী ঘাটের কাছাকাছি কোন বরফ কল নেই। ফলে পাইকারদের দূর থেকে বরফ সংগ্রহ করে মৎস্য সংরক্ষণ করতে হয়। এতে বিপণন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ভোক্তাদেরকে অধিক মূল্যে মৎস্য ক্রয় করতে হয়। তাই মৎস্য বিপণন কেন্দ্রের কাছাকাছি বরফ কল নির্মাণ করতে হবে।

৭. পুলিশী তৎপরতা

মৎস্য বিপণন কেন্দ্রে সংগৃহীত মৎস্য বিভিন্ন জেলাসমূহ হতে আসে। আর ট্রলারে কিংবা যাত্রীবাহী লঞ্চে মৎস্য আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় থামিয়ে পুলিশ বড় বড় অঙ্কের টাকা দাবি করে থাকে। যেহেতু ঐ সমস্ত যানে তাপ নিরোধের কোন ব্যবস্থা থাকে না এবং মৎস্য পচনশীল হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সেই সমস্ত দাবি পূরণ করে। আবার পথেও ট্রাক থামিয়ে এই নির্যাতন করে থাকে। ফলে এ সমস্ত ক্ষতি পোষাণোর জন্য তারা মাছের মূল্য বেশি নির্ধারণ করে। আর ভোক্তাদের সেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই সরকারীভাবে অপ্রয়োজনীয় পুলিশী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

৮. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা

মৎস্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নাই। ফলে তাদের ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই সরকারীভাবে মৎস্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৯. অযৌক্তিক চাঁদা প্রদান

পাইকারী ব্যবসায়ীদেরকে বিভিন্ন সময় দেশের রাজনৈতিক সংগঠন, ঈশ্বরবৃত্তি ইত্যাদি কারণে চাঁদা দিতে হয়। ফলে তারা মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে। তাই সরকারীভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই চাঁদা তোলা বন্ধ করতে হবে।

১০. অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ/প্যাকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশের পাইকারী ব্যবসায়ীরা বাঁশের ঝুড়ির ভিতর কিছু বরফ দিয়ে বা না দিয়ে মৎস্য প্যাকিং করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাঠায়। ফলে মৎস্যের প্রকৃত চেহারা নষ্ট হয়ে যায় এবং মূল্য হ্রাস পায়। তাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই প্যাকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. যোগান ও চাহিদার ব্যাপারে পাইকারদের অজ্ঞতা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মৎস্য পাইকারী ব্যবসায়ীরা অশিক্ষিত। ফলে বাজারে কত পরিমাণের চাহিদা রয়েছে এবং কি পরিমাণ মৎস্যের যোগান দিতে হবে তা তারা বোঝে না। ফলে অনেক সময় চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়ে যায় এবং মূল্য কমে যায়। এতে ব্যবসায়ী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যোগান ও চাহিদা সম্বন্ধে অজ্ঞ পাইকারদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে মৎস্য বাজারজাতকরণের একটি সমস্যা হচ্ছে মাছের মড়ক। ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী নাগাদ গা–পচা রোগে আক্রান্ত মাছ বাজারে উঠতে থাকে এবং মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত এই মাছ গ্রহণের ব্যাপারে জনগণের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। পরে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় যে এই মাছ রান্না করার পর খাওয়ায় কোন অসুবিধা নাই।

প্রায় ৫ বৎসর আগে হল্যাণ্ডে এ ধরনের রোগ দেখা দিয়েছিল। সে রোগই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ঘুরে বছর তিনেক আগে বার্মায় এসে উপস্থিত হয়। তখন কোন কোন মহল হতে নাকি বাংলাদেশকেও সতর্ক করা হয়েছিল। রোগাক্রান্ত মাছ মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর কি না এ সম্পর্কে নানা সংশয় বিদ্যমান। উপযুক্ত পরীক্ষা ভিন্ন এ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে ভাইরাস সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা যায়, এতে অংকোভাইরাস ভিন্ন কোন ভাইরাস জীবাণুই আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে না। বিশেষজ্ঞের মতে রান্না করা মাছ খাওয়ায় বিপদের আশঙ্কা নেই। বিপদ দেখা দিতে পারে অন্যভাবে। তাহলো কাটা কাটির সময়। মাছ কাটার সময় ভাইরাস হাতে লাগতে পারে। সে হাত মুখে দিলে মানুষের আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। মাছ কাটার সময় ছিটকে মুখে লাগে আবার অনেক সময় মহিলারা হাত কাপড়ে ঘষে পানের খিলি মুখে দেন। এর ফলে মাছের দেহ হতে ভাইরাস মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে। জেনেসিস জাতীয় রোগের সংখ্যা প্রায় দেড়'শ। জেনেসিস জাতীয় রোগ হচ্ছে সে সব রোগ যা মানব দেহ হতে পশুর দেহে এবং পশুর দেহ হতে মানব দেহে সংক্রামিত হয়। উন্নত দেশগুলোতে তাই পরীক্ষা না করে কোন মাছ মাংস বিক্রি করা হয় না। সে সব দেশে পশু চিকিৎসকরা এ দায়িত্ব পালন করেন। এর কারণ কোন কোন মুরগীর কলিজাতেও এক ধরনের ভাইরাস আছে।

আমাদের দেশেও এ ধরনের দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু লোক আছেন কিন্তু দায়িত্ব তারা পালন করেন না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মৎস্য ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এর উপর রোগ যদি দেখা দেয় তাহলে পরিণতি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর অনুমেয় বলেই বিষয়টি হাল্কাভাবে গ্রহণ করা চলে না। বিশেষজ্ঞদের মতে ভাইরাসের প্রকৃতি নির্ণয় করার মত কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। ময়মনসিংহস্থ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে ইপিজোটিক আলসারেটিভ সিনড্রম বা ক্ষত রোগে মাছ আক্রান্ত হচ্ছে। সাধারণত পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই এই ধরনের রোগের উদ্ভব হয়। তবে বিজ্ঞানীরা এ রোগে আক্রান্ত মাছ হতে ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও ভাইরাস জাতীয় রোগ জীবাণু পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, এই পণ্যের প্রকৃতিগত পচনশীলতা, সবরাহের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা এবং ব্যাপক এলাকায় ক্ষুদ্রাকারের বিস্তৃতি এবং অন্যদিকে পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সার্ভিসের সুযোগ সুবিধার অভাব মৎস্য বিপণন দক্ষতাকে প্রভাবান্বিত করে। প্রচুর মূলধন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবজনিত কারণে অতি দ্রুত এবং বিস্ময়কর উন্নতি আনয়ন করা কঠিন বলে মনে হয়, কিছু উন্নতি আনয়ন অবশ্যই সম্ভব। যেমন মৎস্য ঘাটে পৌছানোর পর পরই ধৌতকরণ, বরফ বা পানি ব্যবহার, প্যাকিং ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ এবং সুশৃঙ্খলবিধি ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ, বিপণন চ্যানেলের প্রতি পর্যায়ে পর্যাপ্ত যত্ন এবং সাবধানতা অবলম্বন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নাড়িভুড়ি পরিষ্কার করে বিপণন পথে মৎস্য প্রেরণ, মৎস্যের উচ্ছিষ্টকে বিশেষ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে কাজে লাগানো ইত্যাদি দ্বারা অবচয় রোধ এবং বিপণন ব্যবস্থাকে দক্ষ করা যেতে পারে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং সুষ্ঠু এবং নিয়মিত বাজার তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে মৎস্যের বিপণন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করতে না পারলে বিপণন ব্যয় হ্রাস করা, সার্ভিসের মান উন্নয়ন করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সুপরিকল্পিত সুসমন্বিত ব্যাপক ও বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষ ও উন্মুক্ত জলাশয়গুলোর যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং একই সঙ্গে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের জন্য সঠিক স্থানে/সময়ে/পরিমাণে বিপণনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। সর্ব বৃহৎ এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে জনবহুল মার্কেটে মৎস্যের সামগ্রিক মূল্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মন্দা বাজার পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মৎস্য হিমাগারে তুলে রাখা এবং সীমিত যোগানের সময়ে বাজারে ছেড়ে দেবার জন্য এবং বিশেষ করে শিল্প বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য যেমন– হিমাগার, জেটি নির্মাণ, গবেষণা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ব্যাপারে মৎস্য সংস্থাকে সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মসলা

ভূমিকাঃ মসলা অতীতে ছিল অবহেলিত, কোন রকম গবেষণাতো দূরের কথা, দেশের অর্থনীতিতে মসলা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তা ৫/৬ বৎসর আগেও কেউ চিন্তা করেনি। মসলা জাতীয় আয়ে বিশেষ অবদান রাখছে, সৃষ্টি করছে নতুন নতুন জীবিকা অর্জনের পথ, বৈদেশিক মুদ্রা আয়েও অবদান রাখছে প্রচুর, আর সবচেয়ে বড় যে কাজটি করছে, তা হচ্ছে আমাদের খাবার তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এদেশের গৃহবধূরা মসলা ছাড়া খাবার তৈরির কথা চিন্তা করতে পারেন না।

মসলা চাষের প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশের জলবায়ুতে সাধারণত তিন ঋতু প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ঃ (ক) গ্রীষ্ম– এই ঋতুর স্থায়ীত্ব মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত এবং এই সময় মোটামুটি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। (খ) বর্ষা– সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করে এবং এই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় ; (গ) শীত– মোটামুটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই সময়ের বিস্তৃতি।

এদেশের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের মসলা বিশেষ করে পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক। আদা এবং হলুদ চাষ করা হয় মার্চ থেকে মে এই সময়ে এবং চাষীরা ফসল তোলে নভেম্বর—মার্চ এই সময়ের মধ্যে। মরিচ বৎসরে দুইবার চাষ করা হয়। প্রথমবার অক্টোবর—নভেম্বর থেকে জানুয়ারী—মার্চ মৌসুমে এবং দ্বিতীয়বার মার্চ-এপ্রিল থেকে জুন–আগস্ট মৌসুমে। অন্যান্য তিনটি মসলা– রসুন, ধনিয়া এবং পিয়াজ রবি শস্য।

বাংলাদেশের ভূমি সাধারণত পলিমাটি সমৃদ্ধ। ফলে এই মাটিতে মসলা উৎপাদনে তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। প্রয়োজনীয় সার, পানি এবং উন্নত চাষাবাদের মাধ্যমে এই মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে মসলা উৎপাদন করা সম্ভব।

বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা

যদিও বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিভিন্ন ধরনের মসলা চাষের উপযোগী, তবুও মাত্র ১০ থেকে ১২ ধরনের মসলা এখানে উৎপাদিত হয়। তার মধ্যে মাত্র ছয় ধরনের মসলা যেমন পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ এবং ধনিয়ার খাদ্য হিসাবে অধিক চাহিদা থাকার কারণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য বলে এগুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি।

আমাদের দেশে উন্নত খাবার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে মসলা উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য খুবই সীমিত। কৃষকেরা যারা স্থানীয় জাতের মসলা আবাদ করছে, চাষাবাদ এখনো পুরানো ধরনের ; ফলে উৎপাদিত পণ্যের মান ও পরিমাণ আশানুরূপ নয়। নিচে বিভিন্ন মসলার উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হলো।

পিঁয়াজ

বাংলাদেশে পিয়াজ উগ্র স্বাদের জন্য ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয়। স্থানীয় জাতের পিয়াজ যদিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় তবুও গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাল থাকে।

পিয়াজ সাধারণত দুইভাবে উৎপাদিত হয়। প্রথমত বীজের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত বাল্ব এর মাধ্যমে। তবে প্রধানত বাল্ব এর মাধ্যমেই উৎপাদন করা হয়। বীজের মাধ্যমে উৎপাদন ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলে সীমিত, তবে রাজশাহীতে সীমিত আকারে বীজের মাধ্যমে পিয়াজ উৎপাদন করা হয় রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রায় ৭০% পিয়াজ চাষী তাদের ফসলের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে।

প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ অধিক পরিমাণ পিয়াজ উৎপাদনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দেখা গেছে যে, অর্ধেকেরও কম জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়। পোকামাকড় এবং গাছের অসুখ বর্তমানে তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করছে না। কিন্তু ফসল কাটার পর প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ অসুবিধার অভাবে চাষীদের ভুগতে হচ্ছে।

আদা

আদা সাধারণত রাইজোম থেকে উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন আদা থেকে কিছু পরিমাণ পরের মৌসুমের বীজ হিসাবে জমিয়ে রাখে। আদা মার্চ–মে মৌসুমে উৎপন্ন হয় বলে কিছুটা সেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ৮০% কৃষকই সেচের ব্যবস্থা করে না।

যদিও পচন আদার জন্য একটি অতি সাধারণ রোগ কিন্তু মাত্র ২০% কৃষক এই রোগের ঔষধ ব্যবহার করে। অর্ধেকেরও কমসংখ্যক কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। জৈবসার যেমন, খৈল এবং গরুর গোবর আলাদাভাবে কিংবা রাসায়নিক সারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করে।

হলুদ

হলুদ উৎপাদন করা হয় গাছের প্রধান মূলের গুড়ি ব্যবহার করে কিংবা হলুদের একটি বিশেষ অংশ ব্যবহার করে যা 'টারমারিক ফিঙ্গার' নামে পরিচিত। যদিও গুড়ি ব্যবহার করে বেশি ফলন পাওয়া যায়, তবুও কৃষকরা টারমারিক ফিঙ্গার ব্যবহার করে। কারণ এতে তাদের খরচ কম পড়ে।

অনেক সময় হলুদ সুপারি, আম কিংবা অন্য কোন ফলগাছের নীচে সারিবদ্ধভাবে চাষ করা হয়। মাত্র ৫০% কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। অন্যান্য মসলার মত অল্প কিছু কৃষক প্রয়োজনীয় সার হলুদ চাষে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ কৃষকই জৈব সার ব্যবহার করে। শতকরা ১৫ ভাগেরও কম হলুদ প্রয়োজনীয় সেচের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ মূলত বীজের গুণগতমান এবং পরিচর্যা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

রসুন

রসুন বাংলাদেশের অত্যন্ত নিম্নমানের বীজ, নিম্নমানের পরিচর্যা পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় এবং এই উৎপাদনে সীমিত পরিমাণে কিংবা মোটেই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। ২০% এর কম রসুন উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় সেচের মাধ্যমে। যেখানে অধিক ফলনের জন্য প্রচুর পানি সেচের প্রয়োজন। কারণ রসুন শীতকালে উৎপন্ন হয়। পোকামাকড় কিংবা রোগবালাই মাঠে কিংবা গুদামে রসুনের জন্য তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কৃষকরা সাধারণত রসুনের বিভক্তকৃত বাল্ব পরের মৌসুমের জন্য বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করে।

মরিচ

মোটামুটি সব কৃষকই নিজেদের ভোগের জন্য এবং কিছু বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মরিচ উৎপাদন করে। তবে বাণিজ্যিক উৎপাদন সীমিত রয়েছে বড় কৃষকদের মধ্যে, মরিচ সাধারণত কাঁচা এবং শুকনা দুইভাবে বাজারজাত করা হয়, তবে শুকনা মরিচ বৃহদায়কারে বেচাকেনা হয়। যদিও মরিচ গরম ও শীত দুই ঋতুতেই উৎপাদন হয়। কিন্তু ৮০% মরিচ উৎপাদন হয় শীত মৌসুমে।

চাষাবাদ পদ্ধতিতে কৃষকদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ নির্ভর করে মূলত চাষাবাদ পদ্ধতি এবং মরিচের বীজের মানের উপর।

বীজের মাধ্যমে বা গাছকে পুনঃরোপণের মাধ্যমে মরিচের উৎপাদন করা হয়। শীতকালে সাধারণত মরিচে সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সেচের সুবিধা না থাকায় বাণিজ্যিকভাবে মরিচের চাষাবাদের জন্য বিপজ্জনক। বেশিরভাগ কৃষকই প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করে।

ধনিয়া

ধনিয়া সাধারণত পাতা হিসাবে এবং এর বীজ আস্ত বা পাউডার দুইভাবে ব্যবহার করা হয়। ধনিয়ার বীজ ভাজা বাংলাদেশীদের কাছে সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে পরিচিত।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ধনিয়া অন্যান্য সীম বা মটর জাতীয় শস্যের সাথে উৎপাদিত হয়। এক সাথে উৎপাদিত হলে সীম মটর প্রভৃতির গুরুত্ব বেশি থাকে। মাত্র ২০% ফসল সেচের আওতায় আনা হয়। মাত্র ৫০% কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। কৃষকেরা মূলত গোবর, খৈল, ছাই প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। অতি পরিমাণে রোগ কিংবা পোকামাকড় ধনিয়া গাছ বা বীজের জন্য সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

প্রধান মসলা উৎপাদনকারী এলাকা

দেশের প্রায় সব জেলাতেই মসলা কম বেশি উৎপাদিত হয়। তবে পিয়াজ দেশের সব জায়গাতেই উৎপন্ন হলেও অন্যান্য মসলা কয়েকটি জেলাতেই বা তারও বেশি উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে মসলা উৎপাদনের তিনটি প্রধান এলাকা আছে। এইগুলো হচ্ছে (ক) রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ; (খ) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ; এবং (গ) ফরিদপুর জেলা। যদিও আরো অনেক জেলা আছে যেগুলো একটি বা একটির বেশি মসলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করে, যেমন, পাবনাতে হলুদ, বগুড়া এবং কুমিল্লাতে মরিচ, তবুও উপরিউক্ত তিনটি অঞ্চলই মসলা উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফরিদপুর জেলা একাই পিয়াজ, রসুন এবং ধনিয়া উৎপাদনে প্রথম পাঁচটি জেলার একটি। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আদা ও হলুদ উৎপাদনে প্রথম সারির উৎপাদক। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো মরিচ (রবি) ছাড়া অন্যান্য প্রধান মসলার মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% ভাগ উৎপাদন করে থাকে।

উৎপাদন

বাৎসরিক উৎপাদন বিভিন্ন মসলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের। আদা এবং হলুদের বাৎসরিক উৎপাদন ১% এবং ২% বাড়ছে। রবি মরিচ এবং রসুনের উৎপাদনে তেমন একটা উঠানামা ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৪-৮৫ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না (তালিকা-১)। অপর দিকে ধনিয়ার উৎপাদন বছরে ৩% হারে কমে যাচ্ছে। রসুন এবং বারো মেসে মরিচের বাৎসরিক উৎপাদন কমে যাচ্ছে ২% এবং ১% হারে।

অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মটর সীম প্রভৃতি ফসল ছাড়া, যেগুলোর উৎপাদন কমে যাচ্ছে ১৯৭৪-৮৪ মৌসুমে, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের চেয়ে মসলার বাৎসরিক উৎপাদন অনেক কম। এই সমস্ত শস্যের বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঃ

মটর সীম	(১%)
ধান	৩%
আলু	৩%
গম	৩০%
সরিষা	২%

আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে ১৯৭৪-৭৫ সালের চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ-এর চেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালের চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। যার ফলে মসলার দাম বেড়ে যাচ্ছে।

উৎপাদন খরচ এবং কৃষকদের আয়

এখন পর্যন্ত গবেষণা এবং সার্ভে করে দেখা যাচ্ছে যে, আদা চাষ সবচেয়ে লাভজনক। এরপর পর্যায়ক্রমে রসুন, হলুদ এবং পিয়াজের নাম করা যায়। এই চার ধরনের মসলার একর প্রতি গড় আয় অন্যান্য রবিশস্য যেমন, আলু, ধান, সরিষা, ডাল এবং গমের একর প্রতি গড় আয়ের চেয়ে বেশি।

টেবিল – ১

বাংলাদেশে মসলার উৎপাদন ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮৩-৮৪ (টন)

মসলা	৭৫/৭৬	৭৬/৭৭	৭৭/৭৮	৭৮/৭৯	৭৯/৮০	৮০/৮১	৮১/৮২	৮২/৮৩	৮৩/৮৪
পিয়াজ	১৪৭,৬০৫	১৩৬,১৬০	১৪৫,৪১০	১৩৩,৩৮৫	১৩৯,৪১৫	৯৫০৮৫	১৪০,৪৮৫	১৩১,৫৬৫	১৩৫,৮৮৫
আদা	৩৫,১২০	৩৪,৬৩৫	৩৪,২৯৫	৩৬,৫০৫	৩৬,৭০৫	৩৩,৮৭৫	৩৮,৮৭৫	৪১,১৪৫	৩৮,৮১৫
হলুদ	২১,৪৩৫	২১,৯১৫	২২,৬৭৫	২৩,৯৯৫	২৪,০৩০	২৪,৬৫৫	২৪,৯২০	২৫,৫৮০	২৫,৭৬০
রসুন	৪১,৪৫০	৩৬,৮৮০	৪০,৮৮০	৩৮,৭৯০	৩৯,৭১৫	৩৬,৯০০	৪২,৪২৫	৪১,৭১৫	৪২,৮০৫
রবি মরিচ	৪৭,৭৫৫	৪০,৩৯০	৪৫,৪৬৫	৪৭,৩০৫	৪৪,২৭৫	৩৫,৭৬৫	৪২,২৬৫	৪০,২৪০	৪১,৯২০
মরিচ	৪৩৩০	৪৩৭০	৪২৪৫	৪৪০৫	৪০৪৫	৩৮২৫	৪১৩৫	৪০০০	৪১০০
ধনিয়া	২৪৯৫	২২৬০	২৩৩০	২০০০	২০৪৫	১৯০৫	২২৯৫	২১৪০	---
মোট	৩০০,১৭০	২৭৭,৬১০	২৯৫,৩০০	২৮৬,৩৮৫	২৯০,২৩০	২০২,৫১০	২৯৫,০৬০	২৮৬,৩৯০	---

সূত্রঃ বি. এস. এস.

তবে উৎপাদন খরচ এবং নেট আয় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পিঁয়াজের সর্বনিম্ন গড় আয় একর প্রতি ৮৫ টাকা সর্বোচ্চ ২১,৩০০ টাকা (সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ)।

মসলা উৎপাদন অত্যন্ত লাভজনক, কিন্তু কিছু সমস্যা, যেমন বাজারজাতকরণ, পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব, প্রয়োজনীয় গ্রেডিং এর অভাব মসলা উৎপাদনকে সীমিত করেছে।

তালিকা-২

বাংলাদেশে একর প্রতি গড় আয়, মসলা ও অন্যান্য দ্রব্য, ১৯৮৪

ফসল	গড় আয় (টাকা/একর)	আওতা	
		সর্বনিম্ন আয়	সর্বোচ্চ আয়
মসলা			
আদা	১৯,০৯৮	১২,৬৭০	২৭,০০০
রসুন	১৫,৬৪৬	৫২৩৫	২৪,৮০০
হলুদ	১১,৯৫৭	৬৬৭৫	১৭,১৮০
পিঁয়াজ	১০৫৪৫	৮৫	২১,৩০০
মরিচ	৮২৪১	৭৯০	২০২২৫
ধনিয়া	১১১২	৯২৫	১৫০০
অন্যান্য ফসল			
আলু	৮,০৯৫	৮৩৩	১২৩৫৮
বোরো	৩,৩২৩	১৩৯২	৮৬০৫
সরিষা	২,৫৩৭	২৫৩	৩০২৪
ডাল	১৭৭০	১০৩৫	৩২৯৬
গম	১৩৪৯	০	১৮০৫

সূত্রঃ কৃষি বাজার বিভাগ

বাজারজাতকরণ এবং মূল্য

বাংলাদেশে মসলা বাজারজাতকরণ অবকাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ সংস্থার অভাব রয়েছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মসলা বাজারজাতকরণ এবং মসলার রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত এগুলোর সংখ্যা অত্যধিক।

স্থানীয় বাজারজাতকরণ

যদিও কিছু সমস্যা যেমন দক্ষ বাজারজাতকরণ অবকাঠামোর অভাবে শস্য বিনষ্ট হওয়া স্থানীয়ভাবে মসলা বাজারজাতকরণে দেখা যায়। তবুও অপেক্ষাকৃতভাবে স্থানীয় বাজারজাতকরণ পদ্ধতি কিছুটা দক্ষ। চিত্রে (১) মসলার উৎপাদন থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানোর প্রণালী দেখান হলো। স্থানীয় বাজারজাতকরণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত।

উৎপাদক

খামারে উৎপন্ন মসলা সাধারণত সরাসরি স্থানীয় বাজার বা মধ্যস্থ কারবারীর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। উৎপাদিত মসলা সাধারণত কাঁচা বা শুকিয়ে বিক্রি করা হয়।

মধ্যস্থ কারবারী

মধ্যস্থ কারবারীরা সাধারণত মসলা উৎপাদকের কাছ থেকে ফসল কাটার আগে বা ফসল কাটার সময় কিনে নেয়। প্রথম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদক অর্থনৈতিক কারণে তার ফসল কাটার আগেই বিক্রি করে দেয়, যা কখনোই তার কাছে পছন্দনীয় নয়। সাধারণত উৎপাদক ও মধ্যস্থ কারবারীর মধ্যে ফসলের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ বিক্রির একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী মধ্যস্থ কারবারী তার প্রাপ্য ফসল শস্য কাটার সময় নিয়ে যায়। যদিও এই পদ্ধতি সর্বত্রই প্রচলিত; পার্বত্য চট্টগ্রামে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক।

পাইকারী বিক্রেতা

মসলার বিপণনে পাইকারী বিক্রেতা তাদের ভাল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সংগঠিত কাঠামোর জন্য বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পাইকাররা এক সঙ্গে অনেক মধ্যস্থকারবারীর কাছ থেকে সরাসরি কিংবা তাদের প্রতিনিধি মধ্যস্থ কারবারীর সাহায্যে এ মসলা ক্রয় করে থাকে। পাইকারী বিক্রেতারা অনেক সময় নিজেরাই পণ্যের পরিবহণ এবং সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ খুচরা বিক্রি এবং পণ্য রপ্তানি প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণকারী (প্রসেসর)

বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে মসলা শুকনো, গুড়া করা, মেশান, প্যাকেজিং এবং বিতরণকে বুঝায়। প্রসেসর নিজেই পাইকারী ব্যবসায়ী হতে পারে। কিংবা প্রসেসর পাইকার বা মধ্যস্থকারবারীর কাছ থেকে কাঁচা মাল কিনে প্রসেস করে পাইকার, খুচরা বিক্রেতা বা রপ্তানিকারকদের কাছে প্রক্রিয়াজাতকরণ মসলা বিক্রি করে থাকে।

স্থানীয় বেশ কিছু ব্র্যাণ্ডের গুড়ো মসলা বাজারে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে টাইগার ব্যাণ্ড মসলা, বিউটি মসলা, চাঁদপুর মসলা এবং লাবণী মসলা ও অমৃত মসলা উল্লেখযোগ্য।

খুচরা বিক্রেতা

স্থানীয় বাজারে খুচরা বিক্রেতা অন্যান্য শাক-সব্জীর সঙ্গে কাঁচা মসলা বিক্রি করে। জেনারেল স্টোর বা ছোট মুদির দোকানে প্রক্রিয়াজাতকৃত মসলা পাওয়া যায়।

রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী

রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা রপ্তানির জন্য নিজেরাই পাইকারী বিক্রেতা বা প্রসেসরের কাছ থেকে আধা প্রক্রিয়াজাত বা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত মসলা কিনে থাকে। কিংবা আগেই বলা হয়েছে যে, তারা নিজেরাই পাইকারী বিক্রেতা বা প্রসেসর হতে পারে।

মসলা রপ্তানি

বিশ্ব বাজারে মসলা ব্যবসা দিন দিন জমে উঠছে এবং বর্তমানে এর পরিমাণ এক বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় মসলার উল্লেখযোগ্য চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে বিদেশী রন্ধনপ্রণালী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করায় আশা করা যাচ্ছে যে, মসলার চাহিদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার গণসংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত দেশগুলোর খাদ্যাভ্যাস ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর ফলে মসলার বাজার আরো জমে উঠবে বলে মনে হচ্ছে।

বাংলাদেশে রপ্তানি করার মত উদ্বৃত্ত মসলা রয়েছে। "বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন" রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত হিসাব করেছে বেশ কিছু মসলার জন্যে (তালিকা-৩)। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে মসলা রপ্তানির বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। প্রধান অসুবিধা হলো, মসলার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির নিমিত্তে কোন সু-চিন্তিত নীতি গ্রহণ করা হয়নি। কৃষকদের উদ্বৃত্ত মসলা উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করার কোন নীতি এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। ফলস্বরূপ উৎপাদকের সরবরাহ সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোন নীতি নয়, সরবরাহই আমাদের মসলা রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭২ সালে যখন কিছু মসলার দাম বেড়ে যায়, সরকার তখন মসলা রপ্তানির উপর কিছুটা নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর ফলে মসলার দাম কমে গেলেও, চাষীরা উৎপাদনে উৎসাহ হারায়। ১৯৮৪ সালে সরকার এই অবস্থা সংশোধনে কিছুটা

আগ্রহী হন এবং মরিচ, হলুদ প্রভৃতির উপর আংশিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। টি. সি. বি. কে সরকার প্রথমে গুড়া মরিচ এবং পড়ে ১৯৮৪ সালে হলুদ রপ্তানি করার দায়িত্ব প্রদান করেন। তবে পিঁয়াজ ও রসুনের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। তালিকা-৪ এ মসলা থেকে রপ্তানি আয় দেখানো হয়েছে।

মূল্য

ফসল কাটার মৌসুম ও অন্যান্য সময়ে মসলার মূল্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। ফসল কাটার সময় সর্বনিম্ন এবং অন্য সময়ে সর্বোচ্চ মূল্য লক্ষ্য করা যায়। মূল্যে এই বিভিন্নতা নির্ভর করে (১) পণ্যের পচনশীলতার উপর (২) সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থা, (৩) কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, (৪) মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যা।

তালিকা-৫ এ মসলার পাইকারী মূল্য এবং তালিকা-৬ এ মসলার খুচরা মূল্য দেখান হয়েছে। এছাড়া উৎপাদক, মধ্যস্থ কারবারী, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতার মধ্যে দামের যে হেরফের হচ্ছে তাও দেখানো হলো (তালিকা-৭)

মসলার বন্টন প্রণালী

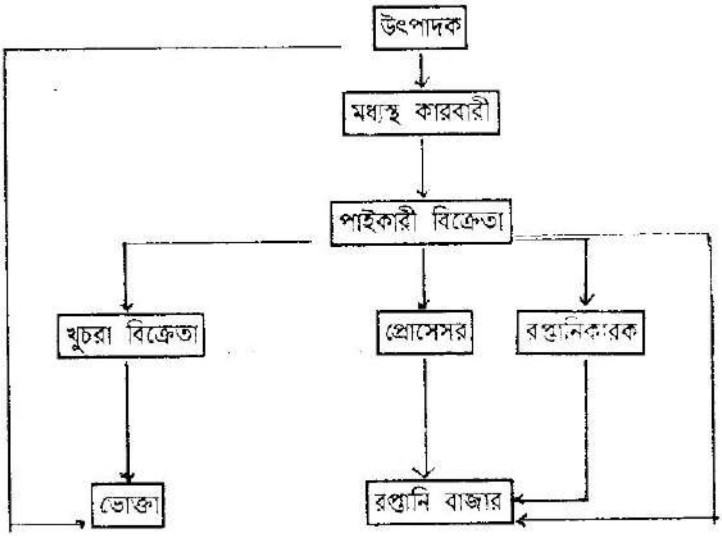

চিত্রঃ ১ বাংলাদেশে মসলা বাজারজাতকরণ নেটওয়ার্ক

তালিকা - ৪

বাংলাদেশ থেকে মসলা রপ্তানি, ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৩-৮৪ (০০০ টাকা)

মসলা	১৯৭৪/৭৫	১৯৭৫/৭৬	১৯৭৬/৭৭	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৮/৭৯	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪
আদা	১২৯৫	১২০৪	৫৭০৫	৪৫২	১২৭৮	৩৪১	২৯৬	২৪৮	৯৯৭	—
কাল জিরা	—	—	—	—	—	৩৮১	১৯	—	৩৪	—
মরিচ	৯৮০	২৪৬০৬	৪২৯৮	৪২৩৯	১৩০৯	৩৩৩	১৯	—	—	—
হলুদ	২২৪	৭৬	৫১৪	২৪৬১	৩৩৮	—	৫০	—	—	—
ধনিয়া	—	৩৩০	৯০৭২	২৬	২৬৯৪	৭৮১	—	—	—	—
রসুন	—	—	—	৭৩৪	১১৭৪	৪৪৬	৩৯২	১৬৮	৩৭৫	২৯০
মসলা	—	—	৪৫	৪৬৪	১৯০৯	১৩৫৫	১১৮৫	১৪৯৪	২১৯৯	২১৯
মোট	২৪৯৯	২৬২৫৬	১৯৬৩৪	৮৩৭৬	৯০৮৩	৩২৪৫	১৯৪২	১৯১০	৩৬০৫	১৫৮৯

সূত্র: কৃষিবাজার বিভাগ

তালিকা – ৩
রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত মসলা ১৯৮১

মসলা	রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত (টন)
পিয়াজ	——
আদা	১০,০০০
হলুদ	১,০০০
রসুন	২,০০০
মরিচ	৫০০
ধনিয়া	৩,০০০

সূত্র ঃ কৃষিবাজার বিভাগ

তালিকা – ৫
মসলার পাইকারী মূল্য, ১৯৭৩–৮৫

(টাকা/মণ)

অর্থ বছর	পিয়াজ	আদা	হলুদ	রসুন	শুকনা মরিচ	ধনিয়া
১৯৭৩	৪৮	৬৮	১১৮	৮০	১৬৫	৮৩
১৯৭৪	৯২	১৯৫	২৫০	২০৫	১১৫৩	২৭৪
১৯৭৫	৯৬	৩৪০	২৪২	২৪২	৮৪২	২৮৫
১৯৭৬	৫২	২১০	২১০	২৪০	৪৪১	১৭৫
১৯৭৭	১৪০	১৯০	৩৭০	১৮৪	৮০০	২২৫
১৯৭৮	৮৫	১৪২	৬৭৫	১৫৮	৭২৪	১৮২
১৯৭৯	১৬০	৩০৫	৪৯৫	১৩৯	৩৮৮	১৩১
১৯৮০	১০৪	৪৩০	৩৭০	২৬৬	৬৫১	১৫৬
১৯৮১	৩২৮	৬৪১	৩৯১	৪৯১	১১০৯	৪১২
১৯৮২	২০৫	৫০৯	৩৯৪	৫০৪	৬৫২	৪৫৪
১৯৮৩	১৯২	৩৪৪	৮৮৭	৩৯৪	৮০৭	৩০৭
১৯৮৪	২০৮	৩৬৪	১৪৮১	২০২	১৪৪৯	২৭৭
১৯৮৫	২৪১	৩৫৭	১৫২৫	৩৮৬	৮৬০	৩৮৬

সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ

তালিকা – ৬

ফসল কাটার মৌসুম ও অফসিজনে মসলার খুচরা দাম (ঢাকার বাজারে)

মসলা	ফসল কাটার মৌসুম	অফসিজন (বাজার)
পিয়াজ	২.৫০–৩.০০	১১.০০–১২.০০
আদা	৩.০০–৪.০০	১৬.০০–১৮.০০
হলুদ (প্রক্রিয়াজাতকৃত)	১২.০০–১৬.০০	৪০.০০–৪৫.০০
মরিচ (শুকনা)	২০.০০–২৫.০০	৪০.০০–৪৫.০০
রসুন	৪.০০–৫.০০	১৬.০০–২০.০০
ধনিয়া (বীজ)	৫.০০–৬.০০	১০.০০–১২.০০

সূত্রঃ এ, এস, টি সার্ভে, ১৯৮৪।

তালিকা - ৭

বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মসলার মূল্য (টাকা/কেজি)

বিভিন্ন ধাপ	পিঁয়াজ	আদা	হলুদ	মরিচ		রসুন	ধনিয়া (বীজ)
উৎপাদনক	২.৫০–৩.০০	৩.০০–৪.০০	১২.০০–১৬.০০		০.৭৫–১.০০	৪.০০	৫.০০
মধ্যস্বত্বকারবারী	৪.৫০	৭.০০	৩৫.০০	সবুজ	২.০০	৫.০০	৬.০০
				শুকনা	১৮.০০		
পাইকার	৫.০০	১০.০০	৪০.০০	সবুজ	৩.০০	৭.৫০	৮.০০
				শুকনা	২০.০০		
খুচরা বিক্রেতা	৬.০০–৬.৬০	১২.০০	৪৫.০০–৫০.০০	সবুজ	৫.০০	১০.০০	১০.০০
				শুকনা	২৫.০০–২৮.০০		

সূত্রঃ এ. এস. টি. সার্ভে, ১৯৮৫

বাজারজাতকরণ সমস্যা

মসলা বাজারজাতকরণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। প্রথমত বছর বছর মসলা উৎপাদনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে। ফলে বিদেশের বাজারে রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মসলার সরবরাহ সম্বন্ধে নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বাজারে মসলার দাম, মসলার চাহিদা, সরবরাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য মসলা উৎপাদক ও বিক্রেতাকে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তৃতীয়ত, মসলা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ধান, পাট, গম, তুলা প্রভৃতি কৃষিজপণ্য সম্বন্ধে যে ধরনের ব্যাপক গবেষণা দেশীয় ও বিদেশী সংস্থাগুলো করছে, মসলা সম্বন্ধে সেই ধরনের কোন গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়নি। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় গ্রেডিং–এর অভাব রয়েছে। মরিচে কিছুটা গ্রেডিং করা হলেও অন্যান্য মসলায় মোটেই গ্রেডিং করা হয় না। এতে পণ্যের দাম হেরফের হচ্ছে। পঞ্চমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সুবিধার অভাব। আমাদের দেশে সংরক্ষণ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। যে সমস্ত সংরক্ষণাগার আছে সে সমস্ত সংরক্ষণাগারে বিভিন্ন মসলা সংরক্ষণের যে ধরনের সুবিধা থাকা দরকার তা থাকে না। যেমন পিয়াজ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ২৭° ফারেনহাইট থেকে ৩২° ফারেনহাইট। কিন্তু এই ধরনের তাপমাত্রা সম্পন্ন সংরক্ষণাগার বাংলাদেশে নেই। ষষ্ঠত, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হচ্ছে পরিবহণ সমস্যা। অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা মসলা বাজারজাতকরণে বিশেষ প্রভাব ফেলছে। পরিবহণ সমস্যার জন্য অনেক সময় পণ্যের পচন দেখা দেয়, ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সপ্তমত, কৃষি ঋণের অভাব। মসলা উৎপাদনে সরকার কোন রকম ঋণ প্রদান করে না। অথচ অন্যান্য প্রধান কৃষিজাত পণ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনীয় ঋণের অভাবে কৃষকরা মসলা উৎপাদনে ক্রমশ উৎসাহ হারাচ্ছে। অষ্টমত, মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি। ফসল কাটার মৌসুমে শস্যের মূল্য কম থাকে। এই সময় বিভিন্ন মধ্যস্থ কারবারী, দালাল, ফটকা বাজারীরা কম দামে এই সময়ে পণ্য ক্রয় করে সংরক্ষণ করে এবং অফসিজনে বেশি দামে বিক্রি করে। এই মূল্য উঠানামা কৃষকদের কোন উপকারে আসে না। নিচে চিত্রের সাহায্যে পিয়াজের মূল্যের উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

পিঁয়াজের দাম

বছর	এপ্রিল	নভেম্বর
১৯৮৩	১১৭	৩৩৩
১৯৮৪	১২৯	২৮১
১৯৮৫	১৩৮	৫০৪

সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ

BANGLADOC Library Dhaka

দেখা যাচ্ছে ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ সালের ফসল কাটার মৌসুমে পিয়াজের দাম ছিল যথাক্রমে ১১৭/=, ১২৯/=, ১৩৮/= এবং অফসিজনে দাম ছিল যথাক্রমে ৩৩৩/=, ২৮১/=, ৫০৪/=। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফসল কাটার মৌসুমের চেয়ে অফসিজনে ২ থেকে ৪গুণ বেড়ে যাচ্ছে। এই মূল্যের ব্যাপক উঠানামা বাজারজাতকরণে প্রভাব ফেলছে। কোন কোন মসলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ফসল কাটার মৌসুম এবং অফসিজনে দামের অনুপাত ১:৫।

সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কমবেশি মসলা উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত বাজারজাতকরণ অবকাঠামোর সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। নিচে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু সুপারিশ করা হলো।

প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং গবেষণা

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কি পরিমাণ জমি মসলা চাষের আওতায় আসবে, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা কি হবে প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রথমেই গ্রহণ করতে হবে। উন্নত প্রজাতি, যেগুলো বাংলাদেশের জলবায়ুতে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে, সেইগুলোর প্রজন্ম এবং উৎপাদন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া চাষাবাদ, সেচ, সারের ব্যবহার, পোকামাকড় এবং রোগের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার দরকার।

বিশ্ববাজারের মূল্য তথ্য

স্থানীয় বাজারে পণ্যের দাম এবং চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব বাজারে মূল্য এবং চাহিদা সম্বন্ধে কৃষকদের অবগত করতে হবে।

রপ্তানি বাণিজ্য

রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মসলার নির্ভরযোগ্য সরবরাহ বজায় রাখা প্রয়োজন। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া মসলা রপ্তানির জন্য দীর্ঘমেয়াদী নীতি প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। মসলা রপ্তানির উপর সমস্ত অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে মসলা ব্যবসায়ীদের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

সংরক্ষণ ও পরিবহণ

সংরক্ষণ এবং পরিবহণ মসলা বাজারজাতকরণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে মসলা উৎপাদিত হচ্ছে এবং শহরে বাজারে প্রয়োজনীয় উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা জরুরী। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা কৃষকদেরকে তাদের পণ্যের জন্য সঠিক মূল্য পেতে সাহায্য করে।

গ্রাম থেকে শহরে মসলা পরিবহণের জন্য উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় যে, মসলার পরিবহণ সড়ক পথে হয়ে থাকে। এতে খরচ কম পড়লেও যাত্রা পথের দূরত্বের কারনে অনেক সময় লাগে এবং পথে ফেরী পারাপারের যথেষ্ট সুবিধা না থাকাতে মসলা নষ্ট হয়ে যায়। এতে বাজারে মসলার দাম বেড়ে যায়। অপরদিকে ট্রেনে খরচ কিছু বেশি হলেও কিছুটা দ্রুততার সঙ্গে পণ্য সরবরাহ সম্ভব। এতে মসলা নষ্ট হওয়ার খুব একটা সম্ভাবনা থাকে না এবং কিছুটা কম দামে বাজারে মসলা কেনা যায়। তাই ট্রেনে মসলা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে হবে এবং সাথে সাথে সড়কের মাধ্যমে মসলা পরিবহণের যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আসে সেইগুলোকে যথাসম্ভব অপসারন করতে হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চামড়া

ভূমিকাঃ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ঐতিহাসিকভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ খাত থেকে প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, রপ্তানির পরেই চামড়ার স্থান। ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ চামড়া থেকে ৪১০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। যা পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল মাত্র ১৮০ কোটি টাকা।[১] স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে ও দেশে অনেকগুলো ট্যানারী শিল্প ছিল। পাকিস্তানী মালিকেরা প্রায় ৩০টি ট্যানারী ফেলে যায়। যার কিছু পরবর্তী সময়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং বাকীগুলো সরকার নিয়ে নেয়। বর্তমানে অবশ্য সবগুলোই ব্যক্তি মালিকানাধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চামড়া শিল্প দেশীয় গরু, মহিষ ও ছাগলের চামড়ার উপর নির্ভরশীল। চামড়া উৎপাদন এসকল পশুর দৈনন্দিন জবাইয়ের হার ও কোরবানীতে জবাইয়ের পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকে।

বৈদেশিক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রচলিত পন্থা হচ্ছে ওয়েট–ব্লু চামড়া রপ্তানি করা। বেশির ভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তেমন কোন যান্ত্রিক সরঞ্জাম নেই, তাদের গৃহীত কারিগরি ব্যবস্থাও অত্যন্ত নিম্নমানের। ওয়েট–ব্লু হচ্ছে চামড়া সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা এতে করে চামড়া গুদামজাত ও রপ্তানিকালীন সময়ে তার মান অক্ষুণ্ন থাকে। ওয়েট–ব্লু চামড়াকে ব্যবহারের আগে অবশ্য ফিনিশিং করতে হয়। ১৯৮২ সালের পর থেকে দেশে কিছু রপ্তানি উপযোগী ক্রাস্ট ও ফিনিসড চামড়া উৎপাদনকারী শিল্প ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি মিলিয়ে ১৭০ টি ট্যানারী রয়েছে। উপরন্তু আই ডি এ ঋণের আওতায় বাংলাদেশ লেদার টেকনলজি ইনস্টিটিউটে পাকা চামড়া তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে তালিকা ১–এ বড় ও মাঝারি ট্যানারীগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ১ঃ বাংলাদেশ ট্যানারীসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান

অবস্থান		সংখ্যা
১.	ঢাকা	৯৬ টি
২.	চট্টগ্রাম	১৫ টি
৩.	যশোহর	১টি
৪.	বগুড়া	১ টি
৫.	বরিশাল	১ টি
৬.	ময়মনসিংহ	১ টি

উৎসঃ ব্যবসায় তথ্য কেন্দ্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

---

১ সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা।

উপরিউক্ত ট্যানারীগুলো ছাড়াও হাজারীবাগে আরও প্রায় ৫০টির বেশি ক্ষুদ্র আকারের ট্যানারী রয়েছে। তবে বর্তমানে কার্যরত বৃহৎ ও আধুনিক ট্যানারীর সংখ্যা মাত্র ৭টি। আরও ৯/১০টি আধুনিক ট্যানারী স্থাপনের কাজ প্রায় সমাপ্তীর পথে। বাটা স্যু কোম্পানী জুতা তৈরির জন্য পাকা চামড়া উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি সর্বাধুনিক ট্যানারী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেছে।

দেশীয় কাঁচা চামড়ার সরবরাহ অবস্থা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে বহু বছর ধরেই গবাদি পশু ও ছাগলের সংরক্ষিত চামড়া রপ্তানি করে আসছে। এই চামড়াগুলো সাধারণত কৃষি উপজাত গবাদি পশু থেকেই পাওয়া যায়। কেননা এ দেশে কৃত্রিম প্রজনন ও পশুখামার নেই বললেই চলে। গবাদি পশু প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও হয়ে ওঠেনি। তাই গবাদি পশু উৎপাদনের অগ্রগতি এত মন্থর। নিম্নে তালিকা ২-এ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ণায়িত পশুসংখ্যার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

তালিকা – ২ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ণায়িত পশুসংখ্যা (সংখ্যা হাজারে)

পশুর নাম	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	প্রবৃদ্ধির হার
গরু	২৭০৬	২৭২২	২৭৩৮	২৭৫৪	২৭৭১	০.৫৬%
ছাগল	২৬৫০	২৭২৯	২৮১১	২৮৯৫	২৯৮২	২.৯৬%
মহিষ	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	০.২৫%
ভেড়া	২৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৫	০.৪৬%

উৎসঃ বাংলাদেশ পশুপালন পরিদপ্তর

গবাদি পশু ও ছাগলের চামড়ার আভ্যন্তরীণ সরবরাহ আসে দৈনন্দিন জবাই এবং কোরবানী উৎসব থেকে। তাই এই সরবরাহ অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল। তালিকা – ৩ এ বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের চামড়া সরবরাহ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে ঃ

তালিকা – ৩

বাংলাদেশের চামড়া সরবরাহ অবস্থা (মিলিয়ন সংখ্যায়)

বৎসর	গরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া
১৯৮০	২.০১	০.০৩২	৪.৫০	০.১৯
১৯৮৩	২.১৭	০.০৩৫	৭.৭৫	০.২১
১৯৮৫	২.৭০	০.০৭	৭.৫০	০.৩০

সূত্র ঃ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ও
চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি

সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের মতে চামড়াগুলোর গড় আকার হলো গরু ২০ বর্গফুট, মহিষ ৩০ বর্গফুট, ছাগল ৩.৫ বর্গফুট, ও ভেড়া ৪ বর্গফুট। এই হিসাবে দেশে মোট উৎপাদিত চামড়ার পরিমাণ প্রায় ১০৫ মিলিয়ন বর্গফুট। এর শতকরা ৬৫ ভাগই গরু, মহিষ এবং বাকিটা ছাগল ও ভেড়ার।

চামড়া সংগ্রহ প্রণালী

গ্রামীণ সংগ্রহকারী ও পাইকাররা নিয়মিতভাবে হাট/জবাইয়ের জায়গা থেকে চামড়া সংগ্রহ করে ফড়িয়াদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। ফড়িয়ারা চামড়ায় লবণ দিয়ে সংরক্ষিত করে। এভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চামড়ার সংগৃহীত হলে তারা বেপারীদের কাছে অথবা সরাসরি ট্যানারীতে বিক্রী করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলো জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের কাছে (বেপারী) বিক্রী করা হয়। এই ব্যবসায়ীরা অতঃপর প্রায় ১০০০টি চামড়ার লট তৈরি করে ঢাকার চামড়া বাজারের আড়তদারদের কাছে বিক্রীর জন্য নিয়ে আসে।

এই আড়তদাররা আরও বেশিদিন সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পুনরায় লবণ দেয় ও ট্যানারীতে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত মওজুত করে। চামড়া সংগ্রহের এই চ্যানেলটি চিত্র – ১–এ দেখানো হলো ঃ

চিত্র - ১

কাঁচা চামড়া সংগ্রহ প্রণালী

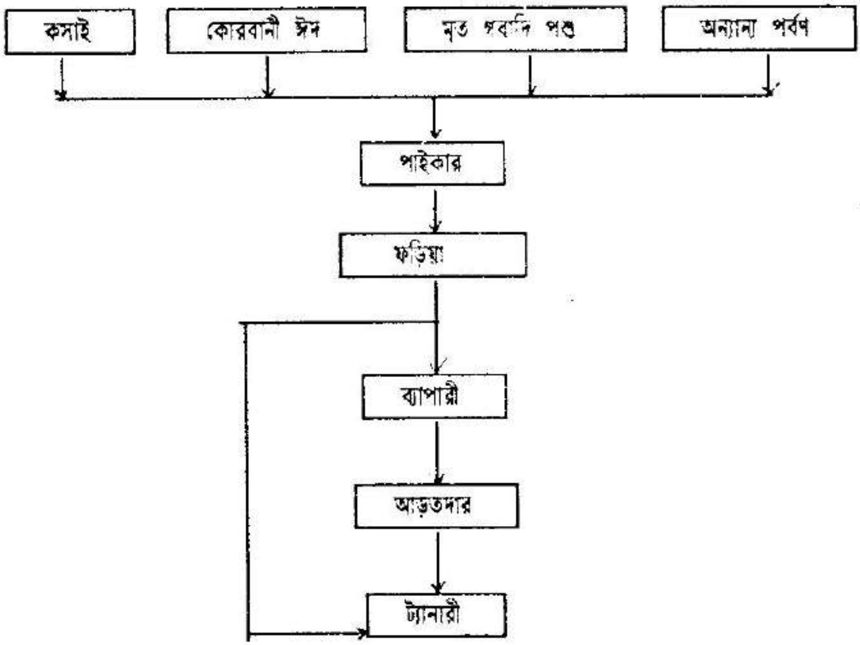

চামড়া প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি

(ক) ওয়েট ব্লু ট্যানিং ঃ প্রথমে লবণ দেয়া কাঁচা চামড়া বাছাই করে ছাঁটাই করা হয়। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য ঘূর্ণায়মান ড্রামের প্রিজারভেটিব ও ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে ডুবানো হয়। চুল ও মাংস আলগা করার জন্য এগুলোতে চুন ও অন্য ক্ষার দেওয়া হয়। তারপর হাতের বা যন্ত্রের সাহায্যে চুল ও মাংস ছাড়ান হয়। চামড়াগুলো ট্যান করার সময় রাসায়নিক পদার্থগুলো যাতে বেশি করে গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকবার ঘূর্ণায়মান ড্রামে বিভিন্ন ক্ষার, লবণ ও এসিডের দ্রবণে চালনা করা হয়। ক্রমিয়াম লবণের সাহায্যে এর পর ট্যান করা হয় ও চালান দেয়ার আগে কনডিসন করার জন্য ৭/৮ দিন স্তূপ করে রাখা হয়। ওয়েট ব্লু ট্যানিং –এর পদ্ধতি চিত্র – ২ তে দেয়া হলো ঃ

চিত্র – ২
ওয়েট ব্লু চামড়া তৈরির পদ্ধতি

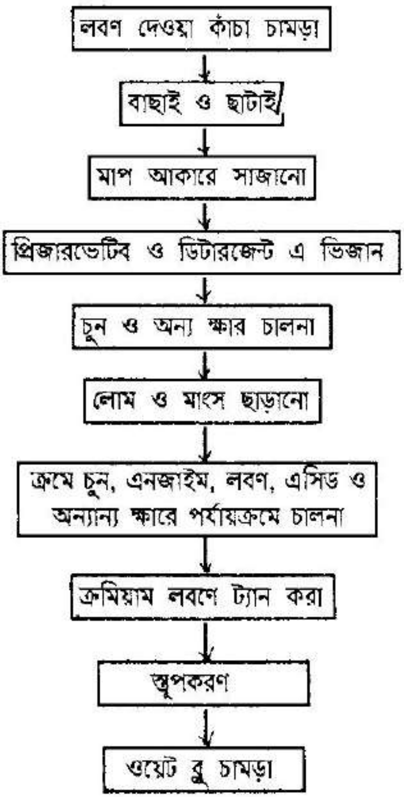

(খ) ফিনিসড লেদার ট্যানিং ঃ এটা ওয়েট-ব্লু চামড়া থেকে করা হয়। প্রথমে ওয়েট-ব্লু চামড়ার অতিরিক্ত পানি ঝরান হয় ও গরুর চামড়ায় স্প্লিট (Split) দেওয়া হয়। অতঃপর ছাটাই করে নির্দিষ্ট পুরুত্বে আনা হয়। নিউট্রালাইজার ও ফ্যাট লিকারিং দিয়ে চামড়া নরম করা হয়। এরপর ইচ্ছানুযায়ী রং দেওয়া হয় ও পানি ঝরান হয়। পরবর্তী পর্যায়ে টানা দেওয়া ও উপরিভাগ মসৃণ করা হয়। ক্রাস্ট লেদার তৈরি করার জন্য এরপর ঐ চামড়াকে ছাঁটাই করে গরম হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দেওয়া হয়। ফিনিসড লেদার তৈরি করার জন্য উপরিউক্ত টানা ও মসৃণকরণ পদ্ধতির পর ময়লা পরিষ্কার করে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী রং দিয়ে ইস্ত্রি করা হয়। এর পর চামড়ার উপরিভাগ সুন্দর করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

রপ্তানি

চামড়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশী চামড়ার প্রধান ক্রেতা হচ্ছে ইতালী। তাছাড়াও ভারত, গনচীন, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চামড়া ক্রয় করে থাকে। নিম্নে তালিকা-৪ এ বাংলাদেশ থেকে চামড়া আমদানিকারক দেশগুলোর ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের আমদানির পরিমাণ ও তার শতকরা হিসাব তুলে ধরা হলোঃ

তালিকা - ৪

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি পরিমাণ (মুল্য হাজারে)

যে সকল দেশে রপ্তানি হয়েছে	১৯৮৪-৮৫		১৯৮৫-৮৬	
	মূল্য	শতকরা হার	মূল্য	শতকরা হার
ইতালী	১,১৩,১৪,৪৫	৬২.৭১	৭৭,৯৬,৭৩	৪৩.২৬
ভারত	১৪,৭১,৩৪	৮.১৫	৭,২৯,০৩	৪.০৪
গনচীন	১২,৯০,৪৪	৭.১৫	১৬,৫৩,১৭	৯.১৯
ফ্রান্স	৭,৩৯,৯৭	৪.১০	১২,৮০,৯৭	৭.১১
বুলগেরিয়া	৬,০৭,৫৯	৩,৩৭	২,৯০,৭১	১.৬২
আমেরিকা	৪,৫৪,৩৯	২.৫২	৮২,০২	০,৪৫
রাশিয়া	৪,১৪,৮৯	২.৩০	১২,৪৭,২৯	৬.৯২
নেদারল্যাণ্ড	২,৮৯,৭৫	১.৬১	১২,০৯,৪১	৬.৭১
বেলজিয়াম	২,৮১,০৪	১.৫৬	১৩,৫০	০.০৭
যুগোশ্লাভিয়া	১,৯১,৩২	১.০৬	১৩,৯৪	০.০৮

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাংলাদেশ মূলত চামড়াই রপ্তানি করে চামড়াজাত দ্রব্যের পরিমাণ এই ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য। নিম্নে তালিকা - ৫ -এ বিগত ছয় (৬) বৎসরের মোট চামড়া রপ্তানির বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

তালিকা - ৫

বাংলাদেশ থেকে মোট চামড়া রপ্তানির পরিমাণ

বৎসর	পরিমাণ (বর্গফুটে)	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১৯৮১-৮২	৮৭.২৮	১২৬.৪১
১৯৮২-৮৩	৯৩.৮৯	১৩৭.৬১
১৯৮৩-৮৪	১০২.৯১	২০৯.২৩
১৯৮৪-৮৫	৮১.৭৫	১৮০.৪৩
১৯৮৫-৮৬	৭২.৬১	১৮০.২৪
১৯৮৬-৮৭	১৩৭.৪৬	৪০৯.৭০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

উপরিউক্ত তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একমাত্র ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৬-৮৭ সাল ছাড়া অন্যান্য বৎসরে চামড়া রপ্তানি মোটামুটিভাবে একই রকম। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে অস্বাভাবিক রপ্তানির কারণ সম্ভবত প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে গবাদি পশুর পাচার হওয়া।

উল্লেখিত সময়ে রপ্তানিকৃত চামড়ার মধ্যে ক্রাস্ট এবং ফিনিসড চামড়ার আনুপাতিক হারের বিবরণ নিম্নের তালিকা - ৬ এ দেখানো হলোঃ

প্যাকিং ঃ চা বাজারজাতকরণের পূর্বে প্যাকিং করা অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া আর্দ্র আবহাওয়ায় চা নষ্ট হয়ে যায় বিধায় চা মোড়কজাত করা হয়। আবার চা পরিবহণ ও সংরক্ষণের সময় যাতে চায়ের মান ঠিক থাকে সে জন্য প্যাকিং–এর ব্যবস্থা করতে হয়। চায়ের প্যাকিং–এর জন্য সাধারণত কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয়। কাঠের বাক্সের ভিতরে বিশেষ এক ধরনের পাতলা কাগজ ব্যবহার করা হয়। কাঠের বাক্স বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কাঠের বাক্সের উপরে বিশেষ এক ধরনের লোহার পাত ব্যবহার করা হয়। যাতে বাক্স নড়াচড়াতে কোন রকমের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। তার পর বাক্সের উপরে কোম্পানীর নাম, গ্রেড, ওজন ইত্যাদি লিখা থাকে। চায়ের প্যাকিং সঠিকভাবে করা না হলে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তা বাজারজাত করা যায় না।

পরিবহণ ঃ আমাদের দেশে চা উৎপাদন করার পর সাধারণত ট্রাকে, রেলওয়ে বা নৌযোগে চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আমাদের দেশের পাইকাররা এই নিলাম কেন্দ্র হতে সাধারণত ট্রাক–এর মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। তারপর খুচরা কারবারীরা পাইকারের দোকান হতে ট্রাক, লঞ্চ, ঠেলাগাড়ি, রিক্সার মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়।

গুদামজাতকরণ ঃ প্রথমে চা উৎপাদনের পর বাগানের মালিকগণ নিলাম কেন্দ্রে না পাঠানো পর্যন্ত গুদামজাত করতে হয়। তারপর চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রের গুদামে পাঠানো হয়। ঐখান থেকে নিলামের মাধ্যবে পাইকাররা চা ক্রয় করে পরিবহণের মাধ্যমে নিজস্ব বা ভাড়া করা গুদামে মওজুদ করে। খুচরাকারবারীরা পাইকারের নিকট থেকে ক্রয় করে নিজস্ব গুদামে বা দোকানে মওজুদ করে রাখে।

মূল্য ঃ আমাদের দেশে চায়ের মূল্য বেশি উঠানামা করে। ১২ নং তালিকায় গত কয়েক বৎসরের চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রের মূল্য দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১২

বাংলাদেশের চা এর মূল্য
(আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে)

সাল	মোট বিক্রয় (কেজি)	গড় মূল্য (কেজি প্রতি)	
১৯৭৩–৭৪	২০,৯৬৭৬০৪	৪.৬৭	টাকা
১৯৭৪–৭৫	২৮২৯৫০০৬	৭.১৭	"
১৯৭৫–৭৬	২৫০৬৫৫০২	৯.২৬	"
১৯৭৬–৭৭	৩০৫৯৫৯৬৬	১৭.০২	"
১৯৭৭–৭৮	৩৩২৫১০৭৮	১৮.৮১	"
১৯৭৮–৭৯	৩৪০৩২৬৫৫	১৮.৭৮	"
১৯৭৯–৮০	৩২০৬৬৫১৯	১৬.৪৭	"
১৯৮০–৮১	৩৫৮৫১৩৮৬	১৭.৯০	"
১৯৮১–৮২	৩৫৯০৯৮০৬	১৯.৬৯	"
১৯৮২–৮৩	৩৫৬৬৮৫০৭	৩২.৫০	"
১৯৮৩–৮৪	৩৮২৭৪৬০৪	৫০.০৩	"
১৯৮৪–৮৫	৩৩৬৩৫৭১৫	৫৩.০৪	"
১৯৮৫–৮৬	৩৮৩৬২৩০২	২৭.৩২	"

উৎস : বাংলাদেশ চা বোর্ড।

এই নিলাম ডাকার পর পাইকারদের অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে বর্তমানে কেজি প্রতি ৫.০০ টাকা সরকারী কর দিতে হয়।

আমাদের দেশে পাইকারেরা নিলামের পর খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে। তারা বিভিন্ন বাগানের চা বিভিন্ন দামে বিক্রয় করে। বর্তমানে প্রতি কেজি গড়ে ৬৫.০০ টাকা ধরে বিক্রয় করে।

বর্তমানে কয়েকটি বাগানের বিভিন্ন গ্রেডের পাইকারী চায়ের মূল্য দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১৩

দেশের বাজারে চায়ের পাইকারী মূল্য

বাগানের নাম	গ্রেড	মূল্য (প্রতি কেজি)	
খাদিম	পিডি	৬৩.০০	টাকা
সাতগাঁও	আর, ডি	৭০.০০	"
জগদিসপুর	আর, ডি	৬৫.০০	"
করিমপুর	পি, ডি	৬৪.০০	"
মির্জাপুর	বি, ও, পি	৬৮.০০	"
চণ্ডিসরা	বি, ও, পি	৬৭.০০	"
সাধন	ও, এফ	৫৬.০০	"
চাঁনবাগ	এফ, পি	৬৫.০০	"
মঁনিপুরা	এফ, পি	৬৫.০০	"

সূত্র ঃ হিল টপ টি হাউজ

আভ্যন্তরীণ বণ্টন প্রণালী ঃ চা উৎপাদনের পর মালিকগণ নিলাম কেন্দ্রে পাঠায়। এখান থেকে পাইকারেরা ক্রয় করে থাকে। তারপর পাইকারের নিকট থেকে খুচরা কারবারীর নিকট বিক্রয় করে। খুচরা কারবারীরা মুদির দোকান ও ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে। খুচরা কারবারীরা গড়ে কেজি প্রতি ৮০.০০ টাকা ধরে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে।

চায়ের আন্তর্জাতিক বাজার

বাংলাদেশ পৃথিবীর মোট রপ্তানির প্রায় ৩ ভাগ চা রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালে ৩০,০০০ মেট্রিক টন চা বিদেশে রপ্তানি করেছে। যা পৃথিবীর ৮ম রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে নিম্নলিখিত দেশগুলো চা সংগ্রহ করে থাকে। পাকিস্তান, মিশর, ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়, পোলাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড, ইরান, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশসমূহ। ১৪ নং তালিকায় বাংলাদেশ থেকে চা রপ্তানির পরিমাণ, রপ্তানি আয় ও কেজি প্রতি রপ্তানি মূল্য দেখানো হলো।

তালিকা – ১৪

চা-এর রপ্তানি আয়

বর্ণনা	৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭ আনুমানিক
রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন কেজি)	২৩.৮৮	২৯.৭৯	৩১.৩২	৩০.৮১	৩০.৭৮	২৫.৮৫	২৯.৮২	২৩.৪৯
মোট রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)	৫১.০০	৬৬.৪৮	৭৬.০৩	১০৯.৬৪	১৬৯.০৯	১৫৭.৭৩	৯৭.৩১	১০২.০০
প্রতি কেজি চায়ের গড় (রপ্তানি মূল্য টাকায়)	২১.৩৬	২২.৩২	২৪.২৮	৩৫.৫৯	৫৫.০১	৬১.০২	৩২.৬৩	৪৩.৪২

উৎস ঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

বাংলাদেশ প্রতি মাসেই কিছু না কিছু চা রপ্তানি করে থাকে। ১৫ নং তালিকায় মাসিক ভিত্তিতে চা রপ্তানির পরিমাণ এবং মূল্য দেয়া হলো ঃ

তালিকা – ১৫

চা রপ্তানী (মাসিক ভিত্তিতে)

মাস	রপ্তানি ১৯৮৪-৮৫		রপ্তানি ১৯৮৫-৮৬		রপ্তানি ১৯৮৬-৮৭	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
জুলাই	২৪৯	১৫৩৩২	৬২৬	২৪৭৩৮	৭১৭	২৮৯৫০
আগস্ট	১৬৯৭	১০৪৩৮৩	২৪০২	৭৮০৩৫	২৩০৮	১০২১৪৪
সেপ্টেম্বর	১৩৫৮	৮২৫১৮	২১৬০	৭৮৫৮৪	১৮০৭	৮৫৫৮৪
অক্টোবর	২৪১১	১৬৩৭০৩	৩২৪৭	১৩০৩৫৩	২৬৬৫	১১৭৩২৪
নভেম্বর	৫২৯৫	৩৫১০৯৯	৫০৪২	১৫৩৩৯৮	২৭৪৬	১১৩৭৭৪
ডিসেম্বর	১৩৮৬	৯৩৯৮৫	৩৩৩৫	১১১৭৪৫	৪৪২২	১৯৪১০৪
জানুয়ারী	৪৫১৫	২৮০২৮৩	৩৮৪৭	১০৪৭০২	২২০৫	৮৯২৩৬
ফেব্রুয়ারী	৯২৫	৬০৪৪৭	২৬৯৭	৯৯৪৭৯	১৩২৫	৬১৩২০
মার্চ	৩৪৬২	২০৫৩২৪	২৬৫৯	৮১১০১	১৫৯৯	৫৯২৬৮
এপ্রিল	১০০৯	৫৭৪২৬	২৮৫৫	৮৩৩৯২	৮৪৩	২৬৬০৩
মে	১৪৭৭	৬২১৩২	৫১৬	১১৬৯৩	৪৯৯	২১১৪২
জুন	২০৬৩	৮৩০৫১	৪৩৬	১৫৮৮০	৬৩	১৮৬৮
মোট	২৫৮৪৭	১৫,৬০,৬৮৩	২৯৮২২	৯,৭৩১০০	২১,৪০৯	৯০,১৩২১

উৎস : টি পলিসি ফর ১৯৮৭-৮৮।

বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত দেশ চা কিনে থাকে, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের চায়ের পরিমাণ, মূল্য এবং মোট রপ্তানির শতকরা হার ১৬ নং তালিকায় দেয়া হলো।

তালিকা – ১৬

বাংলাদেশের চায়ের বৈদেশিক ক্রেতা

দেশ	১৯৮৫-৮৬			১৯৮৬-৮৭		
	পরিমাণ	মূল্য	শতকরা হার	পরিমাণ	মূল্য	শতকরা হার
পাকিস্তান	১২৫৫৯	৩৪৩৮৫২	৪২.১১	৬৩৭৫	২৪৬১৮০	২৯.৭৮
মিসর	৪৪৮৭	১২০৪৭২	১৫.০৫	৩৩৪৪	১২৩৮৭৪	১৫.৬২
বৃটেন	২৯৬৫	১১৬৮৭২	৯.৯৪	৩৭৩৬	১৭৪৭৯৪	১৭.৪৫
অফগানিস্থান	১১৫৩	৫৪০৪১	৩.৮৭	৫১৩	২৫১৪১	২.৪০
রাশিয়া	২০০০	৮৭৩০৬	৬.৭১	২০০০	৯৫৬৩৫	৯.৩৭
পোলাণ্ড	১৬৯৭	৬২৯১	৫.৬৯	১২৪	৪৮৩২	০.৫৮
চেকোসলাভিয়া	৮৭	৩২৪১	০.২৯	৭২	৩০৭২	০.৩৪
পঃ জার্মানী	৪১৪	১৩০৮৯	১.৩৯	৩৭১	১৬৭৩৯	১.৭৩
বুলগেরিয়া	৬৬	৪১৫২	০.৩৩	৭৬	২৯১৩	০.৩৫
নিউজিল্যাণ্ড	৯	২৮৭	০.০৩	—	—	—
ইরান	৩৪০	১৫২৪০	১.১৪	৮৭৯	৩৮১৮০	৪.১১
সৌদি আরব	১৮৩	৪২৫১	০.৬০	৬১	৪০৪২	০.২৮
সিঙ্গাপুর	২৩	৮২০	০.০৮	১০৪৩	৪৩৬৩৭	৪.৮৭

উৎস : টি পলিসি ফর ১৯৮৭-৮৮

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

আমাদের দেশে অতীতে চা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা ও অসম বাজারের ফলে চা এর বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির পরিমাণ কম ছিল। চা উৎপাদনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উৎপাদন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন লণ্ডনে চা কেন্দ্র স্থাপন, চা রোপণ এবং পুনঃরোপণের মাধ্যমে পুনর্বাসন উৎপাদন কার্যক্রমের শনাক্তকরণ ইত্যাদির ফলে উৎপাদন

আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৯-৯০ সালে চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫২.১৬ মিলিয়ন কেজি ধরা হয়েছে। যা ১৯৮৪-৮৫ সালে ছিল ৪৩.৯১ মিলিয়ন কেজি। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর পর ১৯৮৯-৯০ সালে চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৩৪ মিলিয়ন কেজি ধরা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে চা রপ্তানির মূল্য ১৫৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৯-৯০ সালে ১৯০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে।

তালিকা -১৭

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চায়ের উৎপাদন, মূল্য ও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা।

বর্ণনা	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৯-৯০
উৎপাদন	৪৩.৯১ (মিঃ কেজি)	৫২.১৬ (মিঃ কেজি)
রপ্তানি	২৫.৯ (মিঃ কেজি)	৩৪.০০ (মিঃ কেজি)
মূল্য	১৫৬ (কোটি টাকা)	১৯০ (কোটি টাকা)

উৎস ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

চা বাজারজাতকরণের সমস্যা

বাংলাদেশে চা বাজারজাতকরণে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত সমস্যার কারণে সুষ্ঠুভাবে চা বাজারজাতকরণ করা যায় না। যে সব কারণে বাজারজাতকরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহা নিম্নে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

১. অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদন হ্রাস

বাংলাদেশে চায়ের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হয়, যদিও চা চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। যদি কোন বৎসর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই বেশি বা কম হয় তবে সেই বছর চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় যদি আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ স্থির থাকে তবে রপ্তানির পরিমাণ কমে যাবে, ফলে রপ্তানি আয় কমবে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণে প্রতিকূল সৃষ্টি হবে।

২. উৎপাদন খরচ

আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন খরচ খুব বেশি হয়। ফলে চা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এক বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে একর প্রতি চা উৎপাদনের খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি হওয়াতে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। কারণ উৎপাদন করচ বেশি হওয়াতে আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য প্রতিযোগীদের সাথে মূল্যের প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে চা বাজারজাতকরণের জন্য আমাদের দেশের সরকার প্রচুর ভর্তুকী দিতে হয়। কারণ আমাদের দেশের সরকার এই ভর্তুকীর মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের চায়ের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের বাজারজাতকরণের নানা প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে।

৩. অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা

চায়ের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হলো উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপস্থিতি। কিন্তু আমাদের দেশে অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য চায়ের বাজারজাতকরণের ব্যয় বেশি হয়। তাছাড়া চা উৎপাদন করার পর ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর জন্য যে ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন তা আমাদের দেশে খুবই কম। আমাদের দেশে সাধারণত চা পরিবহণের জন্য ট্রাক, রেলওয়ে, লঞ্চ, ঠেলা গাড়ি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে চা বাজারজাতকরণে অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা বিশেষ করে রেলওয়ের ওয়াগনের স্বল্পতা, অতিরিক্ত পরিবহণ ভাড়া, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে চা পাঠানো সম্ভব হয় না এই অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার কারণে। কারণ আমাদের দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। রাস্তা, ঘাট, পরিবহণের সংখ্যা খুবই কম থাকার কারণে সঠিক সময়ে চা বাজারজাত করা যায় না। ফলে পরিবহণ ব্যয় বেশি হয়।

৪. চা বাক্সের অপ্রতুল সরবরাহ

চা উৎপাদন করার পর আর্দ্র আবহাওয়া তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বলে সতর্কভাবে প্যাকিং করতে হয়। তাছারা ভাল প্যাকিং না হলে দূরদুরান্তে প্রেরণকালে চা এর গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। চট্টগ্রাম নিলাম বাজারে কিংবা বিদেশী বাজারে পাঠানোর পূর্বে ভালভাবে চা পাতা বিশেষ ধরনের নির্মিত কাঠের বাক্সে প্যাকিং করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় এমনভাবে প্যাকিং করা হয় যা চা বাজারজাতকরণে মোটেই উপযুক্ত নয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে চায়ের মান নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে সাধারণত পাতলা কাঠের বাক্সের মধ্যে চা মোড়কজাত করা হয়। তাছাড়া অনেক সময় এই বাক্সে অভাবে সঠিক সময়ে প্যাকিং করা হয় না। আবার এই সমস্ত বাক্সের মূল্য অত্যধিক।

৫. গুদামঘরের অভাব

চা বাজারজাতকরণে গুদামঘর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ চা উৎপাদন করার পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত গুদামঘরে করে রাখতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গুদামের অভাবে চা করে রাখা যায় না। যদিও কিছু কিছু গুদাম আছে যা চা করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই গুদামঘর চা বাজারজাতকরণে একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত।

৬. গ্রেডিং-এর সমস্যা

বাংলাদেশে যে চা উৎপাদন হয় তার সঠিক গ্রেডিং করা হয় না। যা বাজারজাতকরণে একটি মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে যে চা উৎপন্ন হয় বাগান ভেদে এর মান তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। একই বাগানের চায়ের মান এক এক সময় ভিন্ন ধরনের হয়। ফলে সেই অনুযায়ী চায়ের মান নির্ধারণ করা খুবই কষ্ট সাধ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে তা আসলে সেই গ্রেডের নয়। আমাদের দেশে যারা গ্রেডিং করে তারা খুব একটা দক্ষ নয়। অনেক সময় চায়ের মান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। ফলে বাজারজাতকরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৭. মিশ্রণজনিত সমস্যা

চা বাজারজাত করার পূর্বে উপযুক্ত স্বাদ এবং গন্ধের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর চা পাতা মিশ্রণ করে নিতে হয়। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চা মিশ্রণ করা হয়। চা মিশ্রণের জন্য বাংলাদেশে যে ব্লেণ্ডার রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। এই অপর্যাপ্ততার জন্য বাংলাদেশের চা বাজারজাতকরণের আরেকটি অন্যতম সমস্যা। আমাদের দেশের মিশ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রকার পাতাকে মিশ্রিত করে যে চা তৈরি করে তা সঠিক মান বজায় থাকে না। এটাও বাজারজাতকরণের একটি সমস্যা।

৮. অস্থিতিশীল বাজার মূল্য

সকল কৃষিজ পণ্যের মতোই বাংলাদেশে চায়ের মূল্যও প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। ফলে ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীরা উভয় পক্ষই অসুবিধার সম্মখীন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারেও একই কারণে মূল্যর ওঠা নামা হয় বলে চায়ের বাজার যেমন অস্থিতিশীল তেমনি এই পণ্যের বাজারজাতকরণে মূল্য নিয়ন্ত্রণ খুব একটা কাজে দেয় না। তবে এতে ব্যবসায়ীরা কোন সময় যেমন অপ্রত্যাশিত লোকসান দেয় তেমনি আবার কখনো কখনো তারা আশাতীতভাবে লাভও করে থাকে।

চা বাজারজাতকরণের সমস্যা সমাধানের কতিপয় সুপারিশ

চা বাজারজাতকরণের বহুবিদ সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার কারণে আমাদের দেশে চা সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করা যায় না। এই সমস্ত সমস্যা থাকার ফলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে। কারণ বিদেশের বাজারে আমাদের চায়ের চাহিদা কমে যাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তাই এখন থেকে এই সমস্যাগুলো তাড়াতাড়ি সমাধা করা দরকার। যে সকল উপায়ে সমস্যা সমাধা করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. বাগানের উন্নয়ন

আমাদের চা বাগানগুলো বেশ পুরানো এবং গাছগুলো বেশ রুগ্ন অবস্থায় আছে। কাজেই আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন কম হয় এবং নিকৃষ্টমানের হয়। তাই এই বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করতে হবে।

চা বাগানের আয়তন বৃদ্ধি।

পুনঃআবাদের প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

প্রয়োজনীয় সারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা ইত্যাদির মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২. উত্তম বিক্রয় পদ্ধতি

বিদেশে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজনে উত্তম বিক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশের চা নিম্নমানের জন্য বাজারজাতকরণে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ আমাদের দেশে অনুপযুক্ত মৃত্তিকার কারণে সুগন্ধযুক্ত চা উৎপাদন করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু তার জন্য বসে থাকলে চলবে না। আমাদের দেশের চায়ের সুগন্ধ না থাকলেও চমৎকার রং আছে। আর এই রং –এর জন্যই বিদেশীরা আমাদের চা পছন্দ করে। এই সুযোগটুকু পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য উত্তম বিক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ উত্তম বিক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমেই ক্রেতাদিগকে ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. প্যাকিং –এর উন্নয়ন

চায়ের জন্য যে ভাবে প্যাকিং করা হয় তা মোটেই আন্তর্জাতিকমানের নয়। অদক্ষভাবে মোড়কজাত করার ফলে অনেক সময় চা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া বাক্সের অভাবে সঠিক সময়ে

মোড়কজাত করা সম্ভব হয় না। এজন্যে সঠিক সময়ে চা মোড়কজাত করার জন্য বাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. গুদাম ব্যবস্থার উন্নয়ন

আমাদের দেশের গুদামগুলো বেশ পুরানো এবং মান্দাতার আমলের। অনেক সময় এই সমস্ত গুদামে মজুদ করার ফলে চায়ের মান নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই বর্তমানে গুদামের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন -এর জন্য জোর দিতে হবে।

৫. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বাংলাদেশে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন অপরিহার্য। বিশেষ করে আমাদের দেশের চা বাগান এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা অপরিহার্য। কারণ আমাদের দেশে পরিবহণ যানের সংখ্যা খুবই কম। তাই ট্রাক, রেলওয়ের বগী, জাহাজ বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে যথাসময়ে পরিবহণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে চা পৌছানো যায়। তাছাড়া আমাদের দেশের রাস্তা, ঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত করা দরকার। সারা বছর যাতে নদী পথে চলাচল করতে পারি সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৬. মূল্য স্থিতিশীলতা

চায়ের মূল্য স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে হবে। যাতে ঘন ঘন মূল্য উঠা-নামা না করে সেই দিকে জোর দিতে হবে।

৭. চা মিশ্রণ পদ্ধতি উন্নয়ন

চা বাজারজাতকরণের পূর্বে পাতা মিশ্রণ বা ব্লেনডিং করে নিতে হয়। বাংলাদেশে মিশ্রণ পদ্ধতি খুবই অনুন্নতমানের এই জন্য চা বাজারজাত করার জন্য মিশ্রণ পদ্ধতির উন্নয়নসাধন অপরিহার্য।

৮. সরকারী উদ্যোগে বিদেশে অধিক পরিমাণে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারকে চা শিল্পের জন্য সুষ্ঠুনীতি প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া চা বোর্ডকে বাজারজাতকরণের ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপরিউক্ত কৌশলগুলো অনুসরণ করলেই চা শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মৎস্য

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এ কথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। মাছ শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের প্রত্যহ খাদ্য তালিকার অবিচ্ছেদ্য অংশই নয় বরং এটা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করে থাকে। যেহেতু মাছ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে সেহেতু মাছের দক্ষ বাজারজাতকরণ কার্য সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। উৎপাদন যতই হোক তা যদি সঠিকভাবে, সঠিক পরিমাণে, সঠিক জায়গায় এবং সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা না হয় তবে প্রকৃত দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক গতিবেগ সঞ্চার করার জন্য কৃষিজাত মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিপণন, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জলাধার মিলিয়ে মোট মৎস্য এলাকার পরিমাণ ৬,৪০,০০০ একর। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ১,১৪০ বর্গ মাইলেরও বেশি এলাকা। এইসব মৎস্য এলাকায় ২৫০ রকমের মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮০ লক্ষেরও বেশি লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছের উপর নির্ভরশীল। মাছের বাৎসরিক মোট উৎপাদন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টন ও মোট রফতানী আয় প্রায় ৩ কোটি টাকা। বর্তমান কৃষিখাত থেকে প্রাপ্ত জি. ডি. পি'র ৬ ভাগ আসছে মৎস্য সম্পদ থেকে।

বন্টন প্রণালী

মৎস্যের বন্টন প্রণালীতে তেমন কোন জটিলতা নেই। শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের বন্টন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কারণ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন নদী–নালা, খাল-বিল, পুকুর-কূয়া, হাওড়, বাধ, জলাশয় ইত্যাদি স্থান থেকে জেলেরা মাছ শিকার করার পর তাদের কাছাকাছি স্থানীয় হাট বা বাজারে বিক্রয় করে। ফলে গ্রামের ভোক্তারা জেলেদের কাছ থেকে সরাসরি মাছ ক্রয় করে। এখানে শূন্য লেভেল চ্যানেল ব্যবহৃত হয়ে বন্টন কার্য সমাধা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, জেলেরা পেশাদার মাছ বিক্রেতাদের নিকট সংগৃহীত মাছ বিক্রি করে দেয়। পরে ঐ পেশাদার মাছ বিক্রেতারা প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট পৌঁছায়। এখানে চ্যানেলের অবস্থা এক লেভেল। শহরাঞ্চলে মাছের বন্টন প্রণালীতে ৩ লেভেল চ্যানেল ব্যবহৃত হয়। যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো। বহু মধ্যস্থকারবারী মৎস্য বিপণনে নিয়োজিত রয়েছেন। সাধারণভাবে মহাজন, মালিক, আড়তদার মৎস্যের মূল উৎস ক্ষেত্রগুলো হতে বিভিন্নভাবে ৬০% মৎস্য সংগ্রহ করে এবং এ ছাড়াও ধীবরগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোগকারীদের নিকট প্রায় ৭% এবং খুচরা বিক্রয়কারীদের নিকট প্রায় ১২% বিক্রয় করে।

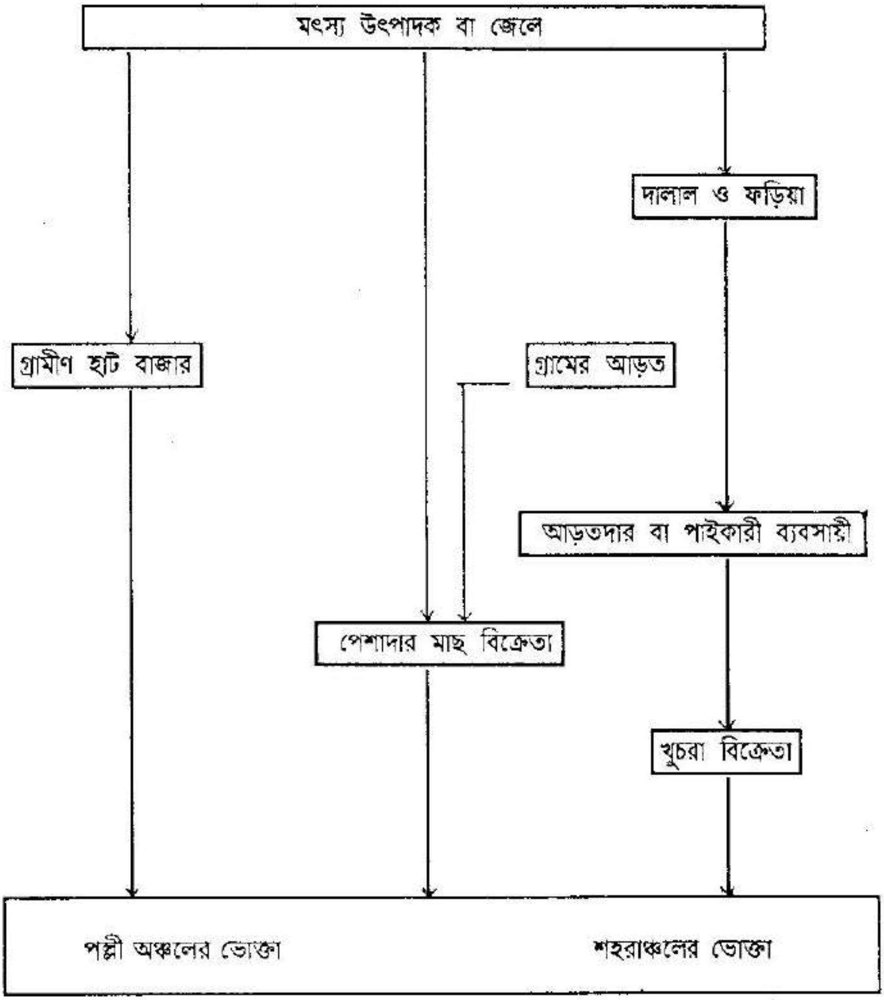

চিত্র ঃ ১ মৎস্যের বন্টনপ্রণালী

তাছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি. এফ. ডি. সি.) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে থাকে এবং কিছু মৎস্য আভ্যন্তরীণ মৎস্য সংগ্রহকারীদের নিকট হতেও ক্রয় করে থাকে। বি. এফ. ডি. সি. কর্তৃক ট্রলারে ধৃত মাছ চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে সংরক্ষণ করা হয়। সেখান হতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয়। চট্টগ্রাম হতে ফিসভ্যান বা পরিবহণ ভ্যানের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ ও বিতরণ প্রকল্প পাগলাতে পাঠানো হয়। পাগলা প্রকল্পে মাছ গুদামজাত করার পর সেটা খুচরা বিক্রয়ের জন্য কাওরান বাজার মৎস্য বিক্রয় উপকেন্দ্রের

মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্যান ও রিক্সা ভ্যানে (কমিশন ভিত্তিক) শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করা হয়। কাপ্তাই হ্রদ হতে প্রাপ্ত সরকারী ও বেসরকারী উৎস হতে সংগৃহীত মাছ ফিসভ্যান বা যন্ত্রচালিত নৌকার মাধ্যমে পাগলায় আনা হয় এবং সেখান হতে উল্লেখিত একই পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়।

২নং চিত্রের মাধ্যমে বি. এফ. ডি. সি'র মৎস্য বণ্টন পদ্ধতি দেখানো হলো ঃ

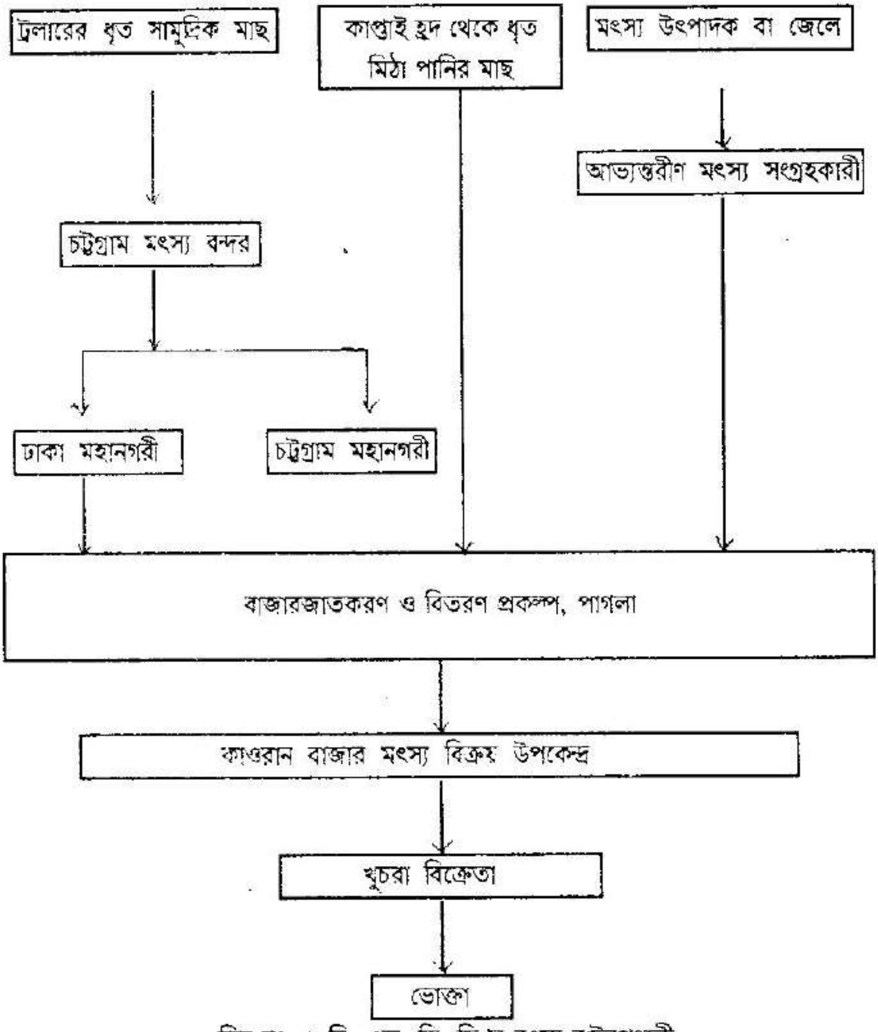

চিত্র নং –২ বি. এফ. ডি. সি.'র বৎস্য বন্টনপ্রণালী

এছাড়াও বাংলাদেশ মৎস্য সমবায় সমিতি নিজস্ব পরিচালনায় কিঞ্চিত পরিমাণে (প্রায় ২৫%) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে। সমবায় সমিতিসমূহ এবং সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন শুধু বিদেশের বাজারে মৎস্য বিক্রয় করে। বাংলাদেশে মৎস্য বাজারজাতকরণের প্রথম হতে শেষ পর্যায়ে মোট চার ধরনের বাজার পরিলক্ষিত হয়। যেমন, প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, হাইয়ার সেকেণ্ডারী এবং চূড়ান্ত মার্কেট। প্রতিষ্ঠানগত দিক দিয়ে মহাজন এবং পাইকাররা খুচরা বিক্রেতা ও অন্যান্যদের তুলনায় খুব বেশি ঝুঁকি বহন করে। তাছাড়া আড়তদারগণ বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। সামগ্রিক বিপণন কর্মকাণ্ডে এদের স্থান এবং ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারীভাবে কিছু ব্যবসায়ী ও প্রসেসিং ফার্ম হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য এবং শুটকী রপ্তানি করে। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যে মান থাকা উচিত সেই মান সর্বদা বজায় রাখতে পারছে না। এতে করে ব্যাপক চাহিদা থাকাসত্ত্বেও মাছ প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা হারাতে হচ্ছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ সরবরাহ এবং বৈদেশিক সরবরাহের দিকগুলোয় ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবদান রাখছে। লক্ষ্য করা যায় যে, আভ্যন্তরীণ সরবরাহের ক্ষেত্রে বা আভ্যন্তরীণ বন্টন প্রণালীতে মধ্যস্থ কারবারীগণ প্রায় সবটাই বাজারজাত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে সামান্য ভূমিকা থাকলেও সমবায় সমিতির কোন ভূমিকা নেই। বাজারজাতকরণের খরচের দিক বিবেচনা করলে মৎস্য সংস্থাকে বেসরকারী সংস্থাগুলোর তুলনায় আকাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন বলে ধরা যায় না। যদিও বর্তমানে এদের দক্ষতা কিঞ্চিত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে নজির পাওয়া যায়। তবে সামুদ্রিক মৎস্যকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের গুরুত্ব শুধু ব্যবসায়িক দিকই নয় সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে এর সেবামূলক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সরবরাহ ও মূল্য

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রলারে ধৃত মাছ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা মৎস্য অবতরণ ঘাটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোট উৎপাদিত মৎস্যের প্রায় ৯৫% বাজারে আসে বাকী ৫% উৎপাদকের ব্যবহারে আসে, চোরা পথে সীমান্তের ওপারে চলে যায় এবং কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় বা পচে যায়। বাজারে আনীত মৎস্যের মধ্যে ৮০% তাজা এবং ১৫% শুটকী ও লবণাক্ত। বাজারে সরবরাহকৃত মোট মৎস্যের প্রায় ৮৯% গ্রামাঞ্চলে, ১০% শহরে এবং ১% বৈদেশিক বাজারে স্থান পায়। গ্রামের চেয়ে শহরে মোট যোগানের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বলে কোন না কোন কারণে স্বাভাবিক সরবরাহ হঠাৎ হ্রাস পেলে বা বিঘ্নিত কিংবা বিলম্বিত হলে ঐ সব এলাকায় মৎস্যের মূল্য আনুপাতিক হারের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ হ্রাস পেয়েছে। এদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্যের চাহিদা বৃদ্ধি

পেয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে ভাল মাছের কথা দূরে থাক এক বেলা প্রতিদিন ছোট মাছও তাদের পক্ষে জোটানো সম্ভব হচ্ছে না। তা'ছাড়া মূল্য তো উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছেই।

ঢাকার পাইকারী বাজারে প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের মাছ আসে। এসবের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, চিতল, কই, মাগুর, শৈল, বাইন, ফলি ইত্যাদি মিঠা পানির মাছ। এছাড়া মিঠা পানির কিছু বিদেশী জাতের মাছ যেমন তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ও তেলাপিয়া মোজাম্বিকা ইত্যাদি বাজারে আসে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ক্যাটফিস, জাটিনা, রূপচান্দা, ভেটকী ইত্যাদিও বাজারে সরবরাহ করা হয়। তা'ছাড়া বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ ইলিশ মাছ বাজারে আসে।

নিম্নে ঢাকার পাইকারী বাজারে সরবরাহকৃত মৎস্যের হিসাব দেখানো হলো (তালিকা-১)

তালিকা – ১
ঢাকার পাইকারী বাজারে মৎস্যের সরবরাহ

অর্থ বৎসর	পরিমাণ
১৯৭৭–৭৮	২১৬১ টন
১৯৭৮–৭৯	১৯১৩ টন
১৯৭৯–৮০	২৪৪৩ টন
১৯৮০–৮১	৩১০২ টন
১৯৮১–৮২	২৯৮১ টন
১৯৮২–৮৩	২৮৬১ টন
১৯৮৩–৮৪	৩১৬১ টন
১৯৮৪–৮৫	২৮১০ টন
১৯৮৫–৮৬	২৯০০ টন
১৯৮৬–৮৭	২৯২০ টন

উৎস ঃ সোয়ারীঘাট মৎস্যের আড়তদার সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত

তালিকা-১ এ ছকে দেখা যায় যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে মৎস্যের সরবরাহ ছিল ২১৬১ টন; কিন্তু তার পরের বৎসর মৎস্যের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়ে ১৯১৩ টনে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, ঐ বৎসর মৎস্যের সরবরাহ কম থাকার ফলে মূল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে পর পর দুবছর আবার মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে চাহিদার সাথে সরবরাহের মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যতা আসে। কিন্তু ১৯৮১-৮২ সালে আবার সরবরাহ হ্রাস পায় এবং পরবর্তী বৎসরগুলোতে সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শহরের গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছের চাহিদা মেটানোটা একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্তরা কিছু চাহিদা মেটালেও মাছ গরীব মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এছাড়াও মাছের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাছের গা-পচা রোগ দেখা দেয়। এবং সেই রোগের ফলে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এ কারণে শহরে মাছের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং মাংসের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। মাছের উপর চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে স্বভাবতই মাছের সরবরাহ কিছুটা কমে গেছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে, চাহিদা কমে গেলেও মাছের মূল্য সেই পূর্বের মতই রয়ে গেছে। কিন্তু মৎস্যজীবীরা সব সময়ই অভয় দিচ্ছে যে, গা-পচা রোগে আক্রান্ত কোন মাছই শহরে প্রবেশ করছে না।

তালিকা - ২ঃ ঢাকার মৎস্যের (সোয়ারী ঘাট) পাইকারী বাজারে সরবরাহকৃত বিভিন্ন জাতের মৎস্যের মাসিক হিসাব

অর্থ বৎসর	মাসের নাম	বিভিন্ন জাতের মৎস্যের নাম ও পরিমাণ (মণ হিসাবে)											
		ইলিশ	চিংড়ি	মাগুর	শিং	কই	তেলাপিয়া	রুই	কাতলা	রূপচাঁদা	মৃগেল	পাঙ্গাস ও আইড়	অন্যান্য
১৯৮৪-৮৫	জুলাই	১,৫৬০	১,৪৪০	৫৯০	৬৫০	৩৪০	৪৫০	৮৮০	৪৩০	২৬০	৫৮০	১,১৬০	১,৩১০
	আগস্ট	১,৪১০	১,১৫০	৪৩০	৫৬০	২২০	৩৩০	৫৮০	৩৭০	১৮০	২২০	৮৮০	১,২২০
	সেপ্টেম্বর	২,১০৫	১,০৪০	৩০০	৪০০	২১০	৫১১	৪১০	২১০	১৭৫	১১০	৫৭৫	১,৫১০
	অক্টোবর	২,২০০	১,২০৮	২১০	৫১০	২০০	৪৭০	৩৮০	২৫০	২০৫	১৭৫	৫৬০	১,৩১৫
	নভেম্বর	১,৪৫০	১,১৬৭	৩৭৫	৪৭৫	২৬০	৩৭০	৪৯০	১১০	২০০	১১০	৪৬০	২,০১০
	ডিসেম্বর	১,২১০	১,০৭৫	৪১০	৫৬০	৪১০	৩৭৫	৬১০	৫১০	২১০	২০৯	৪১০	২,০৫১
	জানুয়ারী	১,০১০	৯৫০	৫৫০	৬৭৫	৬২৫	৪১০	৭১০	৬৭৫	১১০	৩৭৫	৩১০	১,৭১০
	ফেব্রুয়ারী	৯২৫	৮১০	৬৭০	৭৭৫	৭১০	৪০৫	৯২৫	৭১৫	২০৫	৪১০	৪১৫	১,৬২০
	মার্চ	৮৭৫	৭৭০	৬৭৫	৮০০	৭৭৫	৩৭৫	১,০৫০	৬২৫	২১০	৪৭৫	২০০	১,৪৭৫
	এপ্রিল	৭৮০	৬৮০	৬১০	৭৭৫	৬৯০	৩৭০	১,০৭৫	৭৭৫	৩১০	৫৫০	৩১০	১,৫০৫
	মে	৮০০	৭৭৫	৫৭৫	৫৫০	৪০৫	৪১০	৭৮০	৫৭৫	২০৫	৩২৫	৪১০	১,৬৭০
	জুন	৯৭৫	৮১০	৩১৫	৪২৫	৩৭৫	৪২৫	৫১০	৪০০	১৯০	১৯০	৫৫০	১,২৭৫
১৯৮৫-৮৬	জুলাই	১,০৬০	৮৮০	৪১০	৩৭৫	২৯০	২৭৫	৪১৫	২৭৫	১১০	১২৫	৬১০	১,৯৫০
	আগস্ট	১,৪২৫	৯১০	৪১৫	৩৫০	২১০	৩১৫	৪০৫	২১০	১৩০	১০৫	৬৭৫	১,২৮০
	সেপ্টেম্বর	৩,৫২৫	৮৫০	৪২৫	৪৫০	২৯০	৪১০	২১০	১৭৫	২০০	২১০	৭২৫	১,৪৫০
	অক্টোবর	৪,০১০	১,০৭৫	৩২০	৩২৫	১১০	৫০০	১৭৫	১৭৫	২২৫	৯০	৬১০	১,১২০
	নভেম্বর	১,০১০	৯৭০	৪১৫	৫৭৫	৬৭৫	২৭৫	১৫০	১২৫	১১০	১০০	২৫০	১,০৪০
	ডিসেম্বর	৯৮০	৭৫০	৬৮০	৫৮০	৬৯০	২১০	২৫০	২২০	৯০	২১০	১৭০	১,৫৬০
	জানুয়ারী	৮৫০	৭৭৫	৬৭৫	৭২০	৮০০	২১০	৬১০	৪৫০	২৫	৫০০	২০০	১,৬২০
	ফেব্রুয়ারী	৮১০	৮০৫	৬১০	৭৭৫	৬৯০	২৫০	৭৭৫	৫৭৫	১৭	৫১০	২৭৫	১,৩৭০
	মার্চ	৮৫০	৬১০	৬১৫	৬০৫	৬৭৫	২৭০	৮২৫	৭৭৫	২০	৫৭৫	২১০	১,৫২০

উৎসঃ সোয়ারী ঘাট মৎস্য আড়তদার সমবায় সমিতি হতে গৃহীত।

তালিকা-২ অনুযায়ী দেখা যায় যে, সোয়ারী ঘাটে প্রধানত ১১ রকমের মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে। এর মধ্যে ইলিশের সরবরাহ সবচেয়ে বেশি এবং ইলিশের পরই চিংড়ি মাছ। এরপর অন্যান্য যেমন—মাগুর, শিং, রুই, তেলাপিয়া, কই, কাতলা, রূপচান্দা, মৃগেল, পাঙ্গাস, আইড় ইত্যাদি মাছ সরবরাহ হয়। চার্টে দেখা যাচ্ছে যে, সেপ্টেম্বর মাসে ইলিশ এবং জুলাই মাসে চিংড়ি, পাঙ্গাস ও আইড় মাছের সরবরাহ খুব বেশি। কিন্তু মাগুর, কই, শিং ইত্যাদি মাছের সরবরাহ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে ইলিশ এবং চিংড়ি মাছের সরবরাহ সেপ্টেম্বর ও জুলাই মাসে কেন বেশি। কারণ ঐ মাসে বর্ষাকাল থাকে এবং এই মাছ বর্ষাকালে প্রচুর ধরা পড়ে। বিশেষত চিংড়ি মাছ বর্ষায় প্রচুর পাওয়া যায়। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা পরিবার তাদের আসেপাশে, ভাঙ্গা কালবার্ট বা পুলের নীচে, শুধুমাত্র চিংড়ি মাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনের ফাঁদ পাতে। গ্রামের ভাষায় এটাকে বইচনা বলা হয়। এই ফাঁদে প্রচুর পরিমাণ চিংড়ি প্রত্যেক দিন পাওয়া যায়। যেহেতু গ্রামের বেশির ভাগ লোকই গরীব সেহেতু তারা ঐ মাছ আসে পাশের মাছের আড়তে বিক্রয় করে দেয়। এ জন্যই সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

কই, শিং, মাগুর, রুই ইত্যাদি মাছ বর্ষাকালে খুব একটা পাওয়া যায় না। কারণ ঐ সমস্ত মাছ গ্রামের খোলা পুকুর, খাল ইত্যাদি জায়গায় নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে যখন বর্ষাকাল শেষ হয় তখন পানি শুকিয়ে যায় এবং মাছগুলো পুকুর, খাল ইত্যাদি জায়গায় আটকা পড়ে। পরে গ্রীষ্মের সময় জেলে দিয়ে পুকুরের মাছ ধরা হয় এবং বাজারে বিক্রয় করা হয়। ঐ সময় যে মাছ ধরানো হয় তার মধ্যে কই, শিং, মাগুর, পুটি, রুই এবং বিভিন্ন রকমের ছোট মাছ থাকে। তাই তালিকায় দেখা যায় যে, মার্চ মাসে এদের সরবরাহ বেশি। জুলাই মাসে ইলিশের সরবরাহ ১৫৬০ মণ এবং চিংড়ির সরবরাহ ১৪৪০ মণ। কিন্তু মার্চ মাসে ইলিশের সরবরাহ ৮৭৫ মণ এবং চিংড়ির সরবরাহ ৭৭০ মণ। দেখা যায় যে ইলিশের সরবরাহ ৬৮৫ মণ এবং চিংড়ির সরবরাহ ৬৭০ মণই কম। পক্ষান্তরে জুলাই মাসে মাগুর, শিং, কই মাছের সরবরাহ যথাক্রমে ৫৯০, ৬৫০ ও ৩৪০ মণ এবং মার্চ মাসে ৬৭০, ৭৭৫ ও ৭১০ মণ। দেখা যায় যে, মার্চ মাস থেকে জুলাই মাসে সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮০, ১২৫ ও ৩৭০ মণ। তেলাপিয়া, রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ সাধারণত পুকুরে চাষ করা হয়। তাই এই সমস্ত মাছের সরবরাহ খুব একটা তারতম্য থাকে না। তবে তালিকায় দেখা যায় যে, মার্চ, এপ্রিলে এদের সরবরাহ বেশি।

মার্চ, এপ্রিলে রুই মাছের সরবরাহ ১০৫০ ও ৬২৫ এবং কাতলা মাছের সরবরাহ ৬২৫ ও ৭৭৫। এখন বলা যায়, কেন সরবরাহ বেশি? কারণ বর্ষার মৌসুমে পুকুরে অনেক সময় বেশি পানি হলে ডুবে যায়। তাই মৎস্য চাষীরা বর্ষার পূর্বেই গ্রীষ্মকালে মাছ বেশিরভাগ ধরে ফেলে এবং বাজারে পাঠায়। ফলে ঐ সমস্ত মাসে সরবরাহ বেশি থাকে। এছাড়া অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের সরবরাহে প্রত্যেক মাসে তেমন একটা তারতম্য দেখা যায় না। তবে ১২ মাসের মধ্যে সবচেয়ে যে মাসে মাছের সরবরাহ বেশি সেই মাসটা হলো—অক্টোবর এবং সবচেয়ে কম হয় মার্চ মাসে।

তালিকা - ৩ঃ ঢাকার মৎস্যের (সোয়ারী ঘাট) পাইকারী বাজারে সরবরাহকৃত ১৯৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের দৈনিক হিসাব

মৎস্যের নাম	তারিখ ও পরিমাণ (মণ হিসাবে)																													
	১লা	২রা	৩রা	৪ঠা	৫ই	৬ই	৭ই	৮ই	৯ই	১০ই	১১ই	১২ই	১৩ই	১৪ই	১৫ই	১৬ই	১৭ই	১৮ই	১৯শে	২০শে	২১শে	২২শে	২৩শে	২৪শে	২৫শে	২৬শে	২৭শে	২৮শে	২৯শে	৩০শে
ইলিশ	১২০	১৫১	১২৫	১২৫	১১৫	১১৭	১১০	১৩০	১২৭	১৪০	১৫১	১৪৫	১২৮	১৩০	১২০	১১৭	১১০	১৫০	১২০	১০২	১০৫	১৪০	১৫১	১৫১	১৭০	১০৫	১২৭	১২০	১৫০	১৫৫
চিংড়ি	২২	২৫	২০	১৭	২৪	২৮	৩০	২২	২৪	২৭	২২	২৮	৩০	৩৫	২৫	২৮	২২	২০	২১	২৩	২৫	২৬	২৮	৩৫	২৬	২৭	৩১	৩৫	২১	২৩
মাগুর	১৫	১৪	১০	২০	২২	১৩	১৬	১৮	১০	১১	১৩	১৮	২০	১০	২২	১৪	৯	৫	৩	১১	১৮	১৬	২০	১৮	১৯	২২	১৯	২৪	১৭	২১
শিং	১৭	২২	১০	১৫	২১	১১	১৩	১২	১৭	১৯	২৭	২১	২০	২১	১৮	১০	১১	১২	৯	৮	১৫	১৭	১২	১০	১৮	১০	২১	২১	২০	২১
কই	৭	৫	২	৪	৫	৬	৭	৯	৩	৭	৫	৪	৩	২	৫	২	৭	৮	৯	৫	১০	১১	১০	৯	৮	৫	৪	৩	৭	৯
তেলাপিয়া	১৪	১৫	১০	১১	২১	২৫	১৭	১৭	১৮	২১	১৩	১৫	১৭	২১	২২	১৮	১২	১৭	১৪	৯	১৮	২৩	২৫	১৫	১০	১২	১৭	২২	২১	১৯
রুই কাতলা ও মৃগেল	১৬	১৯	২০	১৮	২২	২০	২১	১৭	১৬	১৮	১৫	২২	২৩	২৮	১৭	২১	২২	২৭	১৬	১৪	১৭	১৯	২২	২৪	১৬	১৯	১৮	১৫	১৪	১৯
পাঙ্গাস ও আইড়	২২	২৬	৩১	৩০	২৮	২৮	২২	১৪	২২	৩৫	২৮	২৭	২২	২৫	২২	২৭	২৯	২১	২০	২৫	২৬	২৪	২২	২০	১৫	১৭	২২	২০	২৭	২৮
সামুদ্রিক	৩১	২২	১৬	১৫	১৭	২৮	২২	১১	১৩	১৫	১৬	১৪	১৫	১২	২১	২৩	২২	২৭	২৫	১৬	২০	২৬	২৯	২২	২৮	২০	১৫	২৬	২৭	৩৫
অন্যান্য	৫১	৫৬	৪০	৪২	৪৪	৫৫	৬১	৫৬	৫৮	৫৯	৬০	৫৭	৪৭	৫২	৬৮	৫৫	৫৩	৫১	৪১	৪৮	৪৪	৫২	৪৯	৫০	৫৭	৪৪	৪৭	৪৯	৫২	৫০

উৎসঃ সোয়ারীঘাট মৎস্য আড়তদার সমবায় সমিতি হতে গৃহীত

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘাটসমূহে ইলিশ মাছ অবতরণের একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

তালিকা – ৪

বিভিন্ন ঘাটে ইলিশ মাছের সরবরাহ

বৎসর	চাঁদপুর ঘাট	গোয়ালন্দ ঘাট	খুলনা	বরিশাল	ঢাকার পাইকারী বাজার	নারায়নগঞ্জের পাইকারী বাজার	চট্টগ্রাম	মোট
১৯৭২	১১,৭২৯	৯২১	২,০৯৫	৯,২১৬	—*	—	১০০	২৪,০৬১
১৯৭৩	১৩,৩৪১	১২,০১৪	৩,০৮৮	১০,৪৮২	—	—	২৩১	৩৯,১৫৬
১৯৭৪	১০,৪৭৪	২,৪৩৫	১,৯২৩	৮,২৩৩	—	—	৪৮৩	২৩,৫৪২
১৯৭৫	১৬,০০৮	৩,৫৬৪	৩,৬৯৮	১২,৬৬৭	—	—	১,০৭৬	৩৭,০১৪
১৯৭৬	৫,০৭৭	২,৯৬০	১,৮১৪	৪,৬১১	১,৭৭২	৭০০	১,৫৫৩	১৮,৪৮৭
১৯৭৭	৪,৫৬৪	২,৪২৪	১,৪০৯	৩,৫৮২	২,৫১৭	৯৯৫	২,৫০০	১৭,৯৯৫
১৯৭৮	৭,৩৯৩	৩,৯৭৭	১,১৭৪	৫,১২০	৪,২৮৫	২,১১৮	৪,০০০	২৮,০৭২
১৯৭৯	৭,৪২৪	৩,২০৯	৬৮৯	৪,৪৮৬	৩,৭৭৯	১,৮৩৪	৫,১২৩	২৬,৫৪১
১৯৮০	৬,২৬৯	৩,১০১	৯৩২	৫,৭১০	৬,৭০৫	২,৯৫২	৫,৭৮৩	৩১,৪৫৩
১৯৮১	৮,৬৩২	৪,৪২৬	১,০৪৯	৬,৮৪৪	১৪,১৯০	৬,১৭৭	৭,৪৮৫	৪৮৮০৬
১৯৮২	৯,৬০১	৫,৯৭৩	—	—	—	—	৯,৩৬৯	—
১৯৮৩	৯,৯২১	৪,৫২০	—	—	—	—	১৩,০৫২	—

* তথ্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র ঃ Melvin Investigation of the hilsa Fishary of Bangladesh, 1984

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ঢাকার পাগলায়, মংলা এবং অন্যান্য ল্যান্ডিং স্থলে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ঐ সব স্থান থেকে বিভিন্ন স্থানে মৎস্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ঢাকার পাগলায় এ জন্য একটি ফিস রিফ্রিজারেটর কমপ্লেক্স

স্থাপন করা হয়। এছাড়া রাজশাহীতে একটি সাব সেন্টার এবং উপকূলীয় মৎস্য চাষীদের সুবিধার্থে পাথর ঘাটা এবং খেপু পাড়ায় মৎস্য বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

বিপণন ব্যয় পদ্ধতি ও দক্ষতা

বাজার মূল্য, যোগানের স্বল্পতা, বিক্ষিপ্তভাবে মৎস্যের অবস্থান, নিম্ন ক্রয় ক্ষমতা, প্রযুক্তি বিক্রয়, তীব্র ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনা করলে বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবসায়ীদের দক্ষতা আশা করা যায় না। একটি গবেষণার রিপোর্টে দেখা গেছে যে, মৎস্যের মধ্যস্থকারবারী খুচরা মূল্যের ২৫% লাভ পেয়ে থাকে। তারা সে পরিশ্রম করে তাতে এ লাভ পরিশ্রমের তুলনায় অনেক কম। তাদের লাভের একটা বিরাট অংশ আড়তদারী সার্ভিস, পরিবহণ ও বরফজাতকরণে ব্যয় হয়। তাছাড়া ঝুঁকি গ্রহণ বাবদ বাজার, ব্যক্তিগত খরচ, খাজনা, চাঁদা ইত্যাদি ব্যয় হয়। অর্থাৎ তাদের মোট ব্যয় খুচরা মূল্যের ২০% এর কিছু বেশি। বেশিরভাগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অভাবে প্রচুর পরিমাণ মাছ নষ্ট হয় তবে মূলধনের অভাব, পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নত, হিমাগারের অভাব, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যা মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে মৎস্য বাজারজতকরণ দক্ষতা অর্জনে বাঁধার সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করা গেছে যে, নির্ধারিত কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ৩০% সংগ্রহকারী নৌকা মৌসুমের সময় প্রয়োজনীয় সরবরাহের অভাবে বসে থাকে। গড়ে প্রায় ৫০% সংগ্রহকারী নৌযানের তাপ নিরোধক খোলের ব্যবস্থা আছে এবং ৪০% নৌযান তাপ নিরোধক বাক্সের অপর্যাপ্ত যোগানের কারণে অব্যবহৃত অবস্থায় বসে থাকে।

মধ্যস্থ কারবারী মূলধনের অভাবে বেশি পরিমাণ মাছ জড়ো করতে পারে না। ফলে কম পরিমাণ মাছের জন্য বেশি টাকা খরচ করে হিমাগার ভাড়া নিতে হয়। অথচ আরো বেশি পরিমাণ মাছের জন্য ঐ একই খরচ স্থির অবস্থান করতো। তাতে দেখা যায় যে, একক প্রতি খরচ তাদের অনেক বেশি। তাই বেশি পরিমাণে বেশি সময়ের জন্য সংরক্ষণ করলে বা হিমাগারে রাখলে একক প্রতি খরচ কমে যায়।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিপণন ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে করা হয় এবং এর পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। কারণ তাদের নিজস্ব ট্রলার, পরিবহণ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ এবং সর্বোপরি নিজস্ব দায়িত্বে বন্টন ব্যবস্থা তাদের বিপণন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাসে সাহায্য করছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়নগঞ্জে মৎস্য বাজারজাতকরণ

বি, এফ, ডি, সি, রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের জনগণের মধ্যে নিয়মিত মাছ সরবরাহ করে আসছে। ঐ স্থানগুলোতে সামুদ্রিক মাছ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সংস্থা রাজধানীতে ৩১টি স্থায়ী স্টলের মাধ্যমে এবং ৩৬টি বিদেশী ভ্যানের মাধ্যমে প্রতিদিন মাছ বিক্রয় করছে। তাছাড়া রিক্সা ভ্যান দ্বারা প্রত্যেক দোকানে মাছ পৌছে দিচ্ছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম মৎস্য হারবারে প্রতিদিন অকশনের মাধ্যমে স্থানীয় জেলে এবং মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাছ বেচা-কেনা করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে মৎস্য বিক্রয়ের জন্য ৭টি স্থায়ী স্টল এবং ১০টি রিক্সা ভ্যান রয়েছে। খুলনা ও রাজশাহীতে শীঘ্রই ন্যায্য মূল্যে মাছ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মৎস্য বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধান

১. গুদামজাতকরণ

ঢাকার সোয়ারীঘাটে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোন হিমাগার নাই। ফলে প্রায়ই প্রচুর মাছ সংরক্ষণের অভাবে পঁচে যায়। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে বাহির হতে বরফ সংগ্রহ করে ট্রলারের ভিতরই মৎস্য সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া এই লোকসান পোষাণের জন্য তাদের বেশি দামে মাছ বিক্রয় করতে হয়। কিন্তু হিমাগারের ব্যবস্থা থাকলে ভোক্তাদের বেশি মূল্য দিতে হতো না। তাই মৎস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক মৎস্য হিমাগার সরকারীভাবে স্থাপন করতে হবে।

২. জেটি নির্মাণ

সোয়ারী ঘাটে মৎস্য নামানোর জন্য কোন জেটি নেই। ফলে মৎস্য উঠানো-নামানোর জন্য সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য অনেক সময় মাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আধুনিক জেটি নির্মাণ আশু প্রয়োজন।

৩. পরিবহণ ব্যবস্থার অসুবিধা

সাধারণত মৎস্য পচনশীল। তাই ভোক্তাদের নিকট মৎস্য ধরার পর পরই পৌছানো দরকার বাংলাদেশে মন্থরগতি সম্পন্ন রিক্সা ভ্যান দ্বারা মৎস্য পৌছানো হয়। কিন্তু এই সমস্ত রিক্সা ভ্যানে তাপ নিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে পথেই অনেক মাছ নষ্ট হয়ে যায়। আর রাস্তাও অনেক অনুন্নত। তাই রাস্তা নির্মাণ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পুঁজি সংস্থানের অভাব

সাধারণত নিজস্ব টাকায় মৎস্য আড়তদারদের নিকট থেকে ক্রয় করতে হয়। মাঝে মাঝে খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে বাকিতে মৎস্য সরবরাহ করতে হয়। অনেক সময় অর্থের অভাবে মৎস্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত পাইকারদের আর্থিক সাহায্যদানের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে অনেক ব্যবসায়ীকে ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয় মাঝে মাঝে। তাই মৎস্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পুঁজি সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. নিলাম ঘরের অভাব

মৎস্য নিলামে ক্রয়-বিক্রয় হয় বেশি। আর তা খোলা আকাশের নিচে হয়ে থাকে। ফলে বৃষ্টি বাদলের সময় মৎস্য ক্রয়-বিক্রয় অনেকটা বন্ধ থাকে আবার অবিক্রিত মৎস্য পচেও যায়। তাই নিলম ঘর নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৬. বরফ কলের অভাব

পাইকারী বাজার সোয়ারী ঘাটের কাছাকাছি কোন বরফ কল নেই। ফলে পাইকারদের দূর থেকে বরফ সংগ্রহ করে মৎস্য সংরক্ষণ করতে হয়। এতে বিপণন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ভোক্তাদেরকে অধিক মূল্যে মৎস্য ক্রয় করতে হয়। তাই মৎস্য বিপণন কেন্দ্রের কাছাকাছি বরফ কল নির্মাণ করতে হবে।

৭. পুলিশী তৎপরতা

মৎস্য বিপণন কেন্দ্রে সংগৃহীত মৎস্য বিভিন্ন জেলাসমূহ হতে আসে। আর ট্রলারে কিংবা যাত্রীবাহী লঞ্চে মৎস্য আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় থামিয়ে পুলিশ বড় বড় অঙ্কের টাকা দাবি করে থাকে। যেহেতু ঐ সমস্ত যানে তাপ নিরোধের কোন ব্যবস্থা থাকে না এবং মৎস্য পচনশীল হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সেই সমস্ত দাবি পূরণ করে। আবার পথেও ট্রাক থামিয়ে এই নির্যাতন করে থাকে। ফলে এ সমস্ত ক্ষতি পোষাণোর জন্য তারা মাছের মূল্য বেশি নির্ধারণ করে। আর ভোক্তাদের সেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই সরকারীভাবে অপ্রয়োজনীয় পুলিশী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

৮. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দুষ্প্রাপ্যতা

মৎস্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে নাই। ফলে তাদের ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই সরকারীভাবে মৎস্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৯. অযৌক্তিক চাঁদা প্রদান

পাইকারী ব্যবসায়ীদেরকে বিভিন্ন সময় দেশের রাজনৈতিক সংগঠন, ঈশ্বরবৃত্তি ইত্যাদি কারণে চাঁদা দিতে হয়। ফলে তারা মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে। তাই সরকারীভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই চাঁদা তোলা বন্ধ করতে হবে।

১০. অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ/প্যাকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশের পাইকারী ব্যবসায়ীরা বাঁশের ঝুড়ির ভিতর কিছু বরফ দিয়ে বা না দিয়ে মৎস্য প্যাকিং করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পাঠায়। ফলে মৎস্যের প্রকৃত চেহারা নষ্ট হয়ে যায় এবং মূল্য হ্রাস পায়। তাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই প্যাকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. যোগান ও চাহিদার ব্যাপারে পাইকারদের অজ্ঞতা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মৎস্য পাইকারী ব্যবসায়ীরা অশিক্ষিত। ফলে বাজারে কত পরিমাণের চাহিদা রয়েছে এবং কি পরিমাণ মৎস্যের যোগান দিতে হবে তা তারা বোঝে না। ফলে অনেক সময় চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়ে যায় এবং মূল্য কমে যায়। এতে ব্যবসায়ী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যোগান ও চাহিদা সম্বন্ধে অজ্ঞ পাইকারদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে মৎস্য বাজারজাতকরণের একটি সমস্যা হচ্ছে মাছের মড়ক। ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী নাগাদ গা–পচা রোগে আক্রান্ত মাছ বাজারে উঠতে থাকে এবং মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত এই মাছ গ্রহণের ব্যাপারে জনগণের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। পরে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় যে এই মাছ রান্না করার পর খাওয়ায় কোন অসুবিধা নাই।

প্রায় ৫ বৎসর আগে হল্যাণ্ডে এ ধরনের রোগ দেখা দিয়েছিল। সে রোগই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ঘুরে বছর তিনেক আগে বার্মায় এসে উপস্থিত হয়। তখন কোন কোন মহল হতে নাকি বাংলাদেশকেও সতর্ক করা হয়েছিল। রোগাক্রান্ত মাছ মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর কি না এ সম্পর্কে নানা সংশয় বিদ্যমান। উপযুক্ত পরীক্ষা ভিন্ন এ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে ভাইরাস সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা যায়, এতে অংকোভাইরাস ভিন্ন কোন ভাইরাস জীবাণুই আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে না। বিশেষজ্ঞের মতে রান্না করা মাছ খাওয়ায় বিপদের আশঙ্কা নেই। বিপদ দেখা দিতে পারে অন্যভাবে। তাহলো কাটা কাটির সময়। মাছ কাটার সময় ভাইরাস হাতে লাগতে পারে। সে হাত মুখে দিলে মানুষের আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। মাছ কাটার সময় ছিটকে মুখে লাগে আবার অনেক সময় মহিলারা হাত কাপড়ে ঘষে পানের খিলি মুখে দেন। এর ফলে মাছের দেহ হতে ভাইরাস মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে। জেনেসিস জাতীয় রোগের সংখ্যা প্রায় দেড়'শ। জেনেসিস জাতীয় রোগ হচ্ছে সে সব রোগ যা মানব দেহ হতে পশুর দেহে এবং পশুর দেহ হতে মানব দেহে সংক্রামিত হয়। উন্নত দেশগুলোতে তাই পরীক্ষা না করে কোন মাছ মাংস বিক্রি করা হয় না। সে সব দেশে পশু চিকিৎসকরা এ দায়িত্ব পালন করেন। এর কারণ কোন কোন মুরগীর কলিজাতেও এক ধরনের ভাইরাস আছে।

আমাদের দেশেও এ ধরনের দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু লোক আছেন কিন্তু দায়িত্ব তারা পালন করেন না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মৎস্য ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এর উপর রোগ যদি দেখা দেয় তাহলে পরিণতি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর অনুমেয় বলেই বিষয়টি হাল্কাভাবে গ্রহণ করা চলে না। বিশেষজ্ঞদের মতে ভাইরাসের প্রকৃতি নির্ণয় করার মত কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। ময়মনসিংহস্থ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে ইপিজোটিক আলসারেটিভ সিনড্রম বা ক্ষত রোগে মাছ আক্রান্ত হচ্ছে। সাধারণত পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই এই ধরনের রোগের উদ্ভব হয়। তবে বিজ্ঞানীরা এ রোগে আক্রান্ত মাছ হতে ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও ভাইরাস জাতীয় রোগ জীবাণু পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, এই পণ্যের প্রকৃতিগত পচনশীলতা, সবরাহের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা এবং ব্যাপক এলাকায় ক্ষুদ্রাকারের বিস্তৃতি এবং অন্যদিকে পণ্য বাজারজাতকরণে বিপণন সার্ভিসের সুযোগ সুবিধার অভাব মৎস্য বিপণন দক্ষতাকে প্রভাবান্বিত করে। প্রচুর মূলধন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবজনিত কারণে অতি দ্রুত এবং বিস্ময়কর উন্নতি আনয়ন করা কঠিন বলে মনে হয়, কিছু উন্নতি আনয়ন অবশ্যই সম্ভব। যেমন মৎস্য ঘাটে পৌছানোর পর পরই ধৌতকরণ, বরফ বা পানি ব্যবহার, প্যাকিং ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ এবং সুশৃঙ্খলবিধি ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ, বিপণন চ্যানেলের প্রতি পর্যায়ে পর্যাপ্ত যত্ন এবং সাবধানতা অবলম্বন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নাড়িভুড়ি পরিষ্কার করে বিপণন পথে মৎস্য প্রেরণ, মৎস্যের উচ্ছিষ্টকে বিশেষ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে কাজে লাগানো ইত্যাদি দ্বারা অবচয় রোধ এবং বিপণন ব্যবস্থাকে দক্ষ করা যেতে পারে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং সুষ্ঠু এবং নিয়মিত বাজার তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে মৎস্যের বিপণন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করতে না পারলে বিপণন ব্যয় হ্রাস করা, সার্ভিসের মান উন্নয়ন করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সুপরিকল্পিত সুসমন্বিত ব্যাপক ও বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষ ও উন্মুক্ত জলাশয়গুলোর যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং একই সঙ্গে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের জন্য সঠিক স্থানে/সময়ে/পরিমাণে বিপণনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। সর্ব বৃহৎ এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে জনবহুল মার্কেটে মৎস্যের সামগ্রিক মূল্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মন্দা বাজার পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত মৎস্য হিমাগারে তুলে রাখা এবং সীমিত যোগানের সময়ে বাজারে ছেড়ে দেবার জন্য এবং বিশেষ করে শিল্প বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য যেমন– হিমাগার, জেটি নির্মাণ, গবেষণা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ব্যাপারে মৎস্য সংস্থাকে সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মসলা

ভূমিকাঃ মসলা অতীতে ছিল অবহেলিত, কোন রকম গবেষণাতো দূরের কথা, দেশের অর্থনীতিতে মসলা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তা ৫/৬ বৎসর আগেও কেউ চিন্তা করেনি। মসলা জাতীয় আয়ে বিশেষ অবদান রাখছে, সৃষ্টি করছে নতুন নতুন জীবিকা অর্জনের পথ, বৈদেশিক মুদ্রা আয়েও অবদান রাখছে প্রচুর, আর সবচেয়ে বড় যে কাজটি করছে, তা হচ্ছে আমাদের খাবার তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এদেশের গৃহবধূরা মসলা ছাড়া খাবার তৈরির কথা চিন্তা করতে পারেন না।

মসলা চাষের প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশের জলবায়ুতে সাধারণত তিন ঋতু প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ঃ (ক) গ্রীষ্ম– এই ঋতুর স্থায়ীত্ব মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত এবং এই সময় মোটামুটি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। (খ) বর্ষা– সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করে এবং এই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় ; (গ) শীত– মোটামুটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই সময়ের বিস্তৃতি।

এদেশের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের মসলা বিশেষ করে পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক। আদা এবং হলুদ চাষ করা হয় মার্চ থেকে মে এই সময়ে এবং চাষীরা ফসল তোলে নভেম্বর—মার্চ এই সময়ের মধ্যে। মরিচ বৎসরে দুইবার চাষ করা হয়। প্রথমবার অক্টোবর—নভেম্বর থেকে জানুয়ারী—মার্চ মৌসুমে এবং দ্বিতীয়বার মার্চ–এপ্রিল থেকে জুন–আগস্ট মৌসুমে। অন্যান্য তিনটি মসলা– রসুন, ধনিয়া এবং পিয়াজ রবি শস্য।

বাংলাদেশের ভূমি সাধারণত পলিমাটি সমৃদ্ধ। ফলে এই মাটিতে মসলা উৎপাদনে তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। প্রয়োজনীয় সার, পানি এবং উন্নত চাষাবাদের মাধ্যমে এই মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে মসলা উৎপাদন করা সম্ভব।

বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা

যদিও বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিভিন্ন ধরনের মসলা চাষের উপযোগী, তবুও মাত্র ১০ থেকে ১২ ধরনের মসলা এখানে উৎপাদিত হয়। তার মধ্যে মাত্র ছয় ধরনের মসলা যেমন পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ এবং ধনিয়ার খাদ্য হিসাবে অধিক চাহিদা থাকার কারণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য বলে এগুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি।

আমাদের দেশে উন্নত খাবার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে মসলা উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য খুবই সীমিত। কৃষকেরা যারা স্থানীয় জাতের মসলা আবাদ করছে, চাষাবাদ এখনো পুরানো ধরনের ; ফলে উৎপাদিত পণ্যের মান ও পরিমাণ আশানুরূপ নয়। নিচে বিভিন্ন মসলার উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হলো।

পিঁয়াজ

বাংলাদেশে পিয়াজ উগ্র স্বাদের জন্য ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয়। স্থানীয় জাতের পিয়াজ যদিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় তবুও গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাল থাকে।

পিয়াজ সাধারণত দুইভাবে উৎপাদিত হয়। প্রথমত বীজের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত বাল্ব এর মাধ্যমে। তবে প্রধানত বাল্ব এর মাধ্যমেই উৎপাদন করা হয়। বীজের মাধ্যমে উৎপাদন ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলে সীমিত, তবে রাজশাহীতে সীমিত আকারে বীজের মাধ্যমে পিয়াজ উৎপাদন করা হয় রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রায় ৭০% পিয়াজ চাষী তাদের ফসলের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে।

প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ অধিক পরিমাণ পিয়াজ উৎপাদনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দেখা গেছে যে, অর্ধেকেরও কম জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়। পোকামাকড় এবং গাছের অসুখ বর্তমানে তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করছে না। কিন্তু ফসল কাটার পর প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ অসুবিধার অভাবে চাষীদের ভুগতে হচ্ছে।

আদা

আদা সাধারণত রাইজোম থেকে উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন আদা থেকে কিছু পরিমাণ পরের মৌসুমের বীজ হিসাবে জমিয়ে রাখে। আদা মার্চ–মে মৌসুমে উৎপন্ন হয় বলে কিছুটা সেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ৮০% কৃষকই সেচের ব্যবস্থা করে না।

যদিও পচন আদার জন্য একটি অতি সাধারণ রোগ কিন্তু মাত্র ২০% কৃষক এই রোগের ঔষধ ব্যবহার করে। অর্ধেকেরও কমসংখ্যক কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। জৈবসার যেমন, খৈল এবং গরুর গোবর আলাদাভাবে কিংবা রাসায়নিক সারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করে।

হলুদ

হলুদ উৎপাদন করা হয় গাছের প্রধান মূলের গুড়ি ব্যবহার করে কিংবা হলুদের একটি বিশেষ অংশ ব্যবহার করে যা 'টারমারিক ফিঙ্গার' নামে পরিচিত। যদিও গুড়ি ব্যবহার করে বেশি ফলন পাওয়া যায়, তবুও কৃষকরা টারমারিক ফিঙ্গার ব্যবহার করে। কারণ এতে তাদের খরচ কম পড়ে।

অনেক সময় হলুদ সুপারি, আম কিংবা অন্য কোন ফলগাছের নীচে সারিবদ্ধভাবে চাষ করা হয়। মাত্র ৫০% কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। অন্যান্য মসলার মত অল্প কিছু কৃষক প্রয়োজনীয় সার হলুদ চাষে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ কৃষকই জৈব সার ব্যবহার করে। শতকরা ১৫ ভাগেরও কম হলুদ প্রয়োজনীয় সেচের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ মূলত বীজের গুণগতমান এবং পরিচর্চা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

রসুন

রসুন বাংলাদেশের অত্যন্ত নিম্নমানের বীজ, নিম্নমানের পরিচর্চা পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় এবং এই উৎপাদনে সীমিত পরিমাণে কিংবা মোটেই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। ২০% এর কম রসুন উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় সেচের মাধ্যমে। যেখানে অধিক ফলনের জন্য প্রচুর পানি সেচের প্রয়োজন। কারণ রসুন শীতকালে উৎপন্ন হয়। পোকামাকড় কিংবা রোগবালাই মাঠে কিংবা গুদামে রসুনের জন্য তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কৃষকরা সাধারণত রসুনের বিভক্তকৃত বাল্ব পরের মৌসুমের জন্য বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করে।

মরিচ

মোটামুটি সব কৃষকই নিজেদের ভোগের জন্য এবং কিছু বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মরিচ উৎপাদন করে। তবে বাণিজ্যিক উৎপাদন সীমিত রয়েছে বড় কৃষকদের মধ্যে, মরিচ সাধারণত কাঁচা এবং শুকনা দুইভাবে বাজারজাত করা হয়, তবে শুকনা মরিচ বৃহদায়কারে বেচাকেনা হয়। যদিও মরিচ গরম ও শীত দুই ঋতুতেই উৎপাদন হয়। কিন্তু ৮০% মরিচ উৎপাদন হয় শীত মৌসুমে।

চাষাবাদ পদ্ধতিতে কৃষকদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ নির্ভর করে মূলত চাষাবাদ পদ্ধতি এবং মরিচের বীজের মানের উপর।

বীজের মাধ্যমে বা গাছকে পুনঃরোপণের মাধ্যমে মরিচের উৎপাদন করা হয়। শীতকালে সাধারণত মরিচে সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সেচের সুবিধা না থাকায় বাণিজ্যিকভাবে মরিচের চাষাবাদের জন্য বিপজ্জনক। বেশিরভাগ কৃষকই প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করে।

ধনিয়া

ধনিয়া সাধারণত পাতা হিসাবে এবং এর বীজ আস্ত বা পাউডার দুইভাবে ব্যবহার করা হয়। ধনিয়ার বীজ ভাজা বাংলাদেশীদের কাছে সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে পরিচিত।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ধনিয়া অন্যান্য সীম বা মটর জাতীয় শস্যের সাথে উৎপাদিত হয়। এক সাথে উৎপাদিত হলে সীম মটর প্রভৃতির গুরুত্ব বেশি থাকে। মাত্র ২০% ফসল সেচের আওতায় আনা হয়। মাত্র ৫০% কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। কৃষকেরা মূলত গোবর, খৈল, ছাই প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। অতি পরিমাণে রোগ কিংবা পোকামাকড় ধনিয়া গাছ বা বীজের জন্য সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

প্রধান মসলা উৎপাদনকারী এলাকা

দেশের প্রায় সব জেলাতেই মসলা কম বেশি উৎপাদিত হয়। তবে পিয়াজ দেশের সব জায়গাতেই উৎপন্ন হলেও অন্যান্য মসলা কয়েকটি জেলাতেই বা তারও বেশি উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে মসলা উৎপাদনের তিনটি প্রধান এলাকা আছে। এইগুলো হচ্ছে (ক) রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ; (খ) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ; এবং (গ) ফরিদপুর জেলা। যদিও আরো অনেক জেলা আছে যেগুলো একটি বা একটির বেশি মসলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করে, যেমন, পাবনাতে হলুদ, বগুড়া এবং কুমিল্লাতে মরিচ, তবুও উপরিউক্ত তিনটি অঞ্চলই মসলা উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফরিদপুর জেলা একাই পিয়াজ, রসুন এবং ধনিয়া উৎপাদনে প্রথম পাঁচটি জেলার একটি। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আদা ও হলুদ উৎপাদনে প্রথম সারির উৎপাদক। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো মরিচ (রবি) ছাড়া অন্যান্য প্রধান মসলার মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% ভাগ উৎপাদন করে থাকে।

উৎপাদন

বাৎসরিক উৎপাদন বিভিন্ন মসলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের। আদা এবং হলুদের বাৎসরিক উৎপাদন ১% এবং ২% বাড়ছে। রবি মরিচ এবং রসুনের উৎপাদনে তেমন একটা উঠানামা ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৪-৮৫ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না (তালিকা-১)। অপর দিকে ধনিয়ার উৎপাদন বছরে ৩% হারে কমে যাচ্ছে। রসুন এবং বারো মেসে মরিচের বাৎসরিক উৎপাদন কমে যাচ্ছে ২% এবং ১% হারে।

অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মটর সীম প্রভৃতি ফসল ছাড়া, যেগুলোর উৎপাদন কমে যাচ্ছে ১৯৭৪-৮৪ মৌসুমে, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের চেয়ে মসলার বাৎসরিক উৎপাদন অনেক কম। এই সমস্ত শস্যের বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঃ

মটর সীম	(১%)
ধান	৩%
আলু	৩%
গম	৩০%
সরিষা	২%

আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে ১৯৭৪-৭৫ সালের চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ-এর চেয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালের চাষাবাদের আওতায় জমির পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। যার ফলে মসলার দাম বেড়ে যাচ্ছে।

উৎপাদন খরচ এবং কৃষকদের আয়

এখন পর্যন্ত গবেষণা এবং সার্ভে করে দেখা যাচ্ছে যে, আদা চাষ সবচেয়ে লাভজনক। এরপর পর্যায়ক্রমে রসুন, হলুদ এবং পিয়াজের নাম করা যায়। এই চার ধরনের মসলার একর প্রতি গড় আয় অন্যান্য রবিশস্য যেমন, আলু, ধান, সরিষা, ডাল এবং গমের একর প্রতি গড় আয়ের চেয়ে বেশি।

টেবিল – ১

বাংলাদেশে মসলার উৎপাদন ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮৩-৮৪ (টন)

মসলা	৭৫/৭৬	৭৬/৭৭	৭৭/৭৮	৭৮/৭৯	৭৯/৮০	৮০/৮১	৮১/৮২	৮২/৮৩	৮৩/৮৪
পিয়াজ	১৪৭,৬০৫	১৩৬,১৬০	১৪৫,৪১০	১৩৩,৩৮৫	১৩৯,৪১৫	৯৫০৮৫	১৪০,৪৮৫	১৩১,৫৬৫	১৩৫,৮৮৫
আদা	৩৫,১২০	৩৪,৬৩৫	৩৪,২৯৫	৩৬,৫০৫	৩৬,৭০৫	৩৩,৮৭৫	৩৮,৮৭৫	৪১,১৪৫	৩৮,৮১৫
হলুদ	২১,৪৩৫	২১,৯১৫	২২,৬৭৫	২৩,৯৯৫	২৪,০৩০	২৪,৬৫৫	২৪,৯২০	২৫,৫৮০	২৫,৭৬০
রসুন	৪১,৪৫০	৩৬,৮৮০	৪০,৮৮০	৩৮,৭৯০	৩৯,৭১৫	৩৬,৯০০	৪২,৪২৫	৪১,৭১৫	৪২,৮০৫
রবি মরিচ	৪৭,৭৫৫	৪০,৩৯০	৪৫,৪৬৫	৪৭,৩০৫	৪৪,২৭৫	৩৫,৭৬৫	৪২,২৬৫	৪০,২৪০	৪১,৯২০
মরিচ	৪৩৩০	৪০৭০	৪২৪৫	৪৪০৫	৪০৪৫	৩৮২৫	৪১৩৫	৪০০০	৪১০০
ধনিয়া	২৪৯৫	২২৬০	২৩৩০	২০০০	২০৪৫	১৯০৫	২২৯৫	২১৪০	----
মোট	৩০০,১৭০	২৭৭,৬১০	২৯৫,৩০০	২৮৬,৩৮৫	২৯০,২৩০	২০২,৫১০	২৯৫,০৬০	২৮৬,৩৯০	----

সূত্রঃ বি. এস. এস.

তবে উৎপাদন খরচ এবং নেট আয় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পিঁয়াজের সর্বনিম্ন গড় আয় একর প্রতি ৮৫ টাকা সর্বোচ্চ ২১,৩০০ টাকা (সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ)।

মসলা উৎপাদন অত্যন্ত লাভজনক, কিন্তু কিছু সমস্যা, যেমন বাজারজাতকরণ, পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব, প্রয়োজনীয় গ্রেডিং এর অভাব মসলা উৎপাদনকে সীমিত করেছে।

তালিকা-২

বাংলাদেশে একর প্রতি গড় আয়, মসলা ও অন্যান্য দ্রব্য, ১৯৮৪

ফসল	গড় আয় (টাকা/একর)	আওতা	
		সর্বনিম্ন আয়	সর্বোচ্চ আয়
মসলা			
আদা	১৯,০৯৮	১২,৬৭০	২৭,০০০
রসুন	১৫,৬৪৬	৫২৩৫	২৪,৮০০
হলুদ	১১,৯৫৭	৬৬৭৫	১৭,১৮০
পিঁয়াজ	১০৫৪৫	৮৫	২১,৩০০
মরিচ	৮২৪১	৭৯০	২০২২৫
ধনিয়া	১১১২	৯২৫	১৫০০
অন্যান্য ফসল			
আলু	৮,০৯৫	৮৩৩	১২৩৫৮
বোরো	৩,৩২৩	১৩৯২	৮৬০৫
সরিষা	২,৫৩৭	২৫৩	৩০২৪
ডাল	১৭৭০	১০৩৫	৩২৯৬
গম	১৩৪৯	০	১৮০৫

সূত্রঃ কৃষি বাজার বিভাগ

বাজারজাতকরণ এবং মূল্য

বাংলাদেশে মসলা বাজারজাতকরণ অবকাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ সংস্থার অভাব রয়েছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মসলা বাজারজাতকরণ এবং মসলার রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত এগুলোর সংখ্যা অত্যধিক।

স্থানীয় বাজারজাতকরণ

যদিও কিছু সমস্যা যেমন দক্ষ বাজারজাতকরণ অবকাঠামোর অভাবে শস্য বিনষ্ট হওয়া স্থানীয়ভাবে মসলা বাজারজাতকরণে দেখা যায়। তবুও অপেক্ষাকৃতভাবে স্থানীয় বাজারজাতকরণ পদ্ধতি কিছুটা দক্ষ। চিত্রে (১) মসলার উৎপাদন থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানোর প্রণালী দেখান হলো। স্থানীয় বাজারজাতকরণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত।

উৎপাদক

খামারে উৎপন্ন মসলা সাধারণত সরাসরি স্থানীয় বাজার বা মধ্যস্থ কারবারীর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। উৎপাদিত মসলা সাধারণত কাঁচা বা শুকিয়ে বিক্রি করা হয়।

মধ্যস্থ কারবারী

মধ্যস্থ কারবারীরা সাধারণত মসলা উৎপাদকের কাছ থেকে ফসল কাটার আগে বা ফসল কাটার সময় কিনে নেয়। প্রথম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদক অর্থনৈতিক কারণে তার ফসল কাটার আগেই বিক্রি করে দেয়, যা কখনোই তার কাছে পছন্দনীয় নয়। সাধারণত উৎপাদক ও মধ্যস্থ কারবারীর মধ্যে ফসলের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ বিক্রির একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী মধ্যস্থ কারবারী তার প্রাপ্য ফসল শস্য কাটার সময় নিয়ে যায়। যদিও এই পদ্ধতি সর্বত্রই প্রচলিত; পার্বত্য চট্টগ্রামে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক।

পাইকারী বিক্রেতা

মসলার বিপণনে পাইকারী বিক্রেতা তাদের ভাল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সংগঠিত কাঠামোর জন্য বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পাইকাররা এক সঙ্গে অনেক মধ্যস্থকারবারীর কাছ থেকে সরাসরি কিংবা তাদের প্রতিনিধি মধ্যস্থ কারবারীর সাহায্যে এ মসলা ক্রয় করে থাকে। পাইকারী বিক্রেতারা অনেক সময় নিজেরাই পণ্যের পরিবহণ এবং সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ খুচরা বিক্রি এবং পণ্য রপ্তানি প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণকারী (প্রসেসর)

বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে মসলা শুকনো, গুড়া করা, মেশান, প্যাকেজিং এবং বিতরণকে বুঝায়। প্রসেসর নিজেই পাইকারী ব্যবসায়ী হতে পারে। কিংবা প্রসেসর পাইকার বা মধ্যস্থকারবারীর কাছ থেকে কাঁচা মাল কিনে প্রসেস করে পাইকার, খুচরা বিক্রেতা বা রপ্তানিকারকদের কাছে প্রক্রিয়াজাতকরণ মসলা বিক্রি করে থাকে।

স্থানীয় বেশ কিছু ব্র্যাণ্ডের গুড়ো মসলা বাজারে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে টাইগার ব্যাণ্ড মসলা, বিউটি মসলা, চাঁদপুর মসলা এবং লাবণী মসলা ও অমৃত মসলা উল্লেখযোগ্য।

খুচরা বিক্রেতা

স্থানীয় বাজারে খুচরা বিক্রেতা অন্যান্য শাক-সব্জীর সঙ্গে কাঁচা মসলা বিক্রি করে। জেনারেল স্টোর বা ছোট মুদির দোকানে প্রক্রিয়াজাতকৃত মসলা পাওয়া যায়।

রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী

রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা রপ্তানির জন্য নিজেরাই পাইকারী বিক্রেতা বা প্রসেসরের কাছ থেকে আধা প্রক্রিয়াজাত বা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত মসলা কিনে থাকে। কিংবা আগেই বলা হয়েছে যে, তারা নিজেরাই পাইকারী বিক্রেতা বা প্রসেসর হতে পারে।

মসলা রপ্তানি

বিশ্ব বাজারে মসলা ব্যবসা দিন দিন জমে উঠছে এবং বর্তমানে এর পরিমাণ এক বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় মসলার উল্লেখযোগ্য চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে বিদেশী রন্ধনপ্রণালী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করায় আশা করা যাচ্ছে যে, মসলার চাহিদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার গণসংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত দেশগুলোর খাদ্যাভ্যাস ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর ফলে মসলার বাজার আরো জমে উঠবে বলে মনে হচ্ছে।

বাংলাদেশে রপ্তানি করার মত উদ্বৃত্ত মসলা রয়েছে। "বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন" রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত হিসাব করেছে বেশ কিছু মসলার জন্যে (তালিকা-৩)। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে মসলা রপ্তানির বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। প্রধান অসুবিধা হলো, মসলার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির নিমিত্তে কোন সু-চিন্তিত নীতি গ্রহণ করা হয়নি। কৃষকদের উদ্বৃত্ত মসলা উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করার কোন নীতি এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। ফলস্বরূপ উৎপাদকের সরবরাহ সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোন নীতি নয়, সরবরাহই আমাদের মসলা রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭২ সালে যখন কিছু মসলার দাম বেড়ে যায়, সরকার তখন মসলা রপ্তানির উপর কিছুটা নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর ফলে মসলার দাম কমে গেলেও, চাষীরা উৎপাদনে উৎসাহ হারায়। ১৯৮৪ সালে সরকার এই অবস্থা সংশোধনে কিছুটা

আগ্রহী হন এবং মরিচ, হলুদ প্রভৃতির উপর আংশিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। টি. সি. বি. কে সরকার প্রথমে গুড়া মরিচ এবং পড়ে ১৯৮৪ সালে হলুদ রপ্তানি করার দায়িত্ব প্রদান করেন। তবে পিঁয়াজ ও রসুনের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। তালিকা-৪ এ মসলা থেকে রপ্তানি আয় দেখানো হয়েছে।

মূল্য

ফসল কাটার মৌসুম ও অন্যান্য সময়ে মসলার মূল্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। ফসল কাটার সময় সর্বনিম্ন এবং অন্য সময়ে সর্বোচ্চ মূল্য লক্ষ্য করা যায়। মূল্যে এই বিভিন্নতা নির্ভর করে (১) পণ্যের পচনশীলতার উপর (২) সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থা, (৩) কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, (৪) মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যা।

তালিকা-৫ এ মসলার পাইকারী মূল্য এবং তালিকা-৬ এ মসলার খুচরা মূল্য দেখান হয়েছে। এছাড়া উৎপাদক, মধ্যস্থ কারবারী, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতার মধ্যে দামের যে হেরফের হচ্ছে তাও দেখানো হলো (তালিকা-৭)

মসলার বন্টন প্রণালী

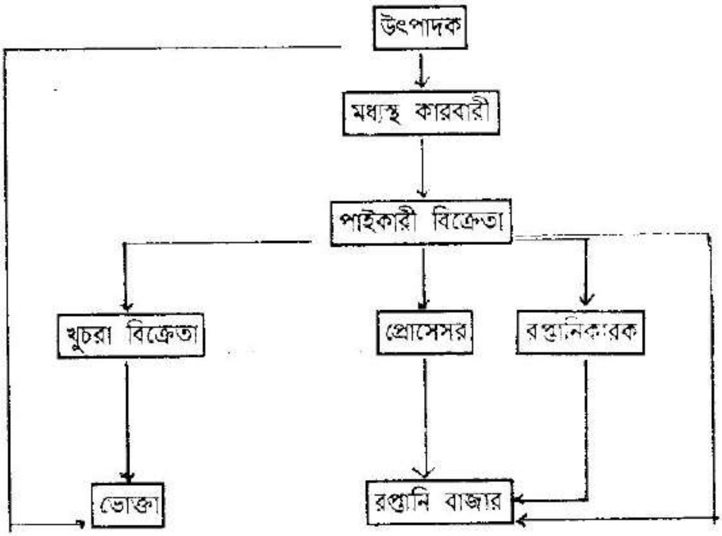

চিত্রঃ ১ বাংলাদেশে মসলা বাজারজাতকরণ নেটওয়ার্ক

তালিকা - ৪

বাংলাদেশ থেকে মসলা রপ্তানি, ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৩-৮৪ (০০০ টাকা)

মসলা	১৯৭৪/৭৫	১৯৭৫/৭৬	১৯৭৬/৭৭	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৮/৭৯	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪
আদা	১২৯৫	১২০৪	৫৭০৫	৪৫২	১২৭৮	৩৪১	২৯৬	২৪৮	৯৯৭	—
কাল জিরা	—	—	—	—	—	৩৮১	১৯	—	৩৪	—
মরিচ	৯৮০	২৪৬০৬	৪২৯৮	৪২৩৯	১৩০৯	৩৩৩	১৯	—	—	—
হলুদ	২২৪	৭৬	৫১৪	২৪৬১	৩৩৮	—	৫০	—	—	—
ধনিয়া	—	৩৩০	৯০৭২	২৬	২৬৯৪	৭৮১	—	—	—	—
রসুন	—	—	—	৭৩৪	১১৭৪	৪৪৬	৩৯২	১৬৮	৩৭৫	২৯০
মসলা	—	—	৪৫	৪৬৪	১৯০৯	১৩৫৫	১১৮৫	১৪৯৪	২১৯৯	২১৯
মোট	২৪৯৯	২৬২৫৬	১৯৬৩৪	৮৩৭৬	৯০৮৩	৩২৪৫	১৯৪২	১৯১০	৩৬০৫	১৫৮৯

সূত্র কৃষিবাজার বিভাগ

তালিকা – ৩
রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত মসলা ১৯৮১

মসলা	রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত (টন)
পিয়াজ	——
আদা	১০,০০০
হলুদ	১,০০০
রসুন	২,০০০
মরিচ	৫০০
ধনিয়া	৩,০০০

সূত্র ঃ কৃষিবাজার বিভাগ

তালিকা – ৫
মসলার পাইকারী মূল্য, ১৯৭৩–৮৫

(টাকা/মণ)

অর্থ বছর	পিয়াজ	আদা	হলুদ	রসুন	শুকনা মরিচ	ধনিয়া
১৯৭৩	৪৮	৬৮	১১৮	৮০	১৬৫	৮৩
১৯৭৪	৯২	১৯৫	২৫০	২০৫	১১৫৩	২৭৪
১৯৭৫	৯৬	৩৪০	২৪২	২৪২	৮৪২	২৮৫
১৯৭৬	৫২	২১০	২১০	২৪০	৪৪১	১৭৫
১৯৭৭	১৪০	১৯০	৩৭০	১৮৪	৮০০	২২৫
১৯৭৮	৮৫	১৪২	৬৭৫	১৫৮	৭২৪	১৮২
১৯৭৯	১৬০	৩০৫	৪৯৫	১৩৯	৩৮৮	১৩১
১৯৮০	১০৪	৪৩০	৩৭০	২৬৬	৬৫১	১৫৬
১৯৮১	৩২৮	৬৪১	৩৯১	৪৯১	১১০৯	৪১২
১৯৮২	২০৫	৫০৯	৩৯৪	৫০৪	৬৫২	৪৫৪
১৯৮৩	১৯২	৩৪৪	৮৮৭	৩৯৪	৮০৭	৩০৭
১৯৮৪	২০৮	৩৬৪	১৪৮১	২০২	১৪৪৯	২৭৭
১৯৮৫	২৪১	৩৫৭	১৫২৫	৩৮৬	৮৬০	৩৮৬

সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ

তালিকা - ৬

ফসল কাটার মৌসুম ও অফসিজনে মসলার খুচরা দাম (ঢাকার বাজারে)

মসলা	ফসল কাটার মৌসুম	অফসিজন (বাজার)
পিয়াজ	২.৫০–৩.০০	১১.০০–১২.০০
আদা	৩.০০–৪.০০	১৬.০০–১৮.০০
হলুদ (প্রক্রিয়াজাতকৃত)	১২.০০–১৬.০০	৪০.০০–৪৫.০০
মরিচ (শুকনা)	২০.০০–২৫.০০	৪০.০০–৪৫.০০
রসুন	৪.০০–৫.০০	১৬.০০–২০.০০
ধনিয়া (বীজ)	৫.০০–৬.০০	১০.০০–১২.০০

সূত্রঃ এ, এস, টি সার্ভে, ১৯৮৪।

তালিকা - ৭

বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মসলার মূল্য (টাকা/কেজি)

বিভিন্ন ধাপ	পিঁয়াজ	আদা	হলুদ		মরিচ	রসুন	ধনিয়া (বীজ)
উৎপাদনক	২.৫০–৩.০০	৩.০০–৪.০০	১২.০০–১৬.০০		০.৭৫–১.০০	৪.০০	৫.০০
মধ্যস্থকারবারী	৪.৫০	৭.০০	৩৫.০০	সবুজ	২.০০	৫.০০	৬.০০
				শুকনা	১৮.০০		
পাইকার	৫.০০	১০.০০	৪০.০০	সবুজ	৩.০০	৭.৫০	৮.০০
				শুকনা	২০.০০		
খুচরা বিক্রেতা	৬.০০–৬.৬০	১২.০০	৪৫.০০–৫০.০০	সবুজ	৫.০০	১০.০০	১০.০০
				শুকনা	২৫.০০–২৮.০০		

সূত্রঃ এ. এস. টি. সার্ভে, ১৯৮৫

বাজারজাতকরণ সমস্যা

মসলা বাজারজাতকরণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। প্রথমত বছর বছর মসলা উৎপাদনে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে। ফলে বিদেশের বাজারে রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মসলার সরবরাহ সম্বন্ধে নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বাজারে মসলার দাম, মসলার চাহিদা, সরবরাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য মসলা উৎপাদক ও বিক্রেতাকে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তৃতীয়ত, মসলা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ধান, পাট, গম, তুলা প্রভৃতি কৃষিজপণ্য সম্বন্ধে যে ধরনের ব্যাপক গবেষণা দেশীয় ও বিদেশী সংস্থাগুলো করছে, মসলা সম্বন্ধে সেই ধরনের কোন গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়নি। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় গ্রেডিং–এর অভাব রয়েছে। মরিচে কিছুটা গ্রেডিং করা হলেও অন্যান্য মসলায় মোটেই গ্রেডিং করা হয় না। এতে পণ্যের দাম হেরফের হচ্ছে। পঞ্চমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সুবিধার অভাব। আমাদের দেশে সংরক্ষণ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। যে সমস্ত সংরক্ষণাগার আছে সে সমস্ত সংরক্ষণাগারে বিভিন্ন মসলা সংরক্ষণের যে ধরনের সুবিধা থাকা দরকার তা থাকে না। যেমন পিঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ২৭° ফারেনহাইট থেকে ৩২° ফারেনহাইট। কিন্তু এই ধরনের তাপমাত্রা সম্পন্ন সংরক্ষণাগার বাংলাদেশে নেই। ষষ্ঠত, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হচ্ছে পরিবহণ সমস্যা। অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা মসলা বাজারজাতকরণে বিশেষ প্রভাব ফেলছে। পরিবহণ সমস্যার জন্য অনেক সময় পণ্যের পচন দেখা দেয়, ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সপ্তমত, কৃষি ঋণের অভাব। মসলা উৎপাদনে সরকার কোন রকম ঋণ প্রদান করে না। অথচ অন্যান্য প্রধান কৃষিজাত পণ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনীয় ঋণের অভাবে কৃষকরা মসলা উৎপাদনে ক্রমশ উৎসাহ হারাচ্ছে। অষ্টমত, মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি। ফসল কাটার মৌসুমে শস্যের মূল্য কম থাকে। এই সময় বিভিন্ন মধ্যস্থ কারবারী, দালাল, ফটকা বাজারীরা কম দামে এই সময়ে পণ্য ক্রয় করে সংরক্ষণ করে এবং অফসিজনে বেশি দামে বিক্রি করে। এই মূল্য উঠানামা কৃষকদের কোন উপকারে আসে না। নিচে চিত্রের সাহায্যে পিঁয়াজের মূল্যের উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

পিঁয়াজের দাম

বছর	এপ্রিল	নভেম্বর
১৯৮৩	১১৭	৩৩৩
১৯৮৪	১২৯	২৮১
১৯৮৫	১৩৮	৫০৪

সূত্রঃ কৃষিবাজার বিভাগ

BANGDOC Library Dhaka

দেখা যাচ্ছে ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ সালের ফসল কাটার মৌসুমে পিয়াজের দাম ছিল যথাক্রমে ১১৭/=, ১২৯/=, ১৩৮/= এবং অফসিজনে দাম ছিল যথাক্রমে ৩৩৩/=, ২৮১/=, ৫০৪/=। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফসল কাটার মৌসুমের চেয়ে অফসিজনে ২ থেকে ৪গুণ বেড়ে যাচ্ছে। এই মূল্যের ব্যাপক উঠানামা বাজারজাতকরণে প্রভাব ফেলছে। কোন কোন মসলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ফসল কাটার মৌসুম এবং অফসিজনে দামের অনুপাত ১:৫।

সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কমবেশি মসলা উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত বাজারজাতকরণ অবকাঠামোর সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। নিচে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু সুপারিশ করা হলো।

প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং গবেষণা

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কি পরিমাণ জমি মসলা চাষের আওতায় আসবে, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা কি হবে প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রথমেই গ্রহণ করতে হবে। উন্নত প্রজাতি, যেগুলো বাংলাদেশের জলবায়ুতে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে, সেইগুলোর প্রজন্ম এবং উৎপাদন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া চাষাবাদ, সেচ, সারের ব্যবহার, পোকামাকড় এবং রোগের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার দরকার।

বিশ্ববাজারের মূল্য তথ্য

স্থানীয় বাজারে পণ্যের দাম এবং চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব বাজারে মূল্য এবং চাহিদা সম্বন্ধে কৃষকদের অবগত করতে হবে।

রপ্তানি বাণিজ্য

রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মসলার নির্ভরযোগ্য সরবরাহ বজায় রাখা প্রয়োজন। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া মসলা রপ্তানির জন্য দীর্ঘমেয়াদী নীতি প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। মসলা রপ্তানির উপর সমস্ত অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে মসলা ব্যবসায়ীদের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

সংরক্ষণ ও পরিবহণ

সংরক্ষণ এবং পরিবহণ মসলা বাজারজাতকরণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে মসলা উৎপাদিত হচ্ছে এবং শহরে বাজারে প্রয়োজনীয় উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা জরুরী। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা কৃষকদেরকে তাদের পণ্যের জন্য সঠিক মূল্য পেতে সাহায্য করে।

গ্রাম থেকে শহরে মসলা পরিবহণের জন্য উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় যে, মসলার পরিবহণ সড়ক পথে হয়ে থাকে। এতে খরচ কম পড়লেও যাত্রা পথের দূরত্বের কারনে অনেক সময় লাগে এবং পথে ফেরী পারাপারের যথেষ্ট সুবিধা না থাকাতে মসলা নষ্ট হয়ে যায়। এতে বাজারে মসলার দাম বেড়ে যায়। অপরদিকে ট্রেনে খরচ কিছু বেশি হলেও কিছুটা দ্রুততার সঙ্গে পণ্য সরবরাহ সম্ভব। এতে মসলা নষ্ট হওয়ার খুব একটা সম্ভাবনা থাকে না এবং কিছুটা কম দামে বাজারে মসলা কেনা যায়। তাই ট্রেনে মসলা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে হবে এবং সাথে সাথে সড়কের মাধ্যমে মসলা পরিবহণের যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আসে সেইগুলোকে যথাসম্ভব অপসারন করতে হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চামড়া

ভূমিকাঃ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ঐতিহাসিকভাবে একটা গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ খাত থেকে প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, রপ্তানির পরেই চামড়ার স্থান। ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ চামড়া থেকে ৪১০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। যা পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল মাত্র ১৮০ কোটি টাকা।[১] স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে ও দেশে অনেকগুলো ট্যানারী শিল্প ছিল। পাকিস্তানী মালিকেরা প্রায় ৩০টি ট্যানারী ফেলে যায়। যার কিছু পরবর্তী সময়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং বাকীগুলো সরকার নিয়ে নেয়। বর্তমানে অবশ্য সবগুলোই ব্যক্তি মালিকানাধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চামড়া শিল্প দেশীয় গরু, মহিষ ও ছাগলের চামড়ার উপর নির্ভরশীল। চামড়া উৎপাদন এসকল পশুর দৈনন্দিন জবাইয়ের হার ও কোরবানীতে জবাইয়ের পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকে।

বৈদেশিক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রচলিত পন্থা হচ্ছে ওয়েট–ব্লু চামড়া রপ্তানি করা। বেশির ভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তেমন কোন যান্ত্রিক সরঞ্জাম নেই, তাদের গৃহীত কারিগরি ব্যবস্থাও অত্যন্ত নিম্নমানের। ওয়েট–ব্লু হচ্ছে চামড়া সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা এতে করে চামড়া গুদামজাত ও রপ্তানিকালীন সময়ে তার মান অক্ষুণ্ন থাকে। ওয়েট–ব্লু চামড়াকে ব্যবহারের আগে অবশ্য ফিনিশিং করতে হয়। ১৯৮২ সালের পর থেকে দেশে কিছু রপ্তানি উপযোগী ক্রাস্ট ও ফিনিসড চামড়া উৎপাদনকারী শিল্প ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি মিলিয়ে ১৭০ টি ট্যানারী রয়েছে। উপরন্তু আই ডি এ ঋণের আওতায় বাংলাদেশ লেদার টেকনলজি ইনস্টিটিউটে পাকা চামড়া তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে তালিকা ১–এ বড় ও মাঝারি ট্যানারীগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হলো ঃ

তালিকা – ১ঃ বাংলাদেশ ট্যানারীসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান

অবস্থান		সংখ্যা
১.	ঢাকা	৯৬ টি
২.	চট্টগ্রাম	১৫ টি
৩.	যশোহর	১টি
৪.	বগুড়া	১ টি
৫.	বরিশাল	১ টি
৬.	ময়মনসিংহ	১ টি

উৎসঃ ব্যবসায় তথ্য কেন্দ্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

---

১ সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা।

উপরিউক্ত ট্যানারীগুলো ছাড়াও হাজারীবাগে আরও প্রায় ৫০টির বেশি ক্ষুদ্র আকারের ট্যানারী রয়েছে। তবে বর্তমানে কার্যরত বৃহৎ ও আধুনিক ট্যানারীর সংখ্যা মাত্র ৭টি। আরও ৯/১০টি আধুনিক ট্যানারী স্থাপনের কাজ প্রায় সমাপ্তীর পথে। বাটা স্যু কোম্পানী জুতা তৈরির জন্য পাকা চামড়া উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি সর্বাধুনিক ট্যানারী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেছে।

দেশীয় কাঁচা চামড়ার সরবরাহ অবস্থা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে বহু বছর ধরেই গবাদি পশু ও ছাগলের সংরক্ষিত চামড়া রপ্তানি করে আসছে। এই চামড়াগুলো সাধারণত কৃষি উপজাত গবাদি পশু থেকেই পাওয়া যায়। কেননা এ দেশে কৃত্রিম প্রজনন ও পশুখামার নেই বললেই চলে। গবাদি পশু প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও হয়ে ওঠেনি। তাই গবাদি পশু উৎপাদনের অগ্রগতি এত মন্থর। নিম্নে তালিকা ২-এ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ণায়িত পশুসংখ্যার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

তালিকা - ২ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ণায়িত পশুসংখ্যা (সংখ্যা হাজারে)

পশুর নাম	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	প্রবৃদ্ধির হার
গরু	২৭০৬	২৭২২	২৭৩৮	২৭৫৪	২৭৭১	০.৫৬%
ছাগল	২৬৫০	২৭২৯	২৮১১	২৮৯৫	২৯৮২	২.৯৬%
মহিষ	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	০.২৫%
ভেড়া	২৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৫	০.৪৬%

উৎসঃ বাংলাদেশ পশুপালন পরিদপ্তর

গবাদি পশু ও ছাগলের চামড়ার আভ্যন্তরীণ সরবরাহ আসে দৈনন্দিন জবাই এবং কোরবানী উৎসব থেকে। তাই এই সরবরাহ অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল। তালিকা – ৩ এ বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের চামড়া সরবরাহ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে ঃ

তালিকা – ৩

বাংলাদেশের চামড়া সরবরাহ অবস্থা (মিলিয়ন সংখ্যায়)

বৎসর	গরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া
১৯৮০	২.০১	০.০৩২	৪.৫০	০.১৯
১৯৮৩	২.১৭	০.০৩৫	৫.৭৫	০.২১
১৯৮৫	২.৭০	০.০৭	৭.৫০	০.৩০

সূত্র ঃ
রপ্তানি উন্নয় ব্যুরো
ও
চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি

সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের মতে চামড়াগুলোর গড় আকার হলো গরু ২০ বর্গফুট, মহিষ ৩০ বর্গফুট, ছাগল ৩.৫ বর্গফুট, ও ভেড়া ৪ বর্গফুট। এই হিসাবে দেশে মোট উৎপাদিত চামড়ার পরিমাণ প্রায় ১০৫ মিলিয়ন বর্গফুট। এর শতকরা ৬৫ ভাগই গরু, মহিষ এবং বাকিটা ছাগল ও ভেড়ার।

চামড়া সংগ্রহ প্রণালী

গ্রামীণ সংগ্রহকারী ও পাইকাররা নিয়মিতভাবে হাট/জবাইয়ের জায়গা থেকে চামড়া সংগ্রহ করে ফড়িয়াদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। ফড়িয়ারা চামড়ায় লবণ দিয়ে সংরক্ষিত করে। এভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চামড়ার সংগৃহীত হলে তারা বেপারীদের কাছে অথবা সরাসরি ট্যানারীতে বিক্রী করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলো জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের কাছে (বেপারী) বিক্রী করা হয়। এই ব্যবসায়ীরা অতঃপর প্রায় ১০০০টি চামড়ার লট তৈরি করে ঢাকার চামড়া বাজারের আড়তদারদের কাছে বিক্রীর জন্য নিয়ে আসে।

এই আড়তদাররা আরও বেশিদিন সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পুনরায় লবণ দেয় ও ট্যানারীতে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত মওজুত করে। চামড়া সংগ্রহের এই চ্যানেলটি চিত্র – ১–এ দেখানো হলো ঃ

চিত্র - ১

কাঁচা চামড়া সংগ্রহ প্রণালী

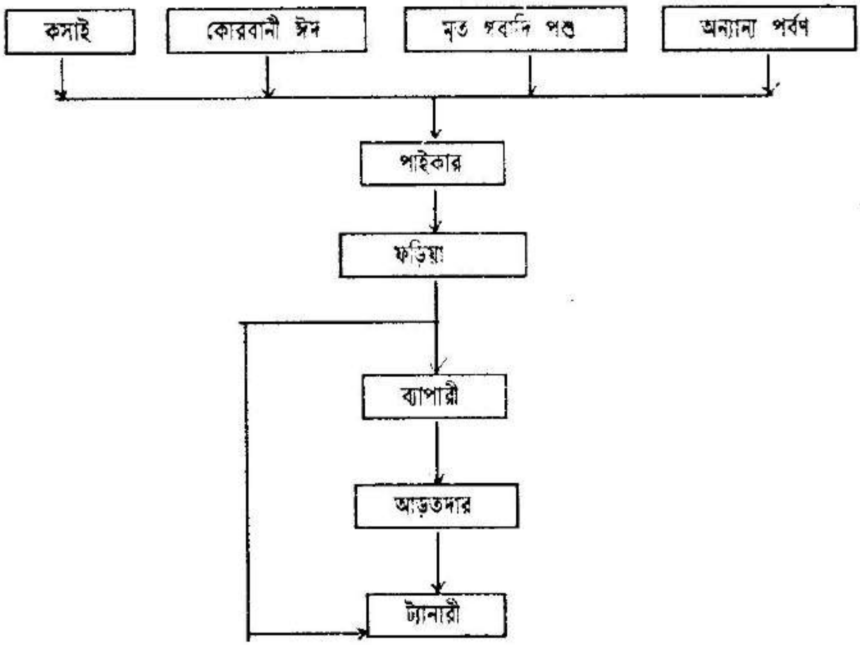

চামড়া প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি

(ক) ওয়েট ব্লু ট্যানিং ঃ প্রথমে লবণ দেয়া কাঁচা চামড়া বাছাই করে ছাঁটাই করা হয়। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য ঘূর্ণায়মান ড্রামের প্রিজারভেটিব ও ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে ডুবানো হয়। চুল ও মাংস আলগা করার জন্য এগুলোতে চুন ও অন্য ক্ষার দেওয়া হয়। তারপর হাতের বা যন্ত্রের সাহায্যে চুল ও মাংস ছাড়ান হয়। চামড়াগুলো ট্যান করার সময় রাসায়নিক পদার্থগুলো যাতে বেশি করে গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকবার ঘূর্ণায়মান ড্রামে বিভিন্ন ক্ষার, লবণ ও এসিডের দ্রবণে চালনা করা হয়। ক্রমিয়াম লবণের সাহায্যে এর পর ট্যান করা হয় ও চালান দেয়ার আগে কনডিসন করার জন্য ৭/৮ দিন স্তূপ করে রাখা হয়। ওয়েট ব্লু ট্যানিং –এর পদ্ধতি চিত্র – ২ তে দেয়া হলো ঃ

চিত্র – ২
ওয়েট ব্লু চামড়া তৈরির পদ্ধতি

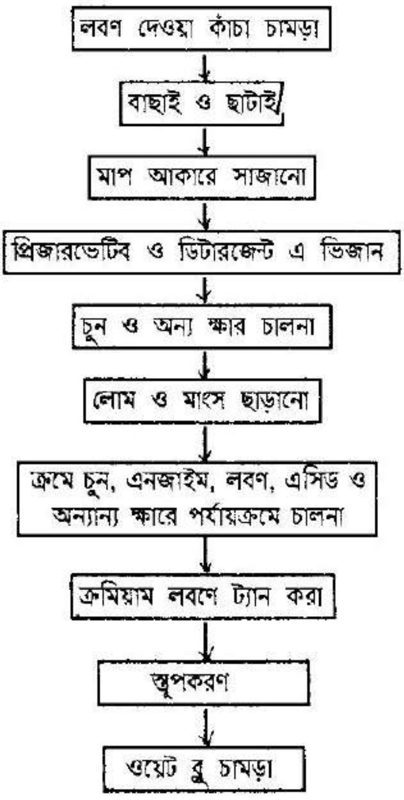

(খ) ফিনিসড লেদার ট্যানিং ঃ এটা ওয়েট-ব্লু চামড়া থেকে করা হয়। প্রথমে ওয়েট-ব্লু চামড়ার অতিরিক্ত পানি ঝরান হয় ও গরুর চামড়ায় স্প্লিট (Split) দেওয়া হয়। অতঃপর ছাটাই করে নির্দিষ্ট পুরুত্বে আনা হয়। নিউট্রালাইজার ও ফ্যাট লিকারিং দিয়ে চামড়া নরম করা হয়। এরপর ইচ্ছানুযায়ী রং দেওয়া হয় ও পানি ঝরান হয়। পরবর্তী পর্যায়ে টানা দেওয়া ও উপরিভাগ মসৃণ করা হয়। ক্রাস্ট লেদার তৈরি করার জন্য এরপর ঐ চামড়াকে ছাঁটাই করে গরম হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দেওয়া হয়। ফিনিসড লেদার তৈরি করার জন্য উপরিউক্ত টানা ও মসৃণকরণ পদ্ধতির পর ময়লা পরিষ্কার করে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী রং দিয়ে ইস্ত্রি করা হয়। এর পর চামড়ার উপরিভাগ সুন্দর করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

রপ্তানি

চামড়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশী চামড়ার প্রধান ক্রেতা হচ্ছে ইতালী। তাছাড়াও ভারত, গনচীন, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চামড়া ক্রয় করে থাকে। নিম্নে তালিকা-৪ এ বাংলাদেশ থেকে চামড়া আমদানিকারক দেশগুলোর ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের আমদানির পরিমাণ ও তার শতকরা হিসাব তুলে ধরা হলোঃ

তালিকা - ৪

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি পরিমাণ (মুল্য হাজারে)

যে সকল দেশে রপ্তানি হয়েছে	১৯৮৪-৮৫		১৯৮৫-৮৬	
	মূল্য	শতকরা হার	মূল্য	শতকরা হার
ইতালী	১,১৩,১৪,৪৫	৬২.৭১	৭৭,৯৬,৭৩	৪৩.২৬
ভারত	১৪,৭১,৩৪	৮.১৫	৭,২৯,০৩	৪.০৪
গনচীন	১২,৯৩,৪৪	৭.১৫	১৬,৫৬,১৭	৯.১৯
ফ্রান্স	৭,৩৯,৯৭	৪.১০	১২,৮০,৯৭	৭.১১
বুলগেরিয়া	৬,০৭,৫৯	৩,৩৭	২,৯০,৭১	১.৬২
আমেরিকা	৪,৫৪,৩৯	২.৫২	৮২,০২	০.৪৫
রাশিয়া	৪,১৪,৮৯	২.৩০	১২,৪৭.২৯	৬.৯২
নেদারল্যাণ্ড	২,৮৯,৭৫	১.৬১	১২,০৯,৪১	৬.৭১
বেলজিয়াম	২,৮১,০৪	১.৫৬	১৩,৫০	০.০৭
যুগোশ্লাভিয়া	১,৯১,৩২	১.০৬	১৩,৯৪	০.০৮

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাংলাদেশ মূলত চামড়াই রপ্তানি করে চামড়াজাত দ্রব্যের পরিমাণ এই ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য। নিম্নে তালিকা - ৫ -এ বিগত ছয় (৬) বৎসরের মোট চামড়া রপ্তানির বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

তালিকা - ৫

বাংলাদেশ থেকে মোট চামড়া রপ্তানির পরিমাণ

বৎসর	পরিমাণ (বর্গফুটে)	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১৯৮১-৮২	৮৭.২৮	১২৬.৪১
১৯৮২-৮৩	৯৩.৮৯	১৩৭.৬১
১৯৮৩-৮৪	১০২.৯১	২০৯.২৩
১৯৮৪-৮৫	৮১.৭৫	১৮০.৪৩
১৯৮৫-৮৬	৭২.৬১	১৮০.২৪
১৯৮৬-৮৭	১৩৭.৪৬	৪০৯.৭০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

উপরিউক্ত তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একমাত্র ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৬-৮৭ সাল ছাড়া অন্যান্য বৎসরে চামড়া রপ্তানি মোটামুটিভাবে একই রকম। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে অস্বাভাবিক রপ্তানির কারণ সম্ভবত প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে গরু ও পশুর পাচার হওয়া।

উল্লেখিত সময়ে রপ্তানিকৃত চামড়ার মধ্যে ক্রাস্ট এবং ফিনিসড চামড়ার আনুপাতিক হারের বিবরণ নিম্নের তালিকা - ৬ এ দেখানো হলোঃ

তালিকা - ৬

ক্রাস্ট ও ফিনিস্‌ড চামড়া রপ্তানির আনুপাতিক হার

বৎসর	ক্রাস্ট ও ফিনিস্‌ড চামড়া		ওয়েট - ব্লু চামড়া	
	পরিমাণ (বর্গফুট)	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)	পরিমাণ (বর্গফুট)	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১৯৮১-৮২	০.৫৫ (.৬৩%)	১.০০ (.৮%)	৮৬.৭৩	১২৩.৪১
১৯৮২-৮৩	৪.২০ (৪.৫%)	৯.০০ (৬.৫%)	৮৯.৬৯	১২৮.৬১
১৯৮৩-৮৪	১৪.৬১ (১৪%)	৩৮.০০ (১৮%)	৮৮.৩০	১৭১.২৩
১৯৮৪-৮৫	১৫.২১ (১৮.৬%)	৪১.৫৪ (২৫%)	৬৬.৫৪	১৩৮.৮৯
১৯৮৫-৮৬	১৮.৮২ (২৬%)	৬০.১১ (৩৩.৩৩%)	৫৩.৭৯	১২০.১৩
১৯৮৬-৮৭	৩৮.৮৫	১২৭.৪০	৯৮.৬১	২৮২.৩৩

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বাংলাদেশী চামড়ার বাজার

দেশে উৎপাদিত চামড়ার দুই ধরনের বাজার আছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক

(ক) আভ্যন্তরীণ বাজার

আভ্যন্তরীণ বাজারে সর্ববৃহৎ ক্রেতা হচ্ছে জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এছাড়া চামড়াজাত দ্রব্যের কতিপয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। যেমনঃ স্যুটকেস, ভ্রমণব্যাগ, মহিলাদের ব্যাগ, বেল্ট, প্রসাধনী বাক্স, গহনার বাক্স, হাতের গ্লোবস, জ্যাকেট ইত্যাদি।

ম্যাকানইজড, নন-ম্যাকানাইজড ও কুটিরশিল্প এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে প্রায় ৩ মিলিয়ন জোড়া জুতা প্রস্তুত করে। দেশে তিনটি চামড়া বোর্ড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানও আছে। চামড়ার উচ্ছিষ্ট টুকরা থেকে এই বোর্ড তৈরি করা হয় এবং গড়ে বছরে ৩৫০ টন এ ধরনের বোর্ড তৈরি হয়।

(খ) আন্তর্জাতিক বাজার

বাংলাদেশ প্রধানত ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানি করে থাকে। সম্প্রতি কিছু ওয়েট-ব্লু থেকে ক্রাস্ট ও ফিনিসড চামড়াও সামান্য রপ্তানি হয়। পূর্ববর্তী তালিকা -৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিগত ছয় বছরে গড়ে ৮০.৬১ মিলিয়ন বর্গফুট ওয়েট-ব্লু চামড়া ও ১৩.৩৭ মিলিয়ন বর্গফুট ক্রাস্ট/ ফিনিসড চামড়া রপ্তানি করা হয় যার মূল্য যথাক্রমে ১৬০.৭৬ মিলিয়ন টাকা ও ৪৬.১৭৫ মিলিয়ন টাকা।

বিপণন পদ্ধতি

পণ্যের বিভিন্নতার কারণে রপ্তানি চ্যানেল বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন ওয়েট-ব্লু, ও ক্রাস্ট রপ্তানির ক্ষেত্রে এক ধরনের এবং পাকা চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের বন্টন চ্যানেল ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ঃ

ক. পণ্যের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। যেমন ওয়েট-ব্লুকে ২৫% ও ক্রাস্টকে ৮০% প্রক্রিয়াজাত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন ক্রাস্ট চামড়া প্রাকৃতিক রং এ পাকা চামড়া এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন রং করা সম্ভব হয়ে থাকে।

খ. পণ্যের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কারণে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ওয়েট ব্লু ও ক্রাস্ট চামড়া পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্যে ট্যানার কিংবা রং করা

প্রতিষ্ঠান আমদানি করে থাকে। অপরদিকে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পাকা চামড়া আমদানি করে থাকে।

উভয় প্রকার রপ্তানি চ্যানেল চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হলো।

চিত্র – ৩

ওয়েট–ব্লু ক্রাস্ট চামড়ার রপ্তানি চ্যানেল নিম্নরূপ

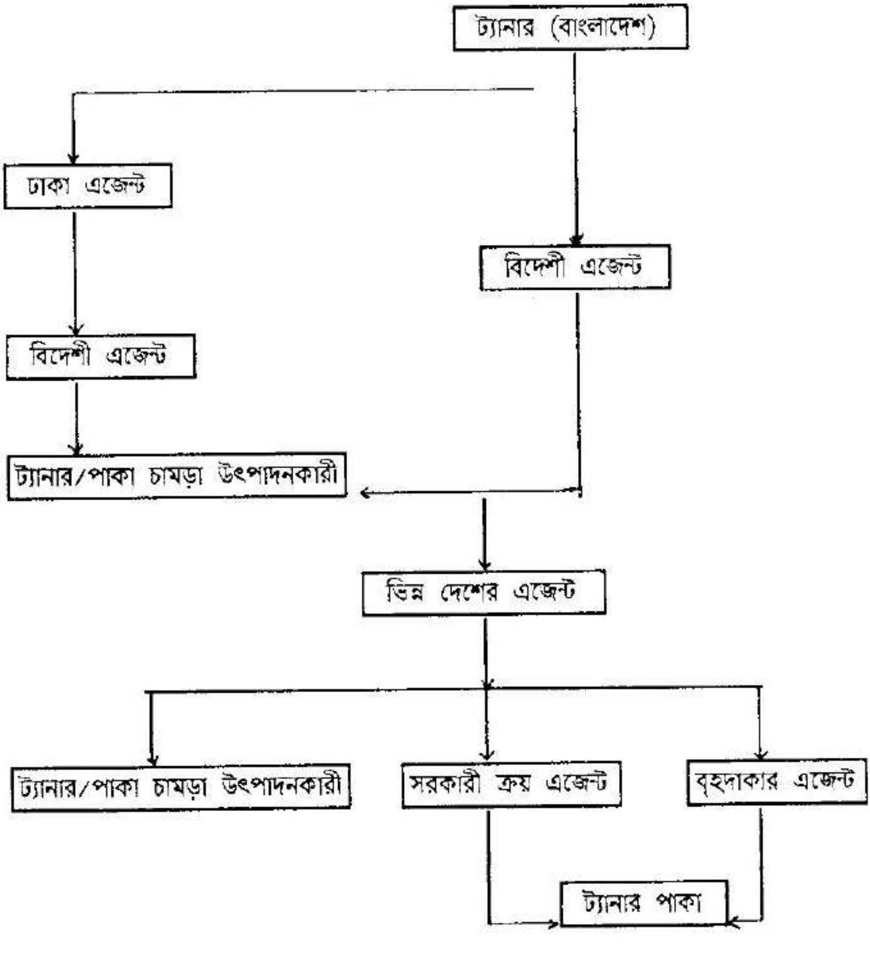

চিত্র – ৪

পাকা চামড়ার রপ্তানি চ্যানেল নিম্নরূপ

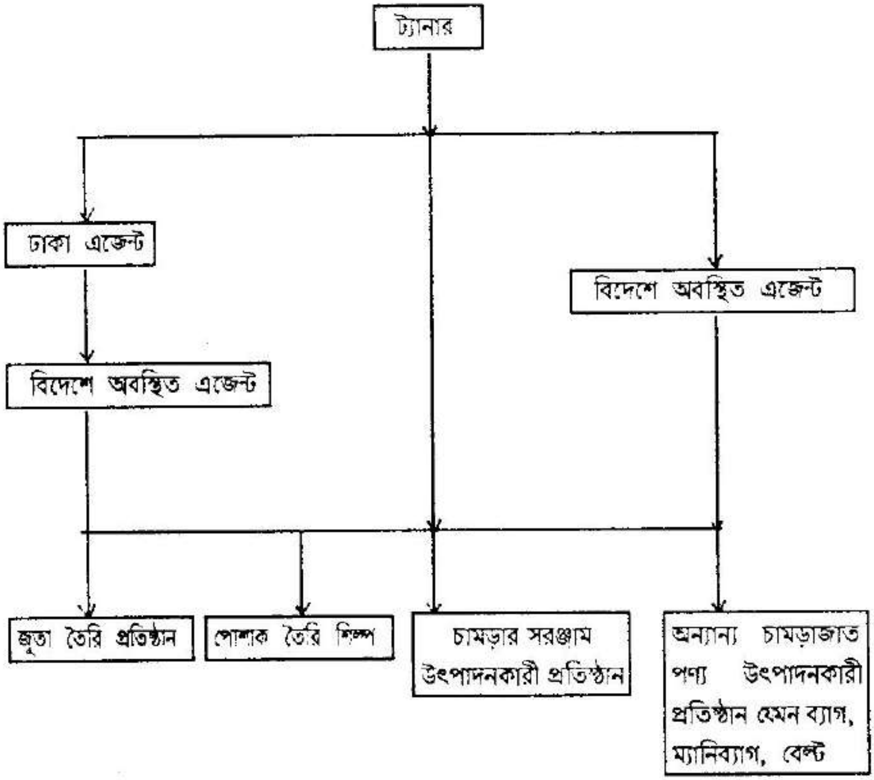

বাজার তথ্য

সরবরাহঃ চামড়া সরবরাহ পরিস্থিতি সারা বছর একই রকম থাকে না। দেশের জনসংখ্যার ৯০ ভাগ মুসলমান হওয়ায় মুসলিম পর্বগুলোতে গবাদি পশুর জবাই বৃদ্ধি পায় বলে এর পর পর কয়েকদিন চামড়া সরবরাহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। এই সকল পর্বগুলো হলোঃ কোরবানী, শবে বরাত, ১লা রমজান, ২৭ শে রমজান এবং ঈদুল ফিতর। এর মধ্যে কোরবানীর পরবর্তী দু'সপ্তাহ ধরে দৈনিক স্বাভাবিক সরবরাহ মাত্রার তুলনায় গড়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি সরবরাহ হয়।

মূল্যঃ (টাকায় পিস প্রতি মূল্য)

চামড়া	প্রকার	কসাই	ট্যানারী গেট
গরু	বড়	৯০০–১১০০	১০০০–১২০০
	মাঝারি	৫০০–৭০০	৬০০–৮০০
	ছোট	৩০০–৪০০	৪০০–৫০০
ছাগল		৫০–১১০	৭০–১৩০

উৎসঃ মেসার্স হিল্টন লেদার কমপ্লেক্স

অর্থাৎ মধ্যস্থকারবারীগণ প্রতি পিস গরুর চামড়ার জন্য প্রায় ১০০ টাকা এবং ছাগলের চামড়ার জন্য প্রায় ২০ টাকা আয় করে থাকেন। এ আয় থেকে লবণের মূল্য, পরিবহণ ব্যয়, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি তারা মিটিয়ে থাকেন।

ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কর্তৃক ২৮শে এপ্রিল, ১৯৮৮ তারিখে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত লবণ দেয়া চামড়ার বাজার দরঃ

(টাকায় প্রতি ১০০ পিসের মূল্য)

গরুঃ	খুব বড়	৬৯০০০	৭৬০০০
	বড়	৫৯০০০	৬৬০০০
	মাঝারি	৩৯০০০	৪৬০০০
	ছোট	২৯০০০	৩৬০০০
ছাগলঃ	ছোট ও মাঝারি	১১০০	১২৫০০
	বড় ও খুব বড়	১৩০০	১৪৫০০

চামড়া বিপণন সমস্যা

চামড়া বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যা সরাসরি জড়িত। রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রতিবছর বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। নিম্নে সে সকল অবস্থার প্রকৃতি বর্ণনা করা হলোঃ

কাঁচামাল সংগ্রহজনিত সমস্যা

বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত চামড়ার মাত্র ৫% নির্ধারিত কসাইখানা থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। বাকি ৯৫% ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কসাই থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। যাদের চামড়া ছেলানোর দক্ষতা খুবই সামান্য। ফলে গরুর চামড়া ছাড়ানোর ক্ষেত্রে ক্ষতি হওয়ায় পচন ধরে থাকে। এ ধরনের গুণগত ক্ষতির জন্য বাৎসরিক লোকসানের পরিমাণ ১৩ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার বলে এক রিপোর্টে হিসাব করা হয়েছে। তবে ছাগলের চামড়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্ষতি খুবই কম। কারণ ছাগলের চামড়া মোটামুটিভাবে টেনেই মাংস থেকে আলাদা করা যায়।

কাঁচা চামড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিক মধ্যস্থকারবারীর উপস্থিতি

কাঁচা চামড়া সংগ্রহের চ্যানেল অত্যধিক লম্বা হওয়ায় উৎসস্থল থেকে ট্যানারীতে চামড়া পৌছাতে কমপক্ষে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লেগে যায়। এতে চামড়ার গুণগত মানে অবনতি ঘটে থাকে। তাছাড়া চ্যানেল অধিকসংখ্যক মধ্যস্থকারবারীর উপস্থিতি থাকায় কসাইরা তুলনামূলকভাবে কম মূল্য পেয়ে থাকে। অপরদিকে ট্যানারদেরকে অধিক মূল্যে চামড়া ক্রয় করতে হয়। ফলশ্রুতিতে রপ্তানি বাজারে আমাদের ট্যানাররা মূল্য প্রতিযোগিতায় প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। ট্যানারদের মতে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার মূল্য কম হলেও আমাদের দেশে চামড়ার উচ্চমূল্য বিরাজ করছে।

বিপণন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব

বিপণনের কাঠামোর উপরই নির্ভর করে শিল্প বা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও সফলতা। ১৯৬০ সালে কতিপয় পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এদেশে সর্বপ্রথম আধুনিক ট্যানারীর গোড়াপত্তন ঘটে। এরপর পশ্চিমাদের ফেলে যাওয়া ট্যানারীগুলো নিয়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশীরা অগ্রসর হয় মূলত ১৯৭৭ সাল থেকে। চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা নতুন হওয়ায় বিপণন কার্যক্রম বহুলাংশে ক্রেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের রপ্তানিকারকগণ আশানুরূপ বিদেশী মুদ্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন। কেননা পণ্য হিসাবে চামড়ার গুণাগুণ নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কারণ চামড়া গুণগতমান বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এবং গ্রেডিং চোখের দেখায় বুঝে নিতে হয়।

ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানিতে ট্যানারদের আগ্রহ

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানি করে আসছে। ফলে আমাদের ট্যানাররা ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানিতে বেশি নিরাপত্তা অনুভব করে। কারণ ওয়েট-ব্লু রপ্তানির ক্ষেত্রে শুধু মূল্যের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান এবং তা ততটা তীব্র নয় অপরদিকে পাকা চামড়ার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া ওয়েট-ব্লু প্রক্রিয়াজাত করতে স্বল্প সময়, স্বল্প মূলধন প্রয়োজন পড়ে। ফলে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অনেক ট্যানাররা এখনও নিজেদেরকে ওয়েট-ব্লু উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত রেখেছে। ফলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে।

চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা এবং সম্ভাবনা

১৯৮২ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ চামড়াই ওয়েট-ব্লু রপ্তানি করা হতো ১৯৮২ সালের পর থেকে ওয়েট-ব্লু রপ্তানির পরিমাণ কমে আসছে এবং ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সাল থেকে ওয়েট-ব্লু অপেক্ষা ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া রপ্তানিকে অধিক পরিমাণে উৎসাহিত করছেন। তাছাড়া সরকার ক্রমান্বয়ে ওয়েট-ব্লু রপ্তানি বন্ধ করে ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া এবং চামড়জাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করার জন্য কতকগুলো বৈষম্যমূল্য নীতি প্রবর্তন করেছেন। এগুলো নিম্নরূপঃ

ক. ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া রপ্তানিকরণ শুল্ক ফেরৎ (Duty draw back) হিসাবে প্রতি বর্গফুট চামড়া রপ্তানির জন্য ৬.১৭ টাকা পেয়ে থাকেন। অথচ ওয়েট-ব্লুর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন শুল্ক ফেরতের ব্যবস্থা নেই।

খ. ওয়েট-ব্লু রপ্তানিকারককে ৫% হারে রপ্তানি শুল্ক দিতে হয়। অথচ ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে এরূপ কোন শুল্ক দিতে হয় না।

গ. ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া রপ্তানিকারকগণ মোট রপ্তানির ১০০% এর উপর এক্স পি বি হিসাবে ডলার প্রতি ২.৩১ টাকা পেয়ে থাকেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ওয়েট-ব্লু রপ্তানি কারক মোট রপ্তানির ৪০% এর উপর এক্স পি বি প্রদান করা হতো। ১৯৮৬-৮৭ রপ্তানি নীতিতে ওয়েট-ব্লুর উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে এক্স পি বি তুলে নেয়া হয়েছে। সরকারী নীতিমালায় এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে সরকার পাকা চামড়া রপ্তানিকে উৎসাহিত করে চামড়া শিল্পে গুণগত পরিবর্তন আনয়নে আগ্রহী।

চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা

চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক কথায় উজ্জ্বল কিংবা অন্ধকার বলা ঠিক হবে না। এ সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছেঃ

ক. শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও তার অবস্থা।
খ. শিল্পের অব-কাঠামো ও কার্যকারিতা।
গ. ওয়েট-ব্লু এবং পাকা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের তুলনামূলক খরচ বিশ্লেষণ।

(ক) শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও তার অবস্থা

আমাদের দেশের চামড়া শিল্পের কাঁচামালের উৎস হলো গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। কাঁচা চামড়া পশু জবাই ও মরার হারের উপর নির্ভর করে। তবে পশু সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই চামড়া সরবরাহ বাড়বে একথা বলা যায় না। কারণ মাংসের চাহিদার উপরও তা সমানভাবে নির্ভরশীল আবার চাহিদা নির্ভর করবে বৃহত্তর জনসংখ্যার আয়, রুচি ও ভোগের উপর। যদিও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশুসংখ্যার প্রবৃত্তির হার ৬% ধরা হয়েছে। তবে এটা ঠিক পশুবৃদ্ধির হার উন্নিত করার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রবৃত্তির হার যাই ধরা হোক না কেন যদি বাৎসরিক উৎপাদন ১০০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া স্থির ধরা হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের ১০টি কার্যরত আধুনিক ট্যানারীর পূর্ণ ক্ষমতায় ৩৫ মিলিয়ন বর্গফুট কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে ক্রাস্ট এবং পাকা চামড়ায় রূপান্তর করতে পাবে। তাহলে ৬৫ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার এখনও সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ সুবিধায় আরো কিছু ট্যানারী আধুনিকীকরণ করে উন্নতমানের ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া উৎপাদন ও রপ্তানি করার সুযোগ বিদ্যমান। কাজেই বর্তমান অবস্থায় ওয়েট-ব্লুকে নিরুৎসাহিত না করা হলে ট্যানারী শিল্পগুলোর অবকাঠামো পরিবর্তন হতে অনেক সময় লেগে যাবে। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে সরকারী নীতির যথেষ্ট বাস্তবতা রয়েছে বলে মনে হয়।

তাছাড়া বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান যেমনঃ পর্যাপ্ত পানি, সৌরকিরণ ও সস্তায় লবণ এবং ইতিমধ্যেই চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল উৎপাদনের লক্ষ্যে দুটো শিল্প উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করেছে। গুণগতমানের দিক থেকে উৎপাদিত কেমিক্যাল আন্তর্জাতিক মানের বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

(খ) শিল্পের অবকাঠামো এবং তার অবস্থা

আমাদের চামড়া শিল্পের অবকাঠামো মান্ধাতার আমলের হলেও সেখানে ওয়েট-ব্লু প্রক্রিয়াজাত করার পিছনে কোন অসুবিধা নেই বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে দেশে উৎপাদিত ১০০ মিলিয়ন কাঁচা চামড়াকে পাকা করতে বর্তমানে অবস্থিত ১৭০টির মত ট্যানারী সমগ্র কাঁচামালকে রূপান্তর করে পাকা করার জন্য যথেষ্ট। এমতাবস্থায় বাকি ট্যানারীগুলো ওয়েট-ব্লু তৈরি করে আধুনিক ট্যানারীর নিকট কাঁচামাল হিসাবে সরবরাহ করতে পারে।

(গ) ওয়েট-ব্লু এবং ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার তুলনামূলক খরচ বিশ্লেষণঃ

তালিকা – ৭

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে খরচ ও আয়

চামড়ার প্রকারভেদ		প্রতি বর্গফুটে খরচ (টাকায়)	প্রতি বর্গফুটে আয় (মার্কিন ডলার)
ছাগলঃ			
ওয়েট-ব্লু ঃ	১, ২, ৩ গ্রেড	২.৫০	০.৯৫ – ০.৯৮
	৪, ৫, ৬ গ্রেড	২.৫০	০.৪৫ – ০.৫৫
ক্রাস্ট ঃ	১, ২, ৩, গ্রেড	১০.০০	১.৬০ – ১.৭০
	৪, ৫, ৬ গ্রেড	১০.০০	১.৩০ – ১.৪০
	৭, ৮ গ্রেড	১০.০০	০.৯০ – ০.৯৫
	৯ গ্রেড	১০.০০	০.৪০ – ০.৪৫
পাকা ঃ		১২.০০	২.২০ – ২.৩০
গরু ঃ			
ওয়েট-ব্লু ঃ		২.০০	০.৭০ – ০.৭৫
ক্রাস্ট ঃ	১, ২, ৩, গ্রেড	১০.০০	০.৯০ – ১.১০
	৪, ৫, ৬ গ্রেড	১০.০০	০.৬৫ – ০.৭৫
পাকা ঃ	১, ২, ৩ গ্রেড	১২.০০	১.১০ – ১.২০
	৪, ৫ গ্রেড	১২.০০	১.০০ – ১.১০

সূত্রঃ কয়েকটি ট্যানারী ও লেদার কমপ্লেক্স থেকে সংগৃহীত।

উপরিউক্ত তালিকার আলোকে দেখা যায় ওয়েট-ব্লু থেকে ক্রাস্ট ও পাকা চামড়া উৎপাদন করে যে আয় হয় তা খুবই আশাব্যঞ্জক। শুধু তাই নয়, ১০০ পিস চামড়াকে ওয়েট-ব্লু করতে যেখানে

শুধুমাত্র ৩ জন শ্রমিক প্রয়োজন, সমপরিমাণ চামড়াকে ক্রাস্ট এবং পাকা করতে ন্যূনতম ২৫ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে উক্ত শিল্প বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে চামড়া শিল্প একটি উজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এবং এখন থেকেই রপ্তানির উদ্দেশ্যে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

চামড়া শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্প এবং এই খাতে রপ্তানি আয় তিনগুণ থেকে পাঁচগুণ পর্যন্ত বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে অবশ্যই ফিনিস্‌ড/ক্রাস্ট চামড়া রপ্তানি বাড়িয়ে। পর্যায়ক্রমে তাই ওয়েট-ব্লু থেকে ক্রাস্ট/ফিনিস্‌ড চামড়া ও সর্বোপরি চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানিতে যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করতে হবে। প্রয়োজনে কাঁচা চামড়াও আমদানি অনুমোদন করতে হবে কেননা এটাকে পরিবর্তিত করতে পারলে যথেষ্ট মূল্য সংযোজন সম্ভব। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় হাজারীবাগে প্রতিষ্ঠিত কমন ফিনিসিং ফ্যাসিলিটিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা খুবই যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ তবে এর সুবিধা যেন ওয়েট-ব্লু চামড়া উৎপাদনকারী ট্যানারীগুলো ঠিকমত নিতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও দরকার একটা চামড়া নীতির। ক্রাস্ট/ফিনিস্‌ড চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রপাতি স্থাপনের সুবিধার জন্য এ সব করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া বিপণনে আরও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সরকারী প্রতিনিধির পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিনিধি বিদেশে প্রেরণ করে তাদেরকে স্বাধীনভাবে দরকষাকষিতে অভ্যস্ত করতে হবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

দুধ

সুচনাঃ দুগ্ধ সম্পদে বাংলাদেশ তেমন সমৃদ্ধ নয়। দুগ্ধ হতে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়। সুতরাং দুগ্ধ উৎপাদনে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। দেশের অধিকাংশ লোকই অপুষ্টির স্বীকার। আমাদের দেশের লোক প্রধানত চাউলের উপর নির্ভরশীল। এই চাউলের উৎপাদন ও দেশের সার্বিক চাহিদা মিটাতে যথেষ্ট নয়। তাই দুগ্ধ এই অপুষ্টি দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। এবং সেই সাথে দেশের খাদ্য সমস্যা স্বল্প পরিমাণে হলেও হ্রাস করতে পারে। গবাদিপশু বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। গবাদিপশুর উন্নয়নে এদেশের আবহাওয়া খুবই অনুকূল।

তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদিত দুগ্ধ যেন সঠিকভাবে বাজারজাত করা যায়। দুগ্ধ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অন্যথায় সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

খাদ্য হিসাবে দুধের স্থান

শিশুদের জন্য দুধ প্রকৃতির একটি অমূল্য দান। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমিষ, খনিজ পদার্থ, খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদান দুধে পাওয়া যায় এবং দুধের পুষ্টি উপাদানগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের। শিশুদের জন্য দুগ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সুষম খাদ্য। বৃদ্ধ ও রোগীর জন্য এটা উৎকৃষ্ট খাবার।

আমিষ কতগুলো এমাইনো এসিড সমন্বয়ে গঠিত। এমাইনো এসিডের তারতম্য ও প্রকারভেদের উপর আমিষ-এর পুষ্টিমান অনেকাংশে নির্ভর করে। খাদ্য শস্যে লাইমিন ও ট্রিপ্টোফেন এমাইনো এসিডের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই দুটি ছাড়াও একান্ত প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডের সবগুলোই দুগ্ধ আমিষে বিদ্যমান।

দুগ্ধ চর্বি ও অন্যান্য চর্বি অপেক্ষা উন্নতমানের। এর খাদ্যপ্রাণ ও অন্যান্য যৌগিক পদার্থের উপর দুধের খাদ্যমান ও বাণিজ্যক মূল্য নির্ভরশীল। দুগ্ধ চর্বিতে এ, ডি এবং ই খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ চর্বিতে কতিপয় অতিরিক্ত উপাদানের সমন্বয়ের জন্য এর খাদ্যপ্রাণ অন্যান্য চর্বি অপেক্ষা অধিক। শর্করা জাতীয় উপাদান ল্যাকটোস, একমাত্র দুধেই বিদ্যমান। উপকারী জিবাণু উৎপাদনে ল্যাকটোসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর খাদ্যমান অন্যান্য শর্করার সমতুল্য। দুগ্ধে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রাচুর্যের জন্য শিশু ও প্রসূতির জন্য উপকারী পানীয়রূপে পরিচিত। অন্যান্য অনেক খনিজ পদার্থও দুধে কম বেশি পাওয়া যায়। দুধ

প্রয়োজনীয় খাদ্যমানের একটি উৎস। সব কয়টি খাদ্যমানের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব আশানুরূপ না হলেও যে কোন খাদ্য অপেক্ষা দুধ ভাল।

দুধ একটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য পানীয়। দুগ্ধ খাদ্যপুষ্টির ৯৮% ভাগ হজম সম্ভবপর। শৈশবে ও বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র দুধই আমাদের শক্তি সামর্থকে সঞ্জিবিত রাখতে সক্ষম। ঘি, মাখন পনির, আইসক্রিম, দধি, ফিরনি প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য অতি সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যরূপে সুপরিচিত।

দুগ্ধ উৎপাদনের উৎস

বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু হতে সাধারণত দুধ পাওয়া যায়। এখানে আমরা মানুষের ব্যবহার উপযোগী দুগ্ধ উৎপাদনকারী পশুগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল ইত্যাদি প্রাণীর দুগ্ধ আমরা পানীয় ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবহার করে থাকি। দুধের প্রধান উৎস হলো গাভী। আমাদের দেশের উৎপাদিত দুগ্ধের প্রায় ৯৯% আসে গাভী থেকে। বাকি অংশ মহিষ, ছাগী ইত্যাদি হতে আসে। বাংলাদেশে ৩৮% কৃষক পরিবার কেবল মাত্র দুধের জন্য গাভী পালনের চিন্তা করে। ১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী দুগ্ধ উপযোগী বয়সের গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০.৯ লক্ষ এবং এর ৯৯% ছিল গাভী এবং বাকি মাদী মহিষ। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের সংখ্যা প্রায় ২২·৭ লক্ষ। প্রয়োজনের অনুপাতে এটা খুবই নগণ্য।

বিভিন্ন জাতের দুগ্ধবতী গবাদিপশু

দুগ্ধের জন্য পালিত গবাদি পশুর মধ্যে জার্সি হলস্টিন, ফ্রিসিয়ান, বাদামী স্যুইচ, গোয়েরনসি, অয়ার-শায়ার, শাহিওয়াল, লালসিন্দী থরপার্কার, হরিয়ানা, চট্টগ্রাম লালগাভী, মনিপুরি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে এই জাতীয় গরু নাই বলিলেই চলে। একমাত্র বাংলাদেশে খামার আকারে কয়েকটি ডেইরী ফার্মে এই জাতীয় কিছু গরু দেখা যায়। বাংলাদেশের ডেইরী ফার্মগুলো সাভার-ঢাকা, তেজগাঁও-ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও সিলেট প্রভৃতি স্থানে। এই ফার্মগুলোতে আমদানিকৃত কিছু উন্নতমানের গাভী দেখা যায়। বর্তমানে ঢাকার সাভারে অবস্থিত ডেইরী ফার্মে প্রায় তিন হাজার গরু আছে। এখানে উন্নতমানের গরুগুলো ফ্রিসিয়ান, শাহিওয়াল, জার্সী, দেশী শ্রেণীর। ১৯৭৩ সালে এই গরুগুলো অস্ট্রেলিয়ার সরকার বাংলাদেশকে অনুদান হিসাবে দিয়েছিল। এছাড়াও কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজে দেখা যায় যে, আরও ২৫০টি শাহীওয়াল ও সিন্দী গাভী পাকিস্তান ও ভারত থেকে কিছু দিনের মধ্যে আমদানি করা হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ গাভী আমাদের দেশীয় পর্যায়ের। এই জাতীয় গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা খুবই সামান্য। যেখানে একটি শাহীওয়াল গাভী দৈনিক ৪০ সের দুধ দেয়, সেখানে আমাদের দেশীয় গাভী মাত্র ২/৩ সের দুধ দেয়।

বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ

বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ সঠিকভাবে বলা কষ্টসাধ্য। কারণ এ ব্যাপারে কোন সঠিক পরিসংখ্যান তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে এটা বলা যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। যে পরিমাণ দুধ উৎপাদিত হয়, তাতে আমাদের চাহিদার ক্ষুদ্র অংশও মেটে না। এই জন্য আমাদেরকে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। অবশ্য সরকার দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য সরকারী অর্থসাহায্যে কয়েকটি দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় কৃষকই ২/১ টি করে গাভী পালন করেন এবং তা হতে প্রাপ্ত দুধের পরিমাণ খুবই সামান্য। তবে বর্তমানে খামারগুলোতে দুগ্ধদাত্রী গাভী প্রচুর পরিমানে দুধ দেয়। তাও আমাদের চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। দেশের প্রধান প্রধান খামারগুলো কোথায় অবস্থিত তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. সাভার ডেইরী ফার্ম

বাংলাদেশের ঢাকার সাভারে অবস্থিত ডেইরী ফার্মটি অতি পুরাতন। এখানে দৈনিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ হলো ৩২৫০.০০ কেজি।

নিম্নে সাভার ডেইরী ফার্মের কয়েক বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো (তালিকা-১)ঃ

তালিকা - ১

সাভার ডেইরীর দুগ্ধ উৎপাদন

১৯৮১-৮২	৬,৯০,০৯৩.০ কেজি
১৯৮২-৮৩	৭,৩৫,৪৬৬.০ কেজি
১৯৮৩-৮৪	৭,৩৫,৮৫৮.০ কেজি
১৯৮৪-৮৫	৮,৯৪,২৮৯.০ কেজি
১৯৮৫-৮৬	৭,৮০,৪০২.০ কেজি

সূত্রঃ সাভার ডেইরী

ঐ ফার্মের কয়েক বৎসরের অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হল (তালিকা–২)ঃ

তালিকা – ২

সাভার ডেইরীর দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন

বৎসর	তরল দুগ্ধ কেজি	ক্রীম কেজি	মাখন পাউণ্ড	ঘি সের/কেজি	পনির সের/কেজি
১৯৮১-৮২	৩,২৩,৫৫১.০	২৬,৩৭৩.০	২২,১৭০.০	১,২৯০.৫ সের	৯৩২.০ সের
১৯৮২-৮৩	৩,০৭,১৭১.০	২৯,৫২৯.০	২৫,২২৫.০	১,৮১৯.৫ সের	৯২৯.০ সের
১৯৮৩-৮৪	২,৩৫,৩৬৬.০	২৯,২৩২.০	২৫,২১৯.৫	১,৮৬৫.২৫ সের	৬৮২.০ সের
১৯৮৪-৮৫		২৭,৭৭২.০	২,৭৪২.৫	২,৮২৭.২৫ কেজি	৯৭৯.৫ কেজি
১৯৮৫-৮৬		২২,৬৪৩.০	৮,২৮৫.৪	২৫১০.৫৪ কেজি	৬৯৫.০ কেজি

সূত্রঃ সাভার ডেইরী

নিম্নে ঐ ফার্মের কয়েক বৎসরের উৎপাদিত দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হলো (তালিকা – ৩)ঃ

তালিকা – ৩

সাভার ডেইরী দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিক্রয়

বৎসর	তরল দুগ্ধ পাউণ্ড/কেজি	ক্রীম পাউণ্ড	মাখন পাউণ্ড/কেজি	ঘি সের/কেজি	পনির সের/কেজি
১৯৮১-৮২	৯,৫০,০৯৮.৫ Lbs	৪,১৪৭.৭৫	২০,১৪৬.৫ Lbs	১,২৮১.৫ সের	৯৩৮.০ সের
১৯৮২-৮৩	৯,১০,৫৩২.০ Lbs	৫,২০৪.০	২৭,০৭১.৫ Lbs	১,৪২৫.৫ সের	৯৩৪.০সের
১৯৮৩-৮৪	৪,৫৫,২৮৫.০ Lbs	৫,২৪৫.২৫	২৪৮৪০.০ Lbs	১,৮২৮.৭৫ সের	৬৩৪.০ সের
১৯৮৪-৮৫	৭,৪৬,৮৬০.৫ Kg.	৫,১৩১.৭৫	৮,১৮১.২৫ Kg.	২,৮৫৪.০ সের	৯৬৬.৫ Kg.
১৯৮৫-৮৬	৬,৪৯,০৩২.০ Kg.	৩,৯৭৭.২৫	৮,০০৪.৫ Kg.	২৫০৬.০ সের	৫৩৪.০ Kg.

সূত্রঃ সাভার ডেইরী

খ. বাংলাদেশ সমবায় দুগ্ধ খামার (মিল্ক ভিটা)

বাংলাদেশ সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় একটি সমবায় দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, টেকেরহাট (ফরিদপুর) এবং বাঘাবাড়ী ঘাট (পাবনা) এর গ্রামগুলোর উৎপাদকের নিকট হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা এবং স্বল্পমূল্যে প্যাকেট আকারে ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করা।

সমবায় দুগ্ধখামার প্রথম গঠিত হয় লাহিরিমোহনপুর (পাবনা) -এ ১৯৬৫ সালে। তখন ইহার নাম ছিল "Eastern Milk Producer's Co-operative Union Ltd." এছাড়া ঢাকার তেজগাঁও-এ "Asto Dairy" নামে একটি দুগ্ধখামার ছিল। এটাও পরিচালিত হত "Eastern Milk Producer's এর তত্ত্বাবধানে। পরবর্তীকালে এর নামই হয় "Bangladesh Milk Producer's Co-operative Union Ltd." (Milk Vita) বা "BMPCUL"

পাঁচটি দুগ্ধ প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা ৩৩৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ১১৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। নিম্নে দুগ্ধ খামারের নামগুলো এবং উৎপাদনের প্রকৃতি দেয়া হলো (তালিকা - ৪)ঃ

তালিকা - ৪

স্থানের নাম	উৎপাদন প্রকৃতি	উৎপাদন ক্ষমতা (প্রতি দিন)
ঢাকা	পাস্তরিকৃত দুধ এবং আইসক্রীম তৈরি হয় বাজারে সরবরাহের জন্য	৬০,০০০ লিটার
মানিকগঞ্জ	দুধ শীতকরণ	১০,০০০ লিটার
টাঙ্গাইল	দুধ শীতকরণ	১০,০০০ লিটার
ফরিদপুর	পাস্তরিকৃত (দুধ) দুগ্ধ	২৫,০০০ লিটার
বাঘাবাড়ী ঘাট	পাস্তরিকৃত (দুধ) দুগ্ধ	৫০,০০০ লিটার

সূত্রঃ BMPCUL

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে দুগ্ধ সংগ্রহ করে থাকে : প্রথমে তারা প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে গ্রামগুলো হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ঐগুলো কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে কারখানাতে প্রেরিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিষদ মোট ৯ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে ৬ জন নির্বাচিত এবং অপর তিনজনকে সরকার

নিয়োগ করে থাকেন। সাধারণত ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসাবে কাজ করে থাকেন। সে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সমবায় দুগ্ধ খামারের উন্নতি সাধন করা এবং এর প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ খরচকে কমিয়ে আনা। এই প্রতিষ্ঠান কৃষকদের উৎপাদিত দুগ্ধ তাদের গৃহদ্বার হতে সংগ্রহের চেষ্টা করছে। অপরপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটি সংগৃহীত দুগ্ধ হতে তরল দুধ, মাখন, ঘি, আইসক্রীম, চকলেট মিল্ক, ক্রীমযুক্ত পাউডার দুধ, পনির এবং সরতোলা দুধের পাউডার ইত্যাদি তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করছে। নিম্নে ছকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটির কয়েক বৎসরের কাঁচা দুধ সংগ্রহের পরিমাণ, সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা দেখানো হলো (তালিকা – ৫)ঃ

তালিকা – ৫

মিল্ক ভিটা'র কর্ম পরিধি

বৎসর	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	কাঁচা দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ (লিটার)
১৯৭৩-৭৪	১১০	৪,৩০৪	২,১২,৯৮৬
১৯৭৪-৭৫	১৩২	৪,৯৮৪	৩৬,৩০,৯৯০
১৯৭৫-৭৬	১৩৯	৬,৮২৯	৫০,৩২,১৪৬
১৯৭৬-৭৭	১৬২	৯,৮৮৭	৮৪,৮৩,০৯৪
১৯৭৭-৭৮	১৮৭	১৪,৯৮৯	৮১,২১,৩৮৪
১৯৭৮-৭৯	১৯৫	১৭,৭২৫	৮২,২৮,২৩৭
১৯৭৯-৮০	২০০	২১,৪০১	৯৮,২৩,৮১৪
১৯৮০-৮১	২২০	২৩,৩০৮	৫৮,০৫,৫৮৩
১৯৮১-৮২	২৪৫	২৬,৯৩০	৯২,৪১,৩১৭
১৯৮২-৮৩	২৬৬	৩০,১৭৪	১০১,১৮,৩৩৭
১৯৮৩-৮৪	২৬৯	৩১,৬০৫	৩৬,৮৩,০৩৭
১৯৮৪-৮৫	২৭০	৩১,৮৪৫	৪৪,২৮,৫২২
১৯৮৫-৮৬	২৬৩	৩৭,৭৪৫	৪৯,১৮,৭৬২

সূত্রঃ "BMPCUL

এই প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত কাজ হিসাবে কৃষকদের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা এবং গৃহপালিত পশুর উপরন্তু তদারকি করে থাকে। গরু বাছুরের উন্নতিসাধন সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কোন বৎসর কি পরিমাণ গবাদি পশু পরীক্ষা করা হয়েছে তার একটি হিসাব দেখানো হলো (তালিকা – ৬)ঃ

তালিকা – ৬

মিল্ক ভিটা'র পশু পরীক্ষার পরিমাণ

বৎসর	গৃহপালিত জন্তু পরীক্ষার পরিমাণ
১৯৭৭-৭৮	১৭,২৪৩
১৯৭৮-৭৯	৩০,৫৯৫
১৯৭৯-৮০	২১,৫৯৪
১৯৮০-৮১	২৭০০৭
১৯৮১-৮২	৩৪,১৫৫
১৯৮২-৮৩	২৩,৩০৪
১৯৮৩-৮৪	২৪,৭৪১
১৯৮৪-৮৫	২০১৮৮
১৯৮৫-৮৬	১৭৬৪১

সূত্রঃ BMPCUL

"Milk Vita"– বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি তৈরি করে থাকে। নিম্নে এর উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ একটি সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো (তালিকা – ৭) ঃ

তালিকা – ৭
মিল্ক ভিটা'র উৎপাদন

বৎসর	তরল দুগ্ধ (লিটার)	মাখন (পাউণ্ড)	এফ. সি. এমপি (পাউণ্ড)	আইসক্রিম (লিঃ)	ঘি (সিস)	অন্যান্য দুধ (লিঃ)
১৯৭৪–৭৫	১৯,৮৫,৪৮৫	—	—	—	—	—
১৯৭৫-৭৬	৪৭,২০,৪৮৩	—	—	—	—	—
১৯৭৬–৭৭	৫৯,২২,৩৫৯	৭৩,৯২১	১,৫৭,৯৭৮	—	৫১০	—
১৯৭৭–৭৮	৭৮,৫৮,৪৫৩	১,১৯,৭৭৩	৩,৭৯,৮৫৯	৩০,১০১	১,৩০১	—
১৯৭৮–৭৯	৬৯,৯১,২১৫	১,৩৪,১১৫	৪,৯৩,৫৯৬	৬১,৩৯৫	৭১১	—
১৯৭৯–৮০	৭৯,৭৯,৩৯৯	১,৪৮,৫৭৮	৩,৬২,৬৫১	৬০,৩৭৮	১,৯১২	—
১৯৮০–৮১	১০২,০৩,৪০৪	১,৭০,১২০	৩,৭৪,৭২৮	৭৫,৪০০	৪৯৭	—
১৯৮১–৮২	৭৯,৩৪,৪৫৯	৭৬,০৬৮	৩,৬২,৯১৩	৭৯,০৪৫	২৮৭	১,৮৯,২০০
১৯৮২–৮৩	৭৮,৮২,২৬৪	১,৫৩,১৫২	৪,০৭৩৮৩	৭৯,৫৩৩	১,৩৩৫	২,৫৪,০১৪
১৯৮৩–৮৪	৭২,৫৩,৮৪৪	২,৩৬,৪১৪	১,৭৯,০০০ Kg.	৭০,৮৮১	১৯,৯১৯ Kg.	৩,৫০,৮১২
১৯৮৪–৮৫	৬১,০৫,২২৯	১,৫৬,৯৯৩	৯,৯৯২ Kg.	৫৫,৭৪৩	৩,৮২৮ Kg.	৩,৭৫,৪৬৫
১৯৮৫–৮৬	৫৫,৫৫,৯০৪	১৫৬,০৬৫	১,২৯৯ Kg.	৪৫,১৮২	৫,৫৪৪ Kg.	৫,৪৭,৫৫২

সূত্রঃ BMPCUL

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড ভারতের "AMUL" নামক দুগ্ধ খামারকে নমুনা হিসাবে অনুসরন করে থাকে। "AMUL" সরাসরি দুধ বিক্রী করার দায়িত্ব পালন করে না। তারা City Co-operative এর নিকট দুধ বিক্রয় করে থাকে। যেহেতু "AMUL" মুনাফা অর্জন করে থাকে, সেই কারণে গ্রাম্য উৎপাদকদেরকে তারা ভাল মূল্য প্রদান করে থাকে। অপরপক্ষে "City Co-operative" –"AMUL" এর নিকট হতে ক্রয়কৃত দুধ জনগণের নিকট ক্ষতিতে বিক্রয় করে থাকে। কারণ তাদের ক্ষতির পরিমাণটা সরকার বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রদান করে থাকে। "BMPCUL"– এর কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এটা উভয় প্রকার কাজই সম্পন্ন করে থাকে। তারা টেকেরহাটের মতো বহু দূরদূরান্ত থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করে এবং উচ্চ পরিবহণ ব্যয়ের মাধ্যমে ঢাকার কারখানায় (Factory) নিয়ে আসেন। "BMPCUL" পুনরায় প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। এর ফলে "BMCUL" এর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় অনেক। পৃথিবীর অনেক দেশই দুগ্ধ

খামারের উপর মুনাফা অর্জন করতে পারে না। "BMPCUL" এর সমস্ত সমস্যাগুলো সরকারকে অভিহিত করা হয়েছে ও কিছুসংখ্যক সমস্যার সমাধানও হয়েছে এবং বাকিগুলো বিবেচনাধীন রয়েছে।

গ. কুমিল্লা সমবায় সমিতি

কুমিল্লা সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নিকট দুধ হতে দুগ্ধ ক্রয় করে থাকে কারখানার জন্য। দুগ্ধবতী গরু এবং দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদেরকে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ গ্রামগুলো হতে দুধের সরবরাহ খুব কম হয়। সেই কারণে অনেক দূরবর্তী এলাকা হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত সামগ্রী আভ্যন্তরীণ এবং বড় বড় শহরে বিক্রয় করা হয়। ঢাকা ও চিটাগাং এ মাখন এবং পনির সরবরাহের জন্য কমিশনের ভিত্তিতে এজেন্ট নিয়োজিত আছে। কেন্দ্রীয় সমবায় এই সকল উৎপাদিত পণ্য আরও অনেক জায়গায় সরবরাহ করে থাকে।

ঘ. ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠান

ব্যক্তিমালিকানার কতকগুলো প্রতিষ্ঠান দুগ্ধ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছে। যেমন চিটাগাং এর "K Rahman" প্রতিদিন ৪,০০০ লিটার দুগ্ধ দ্বারা আইসক্রীম তৈরি করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় আড়তদাররা পাইকারদের নিকট হতে দুগ্ধ ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে।

RAMDOSS Library Dhaka

বাংলাদেশে বৎসরভিত্তিক দুধের উৎপাদন জেলা ভিত্তিতে কয়েক বৎসরের উৎপাদনের চার্ট নিম্নে দেয়া হলো (চলতিমূল্যে)

তালিকা - ৮

বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন

	দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (হাজার টাকা)				
জেলা (পুরাতন)	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩
চট্টগ্রাম	২,২০,৯৩৩	২,৭৫,৫০০	২,৬৩,৮৯০	১,৮১৪৯০	২,০৬,৩৮৮
পাঃ চট্টগ্রাম	২৭,৩৩৯	৩৪,১৫৭	৩২,৭১৭	৩৯,২৫০	৩৪,৫৮৯
কুমিল্লা	২,৯৩,৮১৬	৩,৬৬,২৮৫	৩,৫০,৮৪৯	২,৮০,৩১৭	২,৯৫,৩০৩
নোয়াখালী	১,৬৮,৭১৯	২,১০,৩৩৩	২,০১,৪৬৯	১,২৩,৮৮৮	১,২৮,৬৫১
সিলেট	২,৪৫,৫০৮	৩,০৬,০৬২	২,৯৩,১৬৩	৩,৩৬,৪৫২	৩,৭৩,৮৮৩
ঢাকা	৩,৬৪,১১৫	৪,৫৩,৯২৪	৪,৩৪,৭৯৪	২,৯৬,০০১	৩,১৪,৬২৬
ফরিদপুর	২,০৫,৮৫১	২,৫৬,৬২৪	২,৪৫,৮০৯	১,৭৯০৯৯	১,৯৪৯৮৭
জামালপুর	১,০৫,৬৩০	১,৩১,৬৮৩	১,২৬,১৩৩	৭৭,৯৮৮	৯০,৫২৬
ময়মনসিংহ	২,৮৯,৮৫০	৩৬১,৩৪১	৩,৪৬,১১৩	৩,০০,২১৩	৩,২৯,৭৪১
টাঙ্গাইল	৯৮,৪১৯	১,২২,৬৯৪	১,১৭,৫২৪	১,১৫,১৮৭	১,২৪,১৩৩
বরিশাল	২,০৫,৮৫১	২,৫৬,৬২৪	২,৪৫,৮০৯	১,৯৪,৯২৪	২,২৭,৭৩০
যশোর	১,৫৫,০১৯	১,৯৩,২৫৫	১,৮৫,১১০	২৯৬,০৫০	২০৭,৮১১
খুলনা	১৭৮৪৫৩	১,২২,৪৬৮	২,১৩,০৯২	২,৩০,৭৮৯	২,৫২,৮০০
কুষ্টিয়া	৮৬,৮০৩	১,০৮,৩১৩	১,০৩,৪৭৮	৯২,২৩১	৯৩,৯৭৪
পটুয়াখালী	৮১,৪৭৫	১,০১,৫৭১	৯৭,২৯১	১,০৮,৭৩০	১,১৬,২৫৫
বগুড়া	১,১৭,৮৮৭	১,৪৬,৯৬৩	১,৪০,৭৭০	১,৪১,১৪১	১৫০,০০৬
দিনাজপুর	১,৩৭,৩৫৪	১,৭১,২৩৩	১,৬৪০১৭	২,০১,২৯২	২,২১,৮৯১
পাবনা	১,৩১,৯৪৭	১,৩৪,৪৯১	১,৫৭,৫৫৯	১,৪৪,২৯৫	১,৫৫,১৬৮
রাজশাহী	২১২,৭০১	২,৬৫,১৬৪	২,৫৩,৯৮৯	২,৬৫,১৩০	৩,০৭,৯২১
রংপুর	২,৭৭,২৩৩	৩,৪৫,৬১১	৩,৩১,০৪৬	৩,৬৪,০১২	৪,১৮,৭৮৬
বাংলাদেশ	৩৬,০৫১০৩	৪৪,৯৪,২৯৬	৪৩,০৪,৮৯২	৩৮,৬৭,৯১৯	৪২,৪২,১৬৭

সূত্রঃ বি. বি. এস.

বন্টন প্রণালী

খুচরা দোকানঃ সাভার ডাইরী ফার্ম এবং মিল্ক ভিটা হতে প্রক্রিয়াজাত দুধ ভোক্তার নিকট বিক্রয়ের জন্য খুচরা দোকানে আসে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এ দুধ বন্টিত হয়। খুচরা দোকানীর কাজ হলো এ প্যাকেট দুগ্ধগুলো বিক্রয় করা এবং প্রতি প্যাকেট দুধের উপর তারা নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকে। সাভার ডাইরী ফার্ম তাদের নিজস্ব গাড়ি দ্বারা খুচরা দোকানে দুধ সরবরাহ করে থাকে এবং ভোক্তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ে খুচরা দোকান হতে দুধ ক্রয় করে নিয়ে যায়। বর্তমানে অনেকগুলো খুচরা দোকানে দুধ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

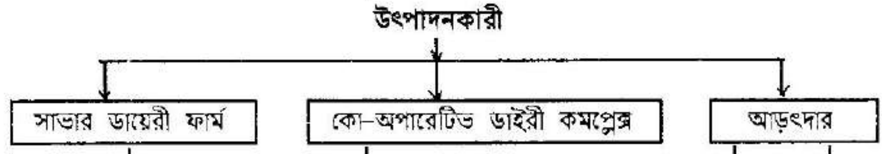

চিত্র – ১ঃ দুধের বন্টনপ্রণালী

বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের অনেক জায়গায়ই বাড়িতে বাড়িতে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। গোয়ালরা নিজস্ব গাভীর দুগ্ধ অথবা আড়ৎ হতে দুধ ক্রয় করে বাসায় বাসায় ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

ভোক্তা

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যতায় ভুগছে। উচ্চ আয়ের লোক, সরকারী চাকুরীজীবী এবং শিক্ষিত লোকরাই সাধারণত দুধ ক্রয় করে থাকে। অপ্রক্রিয়াজাত দুধের দামই আমাদের দেশে বেশি দেখা যাচ্ছে।

টিনজাত দুধের মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম পড়ে থাকে। প্রক্রিয়াজাত দুধের দাম কমানো গেলে ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তরল দুধের স্বল্পতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক দিকের বিবেচনায় মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের লোকেরা গুড়ো দুধ ব্যবহারকেই

অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দুধের বাণিজ্যিক ব্যবহারকারিগণও গুড়ো দুধের ব্যবহারই লাভজনক বলে মনে করে। গুড়ো দুধ প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত।

মূল্য কাঠামো

কতিপয় কারণের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কারণগুলো হলোঃ

১. বিভিন্ন ধরনের পরিবহণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হয়।
২. বিভিন্ন দূরত্ব হতে দুধ আসার দরুন মূল্যের পার্থক্য হয়।
৩. বাজারে পাস্তরিত এবং অপাস্তরিত দুধ পাশাপাশি পাওয়া যাওয়ায় মূল্যের পার্থক্য ঘটে।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দুটো পৃথক ব্যয় কাঠামো নিম্নরূপে তৈরি করা যেতে পারে।

ক. অপাস্তরিকৃত দুধের মূল্য কাঠামো

তালিকা –৯

অপাস্তরিকৃত দুধের মূল্য বিস্তার

বিবরণ		মোট (মণপ্রতি)	ভোক্তার দেয় মূল্যের শতাংশ
নাভিদকান্দি বাজারে উৎপাদনকারীকে দেয় মূল্য বেপারীর খরচঃ		টাকা ৩২০.০০	৭২.৭৩%
পরিবহণ			
নাভিদকান্দি বাজার-বাসস্ট্যাণ্ড ২ মাইল			
রিকসা ভ্যান	৫.০০		
নাভিদকান্দি—ঢাকা ৩০ মাইল	৭.০০		
বাস	৯.০০		
বেপারীর নিজ ভাড়া			
গুলিস্তান—রথখোলা আড়ত			
রিকসা (১ মাইল)	৬.০০		
রথখোলা আড়তের খাজনা	৩.০০		
		৩০.০০	৬.৮২%
বেপারীর মার্জিন		৬০.০০	১৩.৬৪%
আড়তদারের কমিশন		৩.০০	০.৬৮%
খুচরা কারবারীর দেয় মূল্য			
		৪১৩.০০	
খুচরাকারবারীর খরচ পরিবহণ		১০.০০	২.২৭%
মুনাফা		১৭.০০	৩.৮৬%
ভোক্তার দেয় মূল্য সেরপ্রতি ১১ টাকা		৪৪০.০০	১০০%

উৎসঃ লেখকের ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধান, ১৯৮৭

খ. পাস্তরিকৃত দুধের খরচ কাঠামো

দুটো ডায়েরী ফার্মের মাধ্যমে পাস্তরিত দুধ সাধারণত বাজারে আসে। দুটি খামারের মধ্যে একটিতেও ব্যয় নির্ধারণের কোন নিয়মকানুন নাই। আমাদের সীমিত সম্পদ দ্বারা পাস্তরিত দুধের সঠিক ব্যয় কাঠামো নির্ধারিত করা সম্ভব নয়। কি ভাবে পাস্তরিত দুধের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং ব্যয় কাঠামোর একটা সাধারণ ধারণা আমরা পেতে পারি নিম্নের তালিকা হতে।

তালিকা - ১০

পাস্তরিত দুধের মূল্য বিস্তার

খরচের খাত	লিটার প্রতি খরচ (টাকায়), ১৯৮৭
কাঁচা দুধ	২.৫৪৯
মিশ্রণ	৩.৬৬৪
প্যাকিং	০.৩৯০
সামাজিক খাত	০.২২২
পরিবহণ	০.৩১০
কারখানা	০.৯৬৬
বাজারজাতকরণ	০.১৯৯
প্রশাসনিক	০.৫২২
অবচয়	০.৫৭০
ঋণের সুদ	১.১৩৫
কমিশন	০.৫৭৫
বিক্রয় মূল্য	টাকা ১১.০৯৯

সূত্রঃ BMPCUL

মিল্ক ভিটার নির্ধারিত মূল্য হলো লিটার প্রতি ১১.০০ টাকা। তারা মিরপুরের রিক্সা ভ্যানের নিকট বিক্রয় করে ১০.৩৫ টাকা এবং সূত্রাপুরের রিক্সা ভ্যানের নিকট বিক্রয় করে ১০.৪০ টাকা। তারা আবার খুচরা দোকানে বিক্রী করে ১০.৭০ টাকা। খুচরা বিক্রেতাগণ বিক্রী করে ১১ টাকাতে। অতএব মিল্ক ভিটার গড় বিক্রয় মূল্য দাঁড়ালো ১০.৪৮ টাকা। অর্থাৎ প্রতি লিটারে তাদের .৫২ টাকা ক্ষতি হচ্ছে।

উপরিউক্ত ব্যয় কাঠামো হতে সঠিক বাজারজাতকরণ ব্যয়টা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে, উৎপাদনকারীরা বিক্রয়মূল্যের ৫৪.৫৫% পায় এবং বাকি ৪৫.৫৫% বাজারজাতকরণ খরচ পড়ে।

খুচরা বাজারে মূল্যের উঠানামার প্রবণতা

নিম্নের ছকের সাহায্যে কয়েক বৎসরের মূল্যের উর্ধ্বগতি দেখানো হলোঃ

অপাস্তরিত দুধের মূল্য

বৎসর	১৯৮২ টাকা	১৯৮৩ টাকা	১৯৮৪ টাকা	১৯৮৫ টাকা	১৯৮৬ টাকা
প্রতি মণের খুচরা গড় মূল্য গড় মূল্য (অপাস্তরিত দুধ)	৩২০.০০	৩৪০.০০	৩৮০.০০	৪০০.০০	৪৪০.০০

উৎসঃ রথখোলার দুগ্ধ আড়তদার সমিতি

উপরের ছক হতে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে যে, দুধের মূল্য সর্বদা উর্ধ্বদিকে যাচ্ছে। এর কতগুলো কারণ আছে। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. দুধের উৎপাদন নিম্ন গতি,

২. পরিবহণ ব্যয় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে,

৩. বেপারী আড়তদার এবং খুচরা ব্যবসায়ী সকলেই অধিক পরিমাণে লাভ রাখছে।

বর্তমান চাহিদা ও যোগান

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে দুধের চাহিদা আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দুগ্ধ উৎপাদন করবার মত আমাদের সে রকম গাভী নেই। এদেশে বেশিরভাগ দুধই ব্যবহৃত হয় মিষ্টির দোকান এবং চায়ের দোকানে। আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে একমাত্র সাভার ডায়েরী দুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া কয়েকটি সমিতি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু দুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে।

এছাড়াও আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আছে, যারা খুবই অল্প পরিমাণে অনুন্নত দুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের দুধের মোট চাহিদা রয়েছে পাঁচ কোটি লিটার। সুতরাং উপরের তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এদেশে প্রচুর পরিমাণে দুধের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যা নাকি আমদানিকৃত টিনজাত দুগ্ধ দ্বারা কিছুটা পূরণ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে তরল দুধের চেয়ে আমদানিকৃত দুধের মুল্য অনেক কম পড়ছে বলে অনেকেই তা ব্যবহার করে আসছে। যেমন "DANO" দুধ এ দেশে ১৩০/= টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। অথচ ডেনমার্কে এর প্রতি পাঁচ পাউণ্ডের টিনের উৎপাদন খরচেই পড়ছে এর অনেক বেশি কারণ ঐ সমস্ত দেশের সরকার তাদের দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সব সময়ই ভর্তুকী দিয়ে আসছে। এই কারণেই তারা স্বল্প মুল্যে দুগ্ধ বিক্রী করতে পারছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার সে রকম কোন ভর্তুকী দেন না।

প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বিদেশ হতে আমদানি করা হয়ে থাকে। কোন বৎসর কি পরিমাণ দুগ্ধ আমদানি করা হয়েছে নিম্নে উহার একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

তালিকা – ১১

বাংলাদেশে দুধ আমদানি

বৎসর	পরিমাণ (টন)
১৯৭৭–৭৮	৩,০০০
১৯৭৮–৭৯	৪,০০০
১৯৭৯–৮০	৩,৫০০
১৯৮০–৮১	৪,৮০০
১৯৮১–৮২	৯,০০০
১৯৮২–৮৩	১০,০০০
১৯৮৩–৮৪	১৩,০০০

সূত্রঃ বি, এস, এস

যোগানের উৎস

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে দুগ্ধ সংগ্রহ করে তাহা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. **মিল্ক ভিটা** ঃ তারা ঢাকা, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর এবং বাঘাবাড়ী ঘাট (পাবনা) হতে দুধ সংগ্রহ করে। প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তাহারা তরল দুধ, মাখন, গুড়া দুধ, ঘি, আইসক্রীম এবং সুগন্ধী দুধ হিসাবে বিক্রী করে থাকে।

২. **সাভার ডেইরী ঃ** তারা প্রথমত তাহাদের নিজস্ব খামারের গরুগুলো হতে দুগ্ধ আহরণ করে থাকে। এবং মানিকগঞ্জ ঘিওর, সিবালয়, দৌলতপুর, নাগরপুর, পাবনা এবং গোয়ালন্দ হতেও দুগ্ধ সংগ্রহ করে থাকে। তরল দুগ্ধ, ক্রীম, মাখন, ঘি প্রভৃতি প্যাকেট আকারে বিক্রয় করে থাকে।

৩. **কে. রহমান ঃ** চিটাগাং এর অধিকাংশ জায়গা হতে তারা দুধ সংগ্রহ করে থাকে এবং অধিকাংশ দুগ্ধ দ্বারাই আইসক্রীম তৈরি করে।

৪. **কুমিল্লা দুগ্ধ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ঃ** তারা সাধারণত নিজস্ব সদস্যদের নিকট হতেই দুগ্ধ সংগ্রহ করে। সংগৃহীত দুগ্ধ দ্বারা তারা মাখন, ক্রীম এবং পনিরই বেশিরভাগ তৈরি করে থাকে।

৫. **ব্যক্তি মালিকানা ঃ** ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন জায়গা হতে কম মূল্যে দুগ্ধ সংগ্রহ করে অন্যত্র বেশি দামে বিক্রয় করে থাকে। উদাহরণ হিসাবে ঢাকার রথখোলার দুধের আড়ৎ এর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। তারা সাধারণত ফরিদপুর, পাইনাপচন্দি, (কেরানীগঞ্জ), বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ, সোয়ারীঘাট, ডেমরা, শ্রীনগর, লৌহজং, আটিরেকাবি বাজার, আব্দুল্লাহ বাজার, তালতলা প্রভৃতি জায়গার দুধ তাদের এখানে আমদানি হয়।

উৎপাদক

দুগ্ধ সরবরাহের জন্য উৎপাদকরাই হয় প্রধান। তারা সাধারণত বেপারী, গ্রাম্য সংগ্রহকারক, প্রাথমিক সমবায় এবং উপ-ঠিকাদার এর নিকট দুধ বিক্রি করে থাকে। এছাড়া কোন কোন সময় ভোক্তাদের বাড়িতেও দুগ্ধ বিক্রয় করে থাকে। উৎপাদক সাধারণত দুধ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে না। কারণ মোট দুধের তুলনায় তার পরিমাণ খুবই অল্প। এই কারণে দূরবর্তী বাজারে গিয়ে দুধ বিক্রয় করাতে তার লাভ হয় না।

গ্রামীণ সংগ্রহকারকঃ এরা উৎপাদনকারী এবং বেপারীর মধ্যে যোগাযোগ রাখে। গ্রাম্য সংগ্রহকারকদের প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন গ্রাম হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা এবং বেপারীর নিকট বিক্রয় করা। গ্রাম্য সংগ্রাহকরা সকলেই স্থানীয় লোকজন হয়ে থাকে। তারা সাধারণত প্রতিদিন ২০-৩০ সের দুগ্ধ ক্রয় করে থাকে।

বেপারীঃ তারা উৎপাদক, গ্রাম্য সংগ্রহকারক প্রভৃতির নিকট হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করে এবং এগুলো শহরে নিয়ে আসে বাস, মটর লঞ্চ, নৌকা এবং রেলের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে বেপারীই বাজারজাতকরণের জন্য অধিকাংশ কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

আড়তদারঃ আড়তমালিকরা মধ্যস্থকারবারী হিসাবে বেপারী এবং ক্রেতাকে সাহায্য করে থাকে। আড়ৎদার প্রকৃতপক্ষে কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। তারা বেপারীদের নিকট হতে আড়তদারী হিসাবে প্রতিমণ দুধের উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকে। বেপারী আড়ত –এর মাধ্যমে তার দুধগুলো বিভিন্ন দূরত্বে জায়গায় বিক্রয় করে থাকে। আড়তদাররা বেপারীদের দুধগুলো "লেকটোমিটার" নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে থাকে। কিন্তু আজকাল পাউডার দুধের মিশ্রণের ফলে যন্ত্র দ্বারা দুধের সঠিকতা নির্ণয় করা যায় না।

প্রাথমিক সমবায়ঃ এরাই প্রকৃতপক্ষে সমবায় সংগঠন। প্রাথমিক সমবায়ের উদ্দেশ্য হলো নগদ মূল্যে উৎপাদকদের নিকট হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা। তারা তাদের নিজস্ব সদস্য এবং সদস্য নয় এমন উৎপাদকদের নিকট হতেও দুগ্ধ সংগ্রহ করে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা কেন্দ্রীয় সমবায়ের নিকট দুধ বিক্রয় করে এবং মুনাফার উপরে বৎসরের শেষে সদস্যরা লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।

ঠিকাদার এবং অধীন ঠিকাদারঃ ঠিকাদার হয় ডায়েরী ফার্মের এজেন্ট। তারা পুনরায় অধীন ঠিকাদারদের নিযুক্ত করে থাকে। অধীন ঠিকাদারদের কাজ হল উৎপাদকদের নিকট হতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা। তারা ঠিকাদারের নিকট হতে কমিশন পেয়ে থাকে। অপরপক্ষে ঠিকাদাররা ডায়েরী ফার্মের নিকট হতে কমিশন পেয়ে থাকেন।

বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশে দুধের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা তত জটিল নয়। কারণ চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চলে দুধের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ। গ্রামের কৃষকগণ দুই একটি গাভী পালন করে এবং তাদের উৎপাদিত দুগ্ধ সরাসরি গ্রাম্য বাজারে ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু বড় বড় ডেইরী ফার্মগুলোতে দুধের বিপণন ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরনের। যেমন সাভারে অবস্থিত ডেইরী ফার্মে উৎপাদিত দুধ তাহারা প্রথমে প্যাকেট আকারে রাখে। এই দুধ তারা ভোক্তাদের নিকট আগে হতেই কুপনের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে। যে আগে কুপন ক্রয় করতে পারবে সেই ব্যক্তিই দুধ নিতে পারবে। আর অতিরিক্ত দুধ ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীর জন্য সরবরাহ করে থাকে। মিল্ক ভিটা প্রথমে ভ্যানগাড়ীওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করে। তারা আবার খুচরা দোকানীদের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

আবার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, কিছু মধ্যস্থকারবারী তাদেরকে গোয়ালা বলা হয়, তারা চর অঞ্চল হতে (যেখানে অনেক গরু মহিষ থাকে) দুধ ক্রয় করে একটু প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ দধি করিয়া বিক্রয় করে। সুতরাং দুধের উৎপাদন ক্ষমতা যেমন অপ্রতুল, তেমনি ইহার বিপণন ব্যবস্থা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে)।

বাংলাদেশে দুধের উৎপাদন কম হওয়ার কারণসমূহ

বাংলাদেশে দুধের উৎপাদন কম হওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. অশিক্ষিত কৃষকঃ দুগ্ধবতী গাভীকে কি পরিমাণে খাদ্য দিতে হবে তা আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষকরা জানে না। কোন গাভীকে কি পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে এই সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে গাভী তার প্রয়োজনমতো খাদ্য পায় না ফলে দুধের পরিমাণও কম হয়। গাভীর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ আমিষ, শর্করা, চর্বি, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। দুগ্ধবতী গাভীর জন্য ঘাস, খড়কুটা, ও খেসারির ডাল ইত্যাদি আঁশযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যথায় দুধে চর্বির অংশ হ্রাস পাবে। দুধের স্বাদ, গন্ধও অনেকাংশে খাদ্যের উপর নির্ভর করে। উপরিউক্ত কাজগুলো সম্পর্কে আমাদের কৃষকরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এই জন্য দুধের পরিমাণও কম হয়।

খ. ব্যায়ামের অভাবঃ আমাদের কৃষকরা গাভীর ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেন না। ফলে আশানুরূপ দুধও উৎপাদিত হয় না।

গ. জাতঃ আমাদের দেশের গাভীগুলোর জাত সাধারণত অনুন্নত। এই জাতের প্রকারভেদের দরুনও আমাদের দেশে দুধের পরিমাণ কম হয়।

ঘ. পারিপার্শ্বিক অবস্থাঃ বাসস্থল এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা দুধের পরিমাণ হ্রাসের জন্য দায়ী। আমাদের কৃষকগণ গাভীর জন্য কোন আরামদায়ক বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। খাদ্য ব্যবস্থাও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে হয় না। ফলে গাভী হতে উৎপাদিত দুধের পরিমাণ কম হয়।

ঙ. দোহন প্রণালীর আদিমতাঃ ওলানের দুগ্ধধারণ ক্ষমতা সীমিত। দোহনের অব্যাহতি পরে দুগ্ধ ক্ষরণ হয় সর্বাধিক। ওলানের দুধের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে দুগ্ধ ক্ষরণ হ্রাস পেতে থাকে এবং ওলান দুধে পূর্ণ হলে দুগ্ধক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের কৃষকরা উপরিউক্ত অবস্থা সম্পর্কে কোন চিন্তা করেন না। তারা যে কোন সময় ইচ্ছামাফিক দুগ্ধ দোহন আরম্ভ করে। এই জন্য উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। তাছাড়া দোহনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনও তাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে।

তালিকা – ১২ ঃ বাংলাদেশে ও দুগ্ধ ব্যবসায়ে উন্নত দেশসমূহের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার

	উৎপাদন			ব্যবহার				
দেশ	গাভী (মিলিয়ন)	মাথাপিছু উৎপাদন (পাউণ্ড)	দুগ্ধ উৎপাদন মিলিয়ন (পাউণ্ড)	তরল দুগ্ধ মিলিয়ন (পাউণ্ড)	মাখন মিলিয়ন (পাউণ্ড)	পনির মিলিয়ন (পাউণ্ড)	টিনজাত দুগ্ধ মিলিয়ন (পাউণ্ড)	অন্যান্য কার্যে ব্যবহার মিলিয়ন (পাউণ্ড)
কানাডা	২.৯১	৬,৬৪৪	১৯,৩৬৭	৭,১১০	৮,৩৪৬	১,৬৭৫	৭০৬	৭৭৪
যুক্তরাষ্ট্র	১৬.৫৩	৭,৫৪৫	১,২৪,৭৮৩	৫৮,৮০০	৩১,০৫৫	১৪,৮৩৩	৪৯৫১	১২,৮৬৫
অস্ট্রিয়া	১.১১	৬,০৮৪	৬,৭৫৯	২,৪০৫	২,০১৭	৬০২	৩৩	৫২০
বেলজিয়াম	১.০৪	৮,৪৫৬	৮,৮০৩	২,২৮৮	৪,৭৫৪	৪৪০	১৭৭	৪৪০
ডেনমার্ক	১.৪০	৭,৯৬৯	১১,২২৯	১,৯০৪	৬,৪৯৭	১,৭১৭	—	৩,৬৬১
ফিনল্যাণ্ড	১.১৯	৬,৯২৭	৮,২৮৫	২,৮২২	৪,৫৬৮	৫৭১	—	৯৫
ফ্রান্স	১০.০৩	৫,৬১৩	৫৬,২৯৬	১১,৮২৭	২১,০৮৩	১০,১২৪	—	৩২,২৭০
পঃ জার্মানী	৫.৯২	৭,৭০৯	৪৫,৬৪০	১২,৪৯১	২৩,৩৫২	২,৭২২	২,৫০১	৪,২৯৮
আয়ারল্যাণ্ড	১.৩১	৪,৮৬৯	৬,৪১৭	১,৪২১	৩,৩৭৪	১৯৬	—	৩,৫০৫
ইতালী	৩.৩৩	৬,২৬১	২২,২২৩	৫,৭৬৬	৩,৬৫৪	৭,৩৫৮	—	৩,১১১
নেদারল্যাণ্ড	১.৭৫	৮,৮৯৫	১৫,৫৬৭	২,২১০	৫,০২৮	৪,৪৩৯	২০৮৬	১,১৫২
সুইডেন	১.২৫	৬,৯০০	৮,৬১৩	৩,১৪২	৪,১০০	৪৭৫	২	১৬৩
যুক্তরাজ্য	৪.২৬	৬,৮১০	২৯,০১০	২৯,৪০১	২,৯০৩	২,৪৯৬	৯৪৫	১,১১৪
অস্ট্রেলিয়া	৩.২৬	৪,৭০৭	১৫,৩৫৬	৩,৩১০	৯,৭৬৯	১২৯৭	—	৩,৮৯৭
নিউজিল্যাণ্ড	১.৯৯	৬,০১৩	১২০০৮	১,১৭৮	৮,৩৭৯	১৪৯৯	—	৩,২২২
বাংলাদেশ	৪.০৯	২০০	৮১৮	—	—	—	—	—

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান তত্ত্ব হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে গাভীর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়াসত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ খুবই সামান্য।

বাংলাদেশে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়সমূহ

বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনের তুলনায় দুধের অপ্রতুলতার জন্য বর্তমানে খামারের মাধ্যমে দুধের চাহিদা মিটাবার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছে। সরকারের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে, যদি খামারগুলো উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা যায়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে দুধের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

১. **গাভী প্রতি উৎপাদনঃ** খামারের প্রতিটি গাভীর নিজস্ব দুগ্ধ উৎপাদনের নিম্নতম একটা সীমা থাকতে হবে। কোন গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন এই সীমার নীচে গেলে অর্থনৈতিক কারণে এটাকে খামারের অনুপযুক্ত মনে করা উচিত। কতক উৎকৃষ্ট গাভীর নাম ভাঙ্গাইয়া নিকৃষ্ট গাভী খামারে রাখার কোন যুক্তিকতা নাই। প্রতিটি গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খামার কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. **খামার পরিচালনার ব্যবস্থাঃ** খামারের আয় ব্যয় উন্নতি–অবনতি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে খামার পরিচালনার উপর। চব্বিশ ঘন্টার কখন কি পরিমাণ এবং কিভাবে গাভীকে খাওয়ানো হবে, গোয়ালঘর, দোহন ও চালানের ঘর কিভাবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, কিভাবে কেমন করে স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান মতে দোহন করা যায় ইত্যাদি জানতে হবে। কি করে উপযুক্ত কার্যকরী প্রজনন পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভবপর, কি উপায়ে খামারটিকে রোগমুক্ত রাখা যায় ইত্যাদি বহু সমস্যার সঙ্গে খামার পরিচালন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। খামার পরিচালককে অশেষ গুণসম্পন্ন হতে হবে। দায়িত্বভার গ্রহণে তিনি হবেন সর্বোতভাবে সক্ষম। তিনি হবেন সৎ, সাধু, বিশ্বাসভাজন ও সকলের সঙ্গে সদালাপী ও বন্ধুভাবাপন্ন। অন্যের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে দোষমুক্ত করার চেষ্টা হতে তাকে বিরত থাকতে হবে। সর্বোপরি নিজ কার্য সম্বন্ধে তার উপযুক্ত দক্ষতা ও জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. **উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থাঃ** কোন গাভীর খামার প্রতিষ্ঠা করার পূর্বেই সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উপযুক্ত চাহিদা ও বাজারজাতকরণের সুযোগ–সুবিধা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কি ধরনের বাজার বর্তমান, কোন জিনিসের কেমন চাহিদা, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা, যানবাহন বা রাস্তাঘাটের সুযোগ–সুবিধা ইত্যাদি বহু তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাভী খামার প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে হবে। গাভী খামার এমন একটি প্রতিষ্ঠান নয়, যা রাতারাতী আরম্ভ করা যায় বা খেয়াল খুশিমত হঠাৎ বন্ধ করা যায়। সমস্ত দিকে ভালভাবে বিবেচনা করে দুগ্ধ ব্যবসায় অবতীর্ণ হতে হবে।

৪. **গাভীর জাতঃ** স্থানীয় আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জাতের উপযুক্ত কিনা বিবেচনা করা দরকার। কোন জাতীয় গাভী স্থানীয় পরিবেশে খাপখাওয়াতে সক্ষম হবে সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. গাভীর সংখ্যাঃ গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই সে সংখ্যানুপাতে খামারের দুগ্ধ বৃদ্ধি পাবে, এটা সব সময় ঠিক নয়। তবে গাভীর মাথাপিছু ব্যয়ভার হ্রাস করতে হলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা স্থির রাখতে হবে। এর নীচে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। খামারের মূলধন বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গাভীর সংখ্যা স্থির করতে হবে।

৬. খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাঃ গাভী খামারের প্রধান সমস্যা গাভী খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। কাজেই খামার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই প্রস্তাবিত খামারের গবাদিপশুর সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। কাঁচা ও শুকনা ঘাস, খড় বিচালী প্রভৃতি খাদ্য নিজস্ব খামারেই উৎপাদন করতে হবে। কাজেই খামারের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন না হলে অধিকাংশ সময় নির্ভর করতে হবে বাইরের ঠিকাদারের উপর। অর্থনৈতিক কারণে শেষোক্ত ব্যবস্থা অতি নিকৃষ্ট। এই ব্যবস্থায় ভাল শ্রেণীর খাদ্য পাওয়াও সব সময় সম্ভবপর হয় না। তদুপরি খাদ্যের দামও অধিক পড়ে। কাজেই এই সমস্ত খাদ্য খামারেই উৎপন্ন করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমির সংস্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন। গাভীর দানা খাদ্য খামারে উৎপন্ন করা সম্ভবপর না হলে বৎসরের উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করে গুদামজাত করে রাখা প্রয়োজন।

৭. খামারের ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতিতে মূলধন নিয়োগঃ সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানোর জন্য উপযুক্ত ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা প্রয়োজনাধিক হওয়া উচিত নয়। ঘরবাড়ি বা যন্ত্রপাতির বৃদ্ধির সময় খামার মালিককে অবশ্যই কতকগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেতে হবে। এর ফলে শ্রম খরচ ও সময় বাঁচে কিনা, অনায়াসে কাজ করা সম্ভবপর কিনা, স্বাস্থ্য রক্ষার বিধানমতে দুগ্ধের গুণ বৃদ্ধি পাবে কিনা প্রভৃতি প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া গেলে যন্ত্রবৃদ্ধির যৌক্তিকতা নাই।

৮. উৎকৃষ্ট দুগ্ধ উৎপাদনঃ গাভী খামারের মুখ্য উদ্দেশ্য দুগ্ধ উৎপাদন, যার উপর নির্ভর করে খামারের সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো। দুধের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুধের মানোন্নয়নের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। দুধের মানোন্নয়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকা দরকার। উৎকৃষ্ট দুগ্ধ লাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত দোহন কাজে ব্যবহৃত পাত্র এবং যন্ত্রপাতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখা। দ্বিতীয় শর্ত, দুধের জীবাণু অনুপাত হ্রাস করা। বিভিন্ন কারণে দুধের জীবাণু সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন ঃ

ক. অপরিষ্কার পাত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার

খ. হিমায়ন পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি। দোহনের দুই ঘন্টার মধ্যে দুগ্ধ চালানের ব্যবস্থা না থাকলে কিংবা আশঙ্কা থাকলে দুধের তাপ অবশ্যই নামিয়ে আনতে হবে।

গ. গাভীর ওলানে কোন প্রকারের অসুখ বা ম্যাস্টাইটিস রোগ দুধের জীবাণু বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উৎকৃষ্ট দুধ লাভের তৃতীয় শর্ত দুগ্ধ অপ্রীতিকর স্বাদ বা গন্ধমুক্ত হতে হবে। খাদ্যের জন্য অনেক সময় দুধে গন্ধ হয়।

দূষিত বায়ু দুধের স্বাভাবিক স্বাদ নষ্ট করার জন্য অনেকাংশে দায়ী। দোহন ও চালানের ঘর অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অতিরিক্ত নড়াচড়ার জন্য অনেক সময় দুধ বা ঘি চর্বি বা মাখনের গন্ধ বা স্বাদ নষ্ট হতে পারে। দুধ তামার সংস্পর্শে আসলে বা বেশিক্ষণ রৌদ্রে থাকলে গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।

উৎকৃষ্ট দুগ্ধলাভের চতুর্থ শর্ত রোগমুক্ত স্বাস্থ্যবান গাভী এবং কর্মচারীবৃন্দ। নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুধ পেতে হলে গাভীগুলোকে অবশ্যই রোগমুক্ত ও উপযুক্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। দোহণ ও সরবরাহ কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদেরও রোগমুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ঐ সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ কালে উপযুক্ত ডাক্তারী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে হবে। পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে তাদের জন্য অন্তত বৎসরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৯. **খামারে নতুন গাভী আমদানিঃ** পালের ১০% হতে ২০%টি গাভীকে প্রতি বৎসর ছাটাই করার দরকার হয়ে পড়ে। সুতরাং খামারের শক্তি বজায় রাখতে হলে ছাটাই করা গাভীর স্থলে নতুন গাভীর আমদানি প্রয়োজন।

১০. **উপযুক্ত নথিপত্র ব্যবহারঃ** গাভী খামারে নথিপত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ ঐ সমস্ত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১. **গাভীর খাদ্যঃ** গাভী খামারে এই খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। এই দিকে মিতব্যয়ী না হলেও খামারকে লাভজনক করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশুকে কখন কিভাবে খাওয়াতে হবে তা বিশেষভাবে জানা দরকার।

১২. **গরুর বংশ বৃদ্ধিঃ** সুস্থ এবং নির্দোষ গাভী সাধারনত প্রতি বৎসর একটি করে বাছুর প্রসব করে। প্রসবের দুই তিন মাসের মধ্যেই পুনরায় গর্ভবতী হওয় বাঞ্ছনীয়। এরপর হতে প্রত্যেকটা দিন বিলম্বের জন্য খামার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। খামারকে লাভজনক পর্যায়ে আনতে হলে গাভীর নিয়মিত গর্ভধারণ যাতে সম্ভবপর হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

বাজারজাতকরণ সমস্যা

বাংলাদেশে দুধ বাজারজাতকরণে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদেরকে কতকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, নিম্নে প্রধান সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. বাংলাদেশে দুগ্ধ বাজারজাতকরণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পরিবহণ ব্যবস্থা। কারণ এদেশের বিভিন্ন জেলা এবং গ্রাম হতে দুধ আনয়নের জন্য যে রকম পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। পরিবহণ ব্যয়ও খুব বেশি এবং তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণত বাস, রেলওয়ে, মোটর লঞ্চ ও নৌকার মাধ্যমে দুধ সর্বত্র পরিবহণ করা হয়। সময়মত গাড়ি না পাওয়া গেলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিগত দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং আড়তদারদের এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বেশি।

২. দুধের প্যাকিং খরচও আমাদের দেশে খুব বেশি পড়ে যায়। প্যাকিং-এর উপাদানগুলো বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। প্যাকিং -এর জন্য দুধের বিক্রয় মূল্য বেড়ে যায়।

৩. দুধ খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। দুধ দোহনের চার ঘন্টার মধ্যে ইহা সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই জন্য প্রয়োজন গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ভাল এবং সমস্ত প্রকার কার্যের জন্যই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। আমাদের দেশে ৪৫% দুধই বাজারজাত করা হয় এই সমস্ত প্রক্রিয়া ছাড়াই।

৪. বিদেশ হতে টিনজাত গুড়ো দুধ এদেশে আসার ফলে দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুধের উৎপাদন দিন দিনই হ্রাস পাচ্ছে। কারণ টিনজাত দুধের দাম তরল দুধের চেয়ে অনেক কম পড়ে।

৫. বাংলাদেশ সরকারের দুধের আমদানি নীতিটি খুবই সহজ পদ্ধতির হওয়াতে, যে কোন লোক সহজেই দুগ্ধ আমদানি করতে পারে। ইহা দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সরূপ দেখা দিয়েছে।

৬. দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কম দামের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার দরুন তা অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে যায়। সেকারণে যন্ত্রপাতির উপর অবচয় বেশি ধরাতে দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেমণ লাভবান হতে পারছে না, তেমনি দুধের মূল্যও বেড়ে যাচ্ছে।

৭. বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিকট হতে কোন রকম সাহায্য পায় না। এই জন্য ক্ষতির পরিমাণটা তাদেরকেই বহন করতে হয়। অপরপক্ষে উন্নত বিশ্বের দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোই সরকারী তরফ হতে সাহায্য পেয়ে থাকে।

৮. বাংলাদেশ সমবায় দুগ্ধ খামারের তথ্য হতে জানা যায় তারা বেশি দামে দুগ্ধ কিনে স্বল্প মূল্যে গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করেছেন। এতে করে তাদের প্রতি লিটার দুগ্ধে ·৫২ টাকা করে ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে।

৯. সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেও বাংলাদেশের দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত।

১০. দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ঋণের উপর সরকারকে অধিক হারে সুদ প্রদান করতে হয়। এদিক হতেও সংগঠনকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১১. প্রক্রিয়াজাত দুধ বাজারজাতকরণের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, সেগুলোর অভাব রয়েছে বাংলাদেশে। যেমনঃ (১) মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র; (২) সমজাতীয়করণ যন্ত্র; (৩) পাস্তরিতকরণ ও প্যাকেটিং সামগ্রী।

উপসংহার

দুধ এমন একটি খাদ্য যার মধ্যে সমস্ত ভিটামিনই বিদ্যমান আছে। সুতরাং এটা শিশু ও রোগীদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় পথ্য। কিন্তু আড়ৎ-এ যে দুগ্ধ পাওয়া যায় সেটা কতকগুলো কারণে মোটেই উপযোগী নয়। যেমন নিম্নমানের তেমনি পাস্তরীকৃতও নয়, ইত্যাদি। ব্যক্তিগত কারবারী এবং সরকারের মিলিত সহযোগিতা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ এই সমস্যার সামাধানের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে উচ্চ পরিবহণ ব্যয়ের জন্য দুধের বিক্রয়মূল্য বেড়ে যায়। সমবায় দুগ্ধখামার এবং সাভার ডায়েরী কিছু পরিমাণে হলেও এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। যাতায়াত ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের উপর এটা নির্ভরশীল।

চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা এই বলতে পারি যে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য দুগ্ধ বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্পে সরকার এবং ব্যক্তিগত উভয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

সপ্তদশ অধ্যায়

তুলা

ভূমিকাঃ মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন লজ্জা নিবারণের উপায় শিখেছে, ক্রমধারায় তেমনি শিখেছে বস্ত্রের ব্যবহার। বস্ত্রের উৎপাদন কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে তুলা চাষকে কেন্দ্র করে। তাই সমগ্র বিশ্বে তুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আঁশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৬০টি কাপড়ের কলের কাঁচা তুলার চাহিদা স্থানীয়ভাবে মেটানোর জন্যে বাংলাদেশেও তুলা চাষের প্রয়োজন অপরিহার্য।

সময়মত কাঁচা তুলা পাওয়ার অসুবিধা, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার দ্রুতমূল্য উঠানামার জন্যে দেশের কাপড়ের কলগুলোর স্বাভাবিক উৎপাদন বা কর্মসূচী ব্যাহত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মাটি রবি মৌসুমে তুলা চাষের জন্যে যথোপযুক্ত হলেও দেশ স্বাধীন হবার আগে তুলা চাষের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশে তুলা চাষে সরকারী উৎসাহ থাকায় তুলার উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে "তুলা উন্নয়ন বোর্ডের" জন্ম হয়। এই বোর্ডের উপরই দেশে মাঝারি আঁশের আমেরিকান তুলা চাষ সম্প্রসারণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মৃত্তিকা জরিপ বিভাগের হিসাবমতে বাংলাদেশে প্রায় ৯.২ লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষ করা যেতে পারে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশ তুলা চাষের জন্যে উপযুক্ত।

বাংলাদেশে তুলা চাষের ইতিহাস

পাকভারত ও বাংলাদেশে তুলার তৈরি বস্ত্রের ইতিহাস খ্রীস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দের পুরানো। বাংলাদেশের তুলার তৈরি অতি মিহি বস্ত্রের খ্যাতি খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ষোড়শ শতাব্দী সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে অতি মিহি বস্ত্র তৈরির কথা বলে গেছেন।

বাংলাদেশ হতে ইরাকে বস্ত্র রপ্তানির কথা আরিফ ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকে ঐ সমস্ত বস্ত্র ইউরোপীয় বাজারেও রপ্তানি করা হতো। যেহেতু ঐ সমস্ত বস্ত্র মসল হয়ে ইউরোপীয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো সেহেতু ওর নাম দেয়া হয় মসলিন। তুলা দিয়ে ঐ সমস্ত বস্ত্র তৈরি করা হতো কাজেই তুলা ছিল তখনকার দিনে অন্যতম প্রধান কৃষিজাত পণ্য।

এককালে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেকালে ঢাকাই মসলিন অন্যতম আশ্চর্য পণ্য হিসাবে গণ্য ছিল। ১৮৫১ সালের বিখ্যাত প্রদর্শনীর (1851 Exhibition of London) সময় বিলাতের বিখ্যাত পত্রিকাগুলো ঢাকাই মসলিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে মসলিন প্রস্তুতকারী ঢাকার তাঁতী সম্প্রদায়ও বাদ পড়ে না।[১] বিলাতের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামে ঢাকাই মসলিন এখনও রক্ষিত আছে।[২] সম্প্রতি ঢাকা মিউজিয়ামেও মসলিন সংরক্ষণ করা হয়েছে।[৩]

ঢাকার ইতিহাস চার'শ বছরের বেশি পুরানো নয়। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৬১০ সালে বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁন চিশতী রাজমহল থেকে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করার পর থেকে ঢাকা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ মোগল আমলের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষ করে পূর্ববাংলার সুতী বস্ত্রের ইতিহাস অনেক পুরানো, স্মরণাতীতকাল থেকে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের বা পূর্ব বঙ্গের সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।[৪] কেউ কেউ মনে করেন যে রোমান আমলে এবং পেরিপলাস ও টলেমির যুগে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের সুনাম ছিল এবং এ দেশীয় সুতার কাপড় রোম সাম্রাজ্য এবং মিশর প্রমুখ দেশে রপ্তানি করা হতো।[৫] নবম শতকে লিখিত আরব ভৌগোলিক সোলায়মানের সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখে রূমী নামক এক রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়; সেখানে এমন সূক্ষ্ম ও মিহি সুতী বস্ত্র পাওয়া যেত যে, যা দিয়ে তৈরি ৪০ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া এক টুকরা কাপড় একটা ছোট অঙ্গুরীর ভিতর দিয়ে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যেত এবং এই রকম সূক্ষ্ম বস্ত্র তিনি আর কোথাও দেখেননি।[৬] রূমী রাজ্যকে বাংলাদেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। [৭] চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আগত মরক্কো দেশীয় মুসলমান পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও-এর সুতী বস্ত্রের বিশেষ প্রশংসা করেন।[৮] পঞ্চদশ শতকের চীনা লেখকরাও বাংলাদেশের সুতী বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৯] ষোড়শ শতকের শেষ পদে আগত ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলও সোনারগাঁও-এ প্রস্তুত মসলিনের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।[১০] ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে আগত পর্তুগীজ পর্যটক ডুয়াটে বারবোসীও বাংলাদেশের সুতী বস্ত্রের কিঞ্চিত বিবরণ দিয়েছেন।

কার্পাস উৎপাদন ও সংগ্রহ

ঢাকাই মসলিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কার্পাস উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে কাপড় তৈরি হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরেই ঢাকা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ঢাকার মাটিতেই কার্পাস জন্মাত। মসলিন ছিল পুরোপুরি দেশজ শিল্প। একমাত্র রপ্তানি ছাড়া আর কিছুর জন্যে ঢাকাই মসলিন বাইরের জগতের উপর নির্ভরশীল ছিল না।

মসলিন বুননের উপযোগী সকল কার্পাস ঢাকা জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই জন্মাত। সাধারণত পূর্ব বাংলার সর্বত্রই কম-বেশি কার্পাস উৎপন্ন হত। এই সব কার্পাস দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ফুটী ও বয়রাতি। ফুটী কার্পাস বয়রাতি কার্পাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। যদিও বয়রাতি কার্পাস দিয়েও মুসলিন বুনন করা হত। কার্পাস ঢাকা জেলার অন্যতম প্রধান কৃষিজাত পণ্য ছিল। কিন্তু উৎকৃষ্টতম কার্পাস যা সূক্ষ্ম মসলিনের নিতান্ত অপরিহার্য উপকরণ ছিল, শুধু মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে সামান্য ভূ-ভাগেই ভাল জন্মাত। এই ভূ-ভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর ও ইদিলাপুর নামক পরগনাসমূহ ফুটী কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। জন টেলরের মতে, এই ভূ-ভাগে উৎপাদিত ফুটী কার্পাস পৃথিবীর যে কোন দেশে উৎপাদিত কার্পাস থেকে শ্রেয় ছিল।[১] তাছাড়া লক্ষ্যা নদীর তীর ঘেষে রূপগঞ্জ থানা এলাকায় প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ ভূ-ভাগেও উৎকৃষ্ট ফুটী কার্পাস উৎপাদিত হত।

কার্পাস বীজ বছরে দু'বার বপণ করা হত। প্রথম ফসল চয়ন করা হত বসন্তকালে এবং দ্বিতীয় ফসল শরৎকালে। কার্পাস গাছ সাধারণত ৪/৫ ফুট দীর্ঘ ছিল বসন্তকালে যে ফসল চয়ন করা হতো সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। সুতরাং ঐ ফসলই অত্যধিক পরিমাণে চাষ করা হত। সাধারণত ঐ ফসলের জমিতে বর্ষাকালে ধানের চাষ হত। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধানের ফসল চয়ন করার পর একই জমিতে কার্পাস বীজ বপণ করা হত। কার্পাস বীজ অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষণ করা হত। তুলা সহ বীজ বাছাই করে মাটির পাত্রে রাখা হত। ঐ সব পাত্রগুলো ঘি অথবা তেলে সিদ্ধ করে নেওয়া হত এবং বীজ ভর্তি পাত্র মুখ বন্ধ করে উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা হত, যাতে রান্নার সময় ঐ পাত্রে উনুনের ধোয়া লাগে। কার্পাস বীজকে আর্দ্রতা মুক্ত রাখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বীজ বপণের প্রণালী ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট ছিল। জমি বেশ গভীরভাবে চাষ করার পর জমিতে প্রায় ১৫ ফুট অন্তর আড়াআড়িভাবে রেখা টানা হত এবং ঐ রেখার প্রতিফুটে ২/৩ টি করে বীজ বপণ করা হত। বপণের আগে বীজগুলো পানিতে ভিজিয়ে আর্দ্র করে নেয়া হত। কোন কোন এলাকায় প্রথমে কার্পাস বীজের চারা উৎপাদন করে পূর্বোক্ত নিয়মে জমিতে চারা লাগানো হত। চারাগুলো একটু বড় হলেই জমি ভাল করে নিড়ান হত এবং চারার গোড়ার মাটি নরম করে দেয়া হত। সময় সময় কার্পাস গাছ অনাবৃষ্টি, পোকা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির কারণে নষ্ট হয়ে যেত। বসন্তকাল আসতেই কার্পাস চয়ন করা হত। কোন কোন সময় একই জমিতে ২/৩ বছর কার্পাস উৎপাদনের পর এক বছরকাল জমি ফেলে রাখা হত। কিন্তু সাধারণত পালাক্রমে একই জমিতে বিভিন্ন রকমের ফসল বোনা হত, যেমন-তিল, সরিষা, ধান ইত্যাদি। যাতে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস না পায়। এক বিঘা জমিতে বপণ করার জন্য প্রায় ২ সের বীজ লাগত এবং সাধারণত এক বিঘা জমিতে দুই মণ কার্পাস জন্মাত। প্রতিসের কার্পাসের চার ভাগের তিন ভাগেরও বেশি পরিমাণ থাকত বীজ, বাকী এক ভাগেরও কম পরিমাণ থাকত তুলা। মাত্র এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ যা বীজের নিকটতম থাকত, উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরির উপযুক্ত ছিল। বাকী তুলার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের দ্বারা মাঝারি রকমের কাপড় তৈরি সম্ভবপর ছিল।

যেহেতু শরৎকালীন ফসলের সুতা, বসন্তকালীন সুতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, এর ফলে উৎকৃষ্টতম কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। শরৎকালীন তুলার দাম সস্তা ছিল। ঢাকার বস্ত্র শিল্প যেভাবে উন্নতি লাভ করেছিল, তাতে ঢাকার উৎপাদিত তুলা দ্বারা ঢাকার বস্ত্র শিল্পের চাহিদা মিটতো না। তাছাড়া ঢাকার ফুটী কার্পাস শুধু সূক্ষ্মতম মসলিনের জন্যই নির্ধারিত ছিল। তাই ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের জন্য পাক ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকেও কার্পাস আমদানি করা হত।[১১] এসব তুলা প্রধানত গুজরাট থেকেই আমদানি করা হত। এবং একে সিরঞ্জ বলা হত। এসব তুলার সাহায্যে মাঝারি রকমের ও নিকৃষ্টতর কাপড় তৈরি করা হত। আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা এবং আরকান থেকেও তুলা আমদানি করা হতো। এই সব তুলা সাধারণত ভোগা কার্পাস জাতীয় ছিল এবং এর দ্বারা শুধু মোটা কাপড় তৈরি করা হত।[১২]

কার্পাস চাষী

ভাল ফসল হলে এক বিঘা জমিতে দুই মণ কার্পাস উৎপন্ন হত। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে এক সের কার্পাসের দাম ছিল ৪/৫ পণ কড়ি এবং ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে এর দাম ছিল ৯ পণ কড়ি।[১] যেহেতু কড়ির আমদানি কম বা বেশি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কড়ির দাম উঠানামা করত, সেহেতু ৪/৫ পণ কড়ির প্রকৃত দাম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ২০ পণ কড়ির দাম ১টাকা ধরে নিলে সাধারণত এ হিসাবই আদর্শ রূপে গণ্য করা হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ১ সের কার্পাসের দাম পড়ে ৩ থেকে ৪ আনা। এ হিসাবে এক বিঘা জমিতে প্রায় ২০টাকার কার্পাস উৎপন্ন হত। কিন্তু কার্পাস চাষ করার খরচও ছিল; নীচে লাভ ও খরচের একটি তালিকা দেয়া হলো।[১২]

তালিকা – ১

কার্পাস চাষের খরচ ও আয়

লাভ	খরচ	
২০ মণ কার্পাসের দাম = ২০.০০ টাকা	জমির খাজনা	০০.৫০ টাকা
	কার্পাস বীজ আনুমানিক	০০.১২ টাকা
	চাষ খরচ	৬.০০ টাকা
	নিড়ান খরচ	১.০০ টাকা
	মোট—	৭.৬২ টাকা
	মোট লাভ—	১২.৩৮ টাকা
২০.০০ টাকা		২০.০০ টাকা

আগেই বলা হয়েছে একই জমিতে কার্পাস ফসল চয়ন করার পর তিল, সরিষা ইত্যাদি অন্যান্য ফসলের বীজ বপণ করা হত ; সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, এক বিঘা জমিতে চাষীরা বছরে প্রায় ২০ টাকা আয় করতে পারত।

উপরে যে হিসাব দেয়া হলো তা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কাগজে কলমের হিসাব। প্রকৃত অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল। যে সব চাষীদের অবস্থা ভাল ছিল তারা ফসল চয়ন করে কার্পাস জমা করে রাখত এবং চড়া দামে বিক্রির জন্য মজুত করে রাখত। আবার কোন কোন চাষীর পরিবারে মেয়েরা অবসর সময়ে সুতা কাটতো; ফলে সুতা বিক্রি করে কার্পাস বিক্রির চেয়ে অনেকগুণ বেশি দাম পেত। কিন্তু গরীব চাষীদের কার্পাস মজুত রাখার বা সুতা কেটে বিক্রি করার উপায় ছিল না। ব্যবসায়ীদের দালাল এবং পাইকাররা কার্পাস জমিতে থাকা অবস্থাতেই চাষীদের ধাওয়া করত। হয় চাষের খরচের দায়ে বা পেটের দায়ে গরীব চাষীরা দালালদের নিকট থেকে বীজ বপণ করার অগ্রিম টাকা নেয়ার দরুন সব সময় বাজার দরের কম দামে কার্পাস বিক্রি করে দিতে বাধ্য হত। এরূপ চাষীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না এবং চতুর, দালালরা অনেক সময় কম দামে কার্পাস পাওয়ার লোভে চাষীদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত। নিরক্ষর চাষীরা প্রায় সময় তাদের খপ্পরে পড়ে তাদের নায্যমূল্য পেত না।

এ দেশ মসলিনের জন্য বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত মানের সুতা উৎপন্ন করা সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনে তুলার উৎপাদন কমে যেতে থাকে। তদুপরি বৃটেনে মসলিন বস্ত্র আমদানির উপর উচ্চ কর আরোপের ফলে বৃটেনে মসলিন রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিলেতে বস্ত্র শিল্পে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে কলকব্জা ব্যবহার ও বিলাতী সস্তা সুতার আমদানির ফলে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তুলা উৎপাদন কমতে থাকে এবং ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটেনে মসলিন রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডের তৈরি জিনিসের বাজার সৃষ্টি করার জন্য এদেশে তুলা চাষ করাকে নিরুৎসাহিত করা হত। তদুপরি পাট চাষের প্রবর্তন করা হয় এবং পাট চাষে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে তুলা উৎপাদনের জমির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তাছাড়া বেশি পরিমাণে বিদেশী তুলা এদেশে আমদানি হতে থাকে। শুধু অর্ধ শতাব্দী ধরে ছোট আশাযুক্ত দেশী তুলা "জি আরবোরিয়াম" উৎপাদন করা হত যা কুমিল্লা কটন নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের তুলা চাষের অবনতি ঘটে। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিজয়; যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি কারণে দেশী বস্ত্র দারুণভাবে মার খায়। আবার দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের নীতিও ছিল ইংরেজদের অনুরূপ যে কারণে বস্ত্র তৈরির কারখানা এখনে গড়ে উঠলেও কাঁচামাল হিসাবে তুলা আসতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। বস্ত্র শিল্পে বাংলার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের কোন প্রচেষ্টাই নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তুলা চাষের কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং তুলা চাষকে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৭৭ সনে "তুলা উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করা হয়। ফলশ্রুতিতে কিছু শুভ ফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে তুলা চাষের প্রয়োজনীয়তা

নিম্নলিখিত কারণে তুলাচাষের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

১. অনাবাদী এবং এক ফসলী যে সব জমিতে রবি মৌসুমে কম ফলনযুক্ত শস্য আবাদ হয়, বিশেষ করে সেসব জমি যদি তুলা চাষের আওতায় আনা যায় তবে অধিক পরিমাণে তুলা পাবার সম্ভাবনা থাকে এবং কৃষকরাও অধিক লাভবান হবেন।

২. আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আবাদী এলাকা এবং একর প্রতি ফলন বাড়িয়ে দেশের চাহিদার ঘাটতি বহুলাংশে পূরণ করা যাবে। ফলে এই খাতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে যা কিনা অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা যেতে পারে।

৩. আঁশের সাথে সাথে তুলা বীজের তৈল ও খৈল প্রক্রিয়াজাতকরা ও ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কেননা এখান থেকে যে খৈল তৈরি করা যায় তাতে ৮৬ ভাগ প্রোটিন থাকে এবং এটা একটা আদর্শ গো-খাদ্য।

৪. তুলা চাষের মাধ্যমে অনেক বেকার কৃষিশ্রমিকের কাজের সৃষ্টি করা যায়। উপরিউক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে দেখতে পাই যে, তুলা চাষ বৃদ্ধি করা আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য।

তুলার শ্রেণীবিভাগ

উৎপাদনকারী অঞ্চল, ব্যবহারের তারতম্য অথবা আঁশের দৈর্ঘ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে তুলার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিচে আঁশের দৈর্ঘ্য, রং, মসৃণতা ইত্যাদির ভিত্তিতে তুলার শ্রেণীবিভাগ করা হলো।

১. **দীর্ঘ আঁশ যুক্ত তুলা ঃ** যে তুলার আঁশ ৩.৮১ সে. মি. হতে ৬.২৫ সে. মি.পর্যন্ত লম্বা হয় তাদের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা বলা হয়। এই তুলার আঁশ অত্যন্ত উজ্জ্বল, চিকন এবং রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও মসৃণ অথচ বেশ শক্ত। এটা সর্বোৎকৃষ্ট তুলা। এই তুলাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. **সাগর দ্বিপীয় তুলাঃ** লম্বা আঁশযুক্ত তুলার মধ্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এর আঁশ ৫–৬.২৫ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। রেশমী আভাযুক্ত, সূক্ষ্ম, মসৃণ, কোমল ও মিহি এই তুলার আঁশ বেশ শক্ত ও মজবুত। উচ্চমানের সুতী কাপড় তৈরির জন্য ব্যবহার হয়।

খ. **মিশরীয় তুলাঃ** মিশরের নীল নদীর অববাহিকায় যে দীর্ঘ আঁশযুক্ত (প্রায় ৩.৮১ – ৫ সে. মি.) তুলা উৎপাদিত হয়, তাকে মিশরীয় তুলা বলা হয়। এর আঁশের রং চকচকে উজ্জ্বল রেশমী আভাযুক্ত এবং সাগর-দ্বিপীয় তুলার ন্যায় এটা কোমল, মসৃণ, মিহি ও বেশ শক্ত। রেশমের সাথে মিলিয়ে উন্নতমানের কাপড় তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়।

২. **মধ্যম আঁশযুক্ত তুলাঃ** যে তুলার আঁশ ২.২ – ৩.২ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা তাকে মধ্যম আঁশযুক্ত তুলা বা উচ্চভূমির তুলা বলা হয়। এতে রেশমী আভা থাকে না। তবে এর আঁশ মিহি, কোমল, বেশ শক্ত ও সাদা। উন্নতমানের কাপড় তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হয়।

৩. **ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলাঃ** যে তুলা আঁশের দৈর্ঘ্য ২.২ সে. মি. এর কম হয় তাকে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা বলা হয়। এটা সর্বনিম্নমানের তুলা। এই তুলার আঁশ মোটা খসখসে ও শক্ত। সাধারণত নিম্নমানের ও মোটাকাপড় তৈরির জন্য এই তুলা ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের তুলার প্রধান উৎপাদন স্থানসমূহ

বাংলাদেশের পশ্চিম মধ্য ও উত্তরাঞ্চলেই তুলার চাষ বেশি হয়। তবে রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া ইত্যাদি জেলায় বেশি পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয়।

দেশের অভ্যন্তরে তুলা উৎপাদনের পরিমাণঃ তুলা চাষে সরকারী উৎসাহ থাকায় ক্রমশই এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৫–৮৬ সালে তুলা চাষ মৌসুমে ৮০,০০০ একর জমি তুলা চাষ প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অধীন দেশের ২৮টি জেলার ৮৯ টি উপজেলায় মোট ১১৫ টি ইউনিট রয়েছে। পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে একর প্রতি ৯মণ হিসাবে মোট ৭,২০,০০০ মণ বীজ তুলা বা ৪৮,০০০ বেল নীট তুলা উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তালিকা ২-এ দেশের কয়েক বছরের তুলা উৎপাদনের পরিমাণ ও স্থান দেয়া হলো।

তুলা চাষের আর্থিক দিক

এবার বাংলাদেশের তুলা চাষের অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা উচিত। রবি মৌসুমে তুলার সাথে প্রতিযোগিতামূলক ফসল সরিষা, ছোলা, তিসি, মসুর, ও গমের তুলনায়

তুলা চাষ অধিকতর লাভজনক। সেচকৃত ফসল হিসাবে এমনকি গমও তুলার সাথে আর্থিক দিক দিয়ে টিকতে পারবে না এবং তা ইতিমধ্যেই যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায় প্রমাণিত হয়েছে।

তালিকা – ২
বাংলাদেশে তুলা উৎপাদন

বছর	লক্ষ্য		লক্ষ্য অর্জন	
	জমির পরিমাণ একর হিসাবে	উৎপাদন বেল হিসাবে	জমির পরিমাণ একর হিসাবে	উৎপাদনের পরিমাণ বেল হিসাবে
১৯৭৮–৭৯	৭,৫০০	৫,০০০	৭,০০০	৩,৭৬০
১৯৭৯–৮০	১৫,০০০	৯,০০০	১১,২০০	৬,০০০
১৯৮০–৮১	২৫,০০০	১৫,০০০	২২,৪০০	৯,৪০০
১৯৮১–৮২	৪০,০০০	২৪,০০০	৪০,০০০	১৬,৩০০
১৯৮২–৮৩	৭৫,০০০	৩৫,০০০	৬০,০০০	২৮,০০০
১৯৮৩–৮৪	৮০,০০০	৪২,০০০	৬০,০০০	৩০,০০০
১৯৮৪–৮৫	৮০,০০০	৪৪,০০০	২৪,০০০	১২,০০০
১৯৮৫–৮৬	৮০,০০০	৪৫,০০০	৭০,১০০	৩৫,০০০ (আনুমানিক)

উৎসঃ তুলা উন্নয়ন বোর্ড

এক একর জমি হতে ১০ মণ বীজ তুলা অতি সহজেই উৎপন্ন করা সম্ভব। প্রতিমণ বীজতুলা মান অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত মূল্য ৫০০ টাকা হতে ৫৬০ টাকা হিসাবে তুলা চাষীরা বিক্রি করতে পারেন। প্রতিমণ ৫৫০ টাকা ধরলেও সেই আয় দাঁড়ায় ৫৫০০ টাকা। উৎপাদন খরচ একরে ২,০০০ টাকা বাদ দিয়ে চাষীরা ৩,৫০০ টাকা নেট আয় করতে পারেন। এছাড়া একরে ২০ মণের মত শুষ্ক গাছও পাওয়া যায়, যা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এরও মণ প্রতি ২০ টাকা ধরলে মোট ৪০০ টাকা পাওয়া যাবে। এ গেল একজন কৃষকের লাভ।

এবার তুলা উৎপাদন দিয়ে দেশ কিভাবে উপকৃত হতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করা উচিত। প্রথমত এদেশে যে তুলা উৎপাদন হচ্ছে তা মান ও গুণের দিক দিয়ে আমদানিকৃত

তুলার থেকেও উৎকৃষ্ট। মিলে এ তুলার অবচয় হবে অনেক কম। দ্বিতীয়ত দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে, যা অন্যসব উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

যেহেতু দেশে উৎপাদিত তুলা দেশীয় মুদ্রায় ক্রয় করা হয় তাই প্রয়োজন হলে তুলার মূল্য আরো বাড়িয়ে ব্যাপক তুলা চাষ সম্প্রসারণে সরকারের অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। তৃতীয়ত তুলার বীজ থেকে তেল ও উৎকৃষ্টমানের খৈল পাওয়া যায়–যা দেশের ভোজ্য তেলের ও গো খাদ্যের চাহিদাও কিছু অংশে মেটাতে সাহায্য করবে।

তুলা চাষের ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

বাংলাদেশের তুলা চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত চাষী এমনকি আমাদের বিত্তবান চাষীদেরকেও মৌসুমের সময় সহজ শর্তে ঋণ না দিলে উপকরণের ব্যবহার এবং অধিক ফলন নিশ্চিতকরণ এক রকম অসম্ভব। সুতরাং ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তুলা চাষ প্রকল্পের জন্য অপরিহার্য। ঋণের টাকা আদায়ের বেলায় কিছু চাষী মাঠ-কর্মীদের উপর সাময়িক অসন্তুষ্ট হলেও অধিকাংশ চাষীই সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ায় এবং বিনা হয়রানীতে ঋণ ফেরৎ দিতে পারেন বলে সন্তুষ্ট। অতএব, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, চাষীরা ঋণ নিয়ে তা অধিক ফলনের কাজে প্রয়োগ করবেন এবং সময়মত ঋণ ফেরৎ দেবেন। যাতে পরবর্তী মৌসুমের জন্য তাদের ঋণের চাহিদা পুরোপুরি মিটানো যায়।

সাধারণত নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ করা যায়। যথা—

ক. **সিকিউরিটিঃ** জমিজমা ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধকের মাধ্যমে

খ. **ব্যক্তিগত জামিনঃ** কোন ব্যক্তি বিশেষ ঋণের জন্য জামিন হওয়ার মাধ্যমে ও

গ. **হাইপোথিকেশন বা শস্য বন্ধকী ঋণঃ** ক্ষেতের শস্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অথবা শস্য বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার বিশেষ কৃষিঋণ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে তুলা উৎপাদন ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন।

একজন কৃষককে তুলা চাষের জন্য কৃষি ঋণ পেতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

১. ঋণের জন্য আগ্রহী পক্ষকে একজন প্রকৃত চাষী হতে হবে এবং কমপক্ষে দুই একর জমি তুলা চাষের আওতায় আনতে হবে।

২. চাষীকে অবশ্যই তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তালিকাভুক্ত হতে হবে।

৩. এই ঋণের জন্য বিশেষ কৃষিঋণ কর্মসূচীর ঋণ দরখাস্তের ফরম ব্যবহার করতে হবে।

৪. প্রত্যেক নির্দিষ্ট তুলা চাষীকে শস্য বন্ধকী ঋণের আওতায় একর প্রতি ১,৬০০ টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৩ একর জমিতে তুলা চাষের জন্য ৪,৮০০ টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু ৩ একরের বেশি সর্বোচ্চ ৫ একর পর্যন্ত জমিতে তুলা চাষকারী চাষীকে নিয়ম মোতাবেক জমি/সম্পত্তি বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫. প্রত্যেক ঋণের দরখাস্তের উপরে আবেদনকারী চাষীর মোট জমি ও তুলা চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী (তার সীল স্বাক্ষরসহ) সুপারিশ করেন এবং তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার যাচাইপূর্বক স্বাক্ষর করেন।

৬. যে সব নির্বাচিত চাষীকে ব্যাংকে ঋণ অনুমোদন দেয়া যায় তারা মাঠ কর্মীদের পরামর্শ মত দলগতভাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংকে উপস্থিত হন। তাদেরকে সনাক্ত করার জন্য মাঠকর্মী ও ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে থাকেন।

৭. তুলা চাষীদের মধ্যে ব্যাংক সপ্তাহে ২দিন ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক দিন ১০০ জন করে অর্থাৎ সপ্তাহে অন্তত ২০০ চাষীর মধ্যে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

তুলার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা

কৃষকদের কাছ থেকে তুলা প্রধানত দুটি ধারায় বাজারে আসে। আভ্যন্তরীণ বাজারে বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ বস্ত্র কল সংস্থাই সবচেয়ে বড় ক্রেতা। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তুলা উন্নয়ন বোর্ড ২৫ ভাগ গুণাগুণসম্পন্ন বীজতুলা খরিদ করে। এ জাতীয় তুলা খরিদ করার আগে বোর্ডের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞগণ ফসল বপণ হতে শুরু করে গুদামজাতকরণ পর্যন্ত তদারকী করে থাকেন। বাকী ৭৫ ভাগ বীজতুলা বি. টি. এম. সি (বস্ত্রমিল সংস্থা) এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পরিচালিত মিলসমূহ খরিদ করে থাকে। তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা নির্দিষ্ট খরিদ কেন্দ্রে ক্রয় করে থাকে। অন্যদিকে ফড়িয়ারা কৃষকদের কাছ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলা ক্রয় করে গ্রামীণ বাজারে আনে। পরবর্তী পর্যায়ে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ফড়িয়াদের কাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে পাইকারী বাজারে পাঠায়। ফড়িয়াদের সংগৃহিত তুলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেপ, বালিশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অনেক ক্রেতা গ্রামাঞ্চলে ফড়িয়া অথবা কৃষকদের কাছ থেকে তুলা ক্রয় করে সরাসরি নিজেদের ব্যবহারে লাগায়।

জিনিং

তুলা উন্নয়ন বোর্ড; বি. টি. এম. সি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিচালিত মিলগুলো নিজ নিজ খরিদকৃত বীজতুলা জিনিং করে থাকে। তবে যে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলে জিনিং মেশিন

নাই সেখানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রাইভেট মিলের খরচে জিনিং এর ব্যবস্থা করে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ডে হাতে ৫০টির মতো '২০-স" এবং ১২ টির মতো রোলার জিন আছে এবং তা কার্যকারিতার দিক থেকে আমদানিকৃত স জিনের সমকক্ষ। বর্তমানে বি. টি. এম.সি; বোর্ড এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলে যে জিনিং মেশিন আছে তা দিয়ে জিনিং সময়মত করা সম্ভব হয় না। তাই তুলা উন্নয়ন বোর্ড বড় আকারের (৬০-স জিন) কিছু জিন তৈরি করার কাজ হাতে নিয়েছেন।

যে সব উপাদান তুলা বাজারজাতকরণে অসুবিধা সৃষ্টি করে

বাজারজাতকরণে বাংলাদেশে অন্যান্য কৃষিপণ্যের যে সব সমস্যা দেখা যায় তুলার ক্ষেত্রেও আমরা তা দেখতে পাই। এসব সমস্যার যাতাকলে পড়ে আমাদের দেশের তুলা বাজারজাতকরণের দক্ষতা বিঘ্নিত বা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা তুলা বাজারজাতকরণ দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি ঃ

১. যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থাঃ আমরা জানি সারা দেশের মধ্যে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরাঞ্চলেই তুলার চাষ বেশি হয়। অথচ এসব এলাকার অধিকাংশ স্থানের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। পরিবহণ ব্যবস্থার এই অপ্রতুলতা তুলা বিপণনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

২. ক্রেতাদের অবহেলাঃ তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও বি. টি. এম. সি হচ্ছে বাংলাদেশের তুলার প্রধান ক্রেতা। অন্যান্য বেসরকারী কোম্পানীও সরাসরি তুলা কিনে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় তুলা ক্রয়কারী কোম্পানীগুলো এক বছর পরে মূল্য পরিশোধের শর্তে তুলা ক্রয় করে। যথেষ্ট সংখ্যক ক্রেতার অভাবে উৎপাদকরা এই শর্তে তুলা বিক্রি করতে রাজী হয়। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া যায় যে এমনিভাবে ক্রয়কৃত তুলার মূল্য কোম্পানীগুলো ঠিকমত পরিশোধ করে না। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারী দামে পণ্য ক্রয় করলেও গ্রেডিং এর মারপ্যাচের মাধ্যমে চাষীদের ঠকিয়ে থাকে।

৩. ফটকা ব্যবসায়ীদের প্রভাবঃ তুলা চাষীরা প্রায়ই ঠিক সময়ে ক্রেতার অভাবে বিক্রিয়ের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ফলে উৎপাদনকারী বা চাষী আর্থিক সঙ্কটে পড়ে। এই সুযোগেই এক ধরনের ফাটকা ব্যবসায়ী পানির দামে তুলা সংগ্রহ করে। এসব ক্ষেত্রে তারা সরকার কর্তৃক দামের তোয়াক্কা করে না।

৪. প্রযুক্তির অভাব ঃ আমাদের দেশে চাষাবাদ হয় প্রাচীন রীতিতে। এদেশের অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত বলে তারা আধুনিক যন্ত্রপাতী বা চাষাবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ফলে তাদের পক্ষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব হয় না।

৫. **পোকামাকড়ের আক্রমণঃ** অন্যান্য ফসলের ন্যায় তুলা ফসলেও নানা রকম পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়ে থাকে। যেমন–ফোট দাগবিশিষ্ট বোল ওয়ার্ম, তুলার পাতা মোড়ানো পোকা, তুলার লাল গান্ধি পোকা ইত্যাদি। ফলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে বিপুল পরিমাণে তুলা পোকামাকড় দ্বারা নষ্ট হয়।

৬. **ব্যাংকে ঋণের অভাবঃ** যদিও তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যাতে কৃষকরা সহজেই চাষাবাদ করতে পারে সেদিকে সরকার নজর রাখে তবুও দেখা যায় অনেক সময় এই ঋণ ঠিকমত ব্যবহার হয় না। ফলে প্রকৃত গরীব তুলা উৎপাদনকারীরা টাকার অভাবে ঠিকমত তুলা বীজ সংগ্রহ ও চাষাবাদ করতে পারে না।

৭. **মান নিয়ন্ত্রণের অভাবঃ** আমাদের দেশে যেসব তুলা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সঠিকভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে আমাদের দেশের তুলার মান উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

৮. **সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবঃ** সরকারী কর্মচারীর কাজে অবহেলাও তুলা বিপণনের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সুপারভাইজারসহ কিছু কর্মকর্তা তুলা ক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার নির্দেশ থাকলেও অধিকাংশ সময়ে তারা উপস্থিত থাকেন না। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবস্থার কারণেও তুলা চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে তুলার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায়ও অদক্ষতার কালোছোয়া নেমে আসছে।

তুলা বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়

তুলা বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **অযৌক্তিক চার্জ আদায়ঃ** তুলা বাজারজাতকরণে কতকগুলো অযৌক্তিক চার্জ আদায় করা হয় যেমন ওজনে বেশি ধরা, বাজার কর, দাতব্য সংগঠনে দান ইত্যাদি। এসব বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

২. **তুলা চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানঃ** তুলা চাষীরা যাতে করে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ন্যায্যমূল্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ফড়িয়ারা যাতে চাষীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার সুযোগ নিতে না পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।

৩. **তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতিঃ** তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীরা যাতে নিয়মিত তুলা ক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারা উপস্থিত না থাকলে তার জন্যে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

Library
Accession No. 18910

৪. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিঃ** যে সব এলাকায় তুলা উৎপাদিত হয় সে সব এলাকা হতে অন্য এলাকায় তুলা পরিবহণের সুবিধার্থে এসব এলাকার পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে; যাতে অতি সহজে তুলা অন্যত্র নেয়া যায়।

৫. **চাষীদের ব্যাংক ঋণের সুবিধাঃ** তুলা চাষীদের ব্যাংক ঋণের সুযোগ বাড়াতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা এমন করা প্রয়োজন যাতে করে কৃষকরা স্বল্প সুদে ঋণ পেতে পারে।

৬. **তুলার সুষ্ঠু সংরক্ষণের ব্যবস্থাঃ** তুলার সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে; যাতে করে এই সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণের মাধ্যমে তুলা বিপণনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৭. **তুলা উন্নয়ন বোর্ড; বি. টি. এম. সি ও অন্যান্য প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর সহযোগিতা বৃদ্ধিঃ** এ সমস্ত সংস্থাসমূহের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে চাষীরা তুলা চাষে উৎসাহ বোধ করে। এতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাবে। ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার খরচের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

৮. **বাকীতে মাল কেনার প্রবণতা হ্রাসঃ** কোম্পানীগুলোর বাকীতে মাল কেনার প্রবণতা হ্রাস করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশের চাষীরা খুবই গরীব; সেহেতু বাকীতে মাল বিক্রয় করা তাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক।

আলোচিত বিষয়গুলোর সমাধানের ফলে তুলা শিল্পের বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যে সব অন্তরায় আছে তা দূর করা যাবে।

উপসংহার

তুলা শিল্পের উত্তরোত্তর প্রসার লাভের জন্য সুষ্ঠু ও সঠিক পদক্ষেপ যত তাড়াতাড়ি নেয়া যায় তত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের তুলা শিল্পের এবং এর সাথে জড়িত গরীব অথচ কর্মঠ কৃষকদের উন্নতিসাধন করা যাবে। যার ফলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আরও জোরদার হবে।

যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত সে দেশ সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে ততটা অগ্রগামী। কাজেই সমাজের সব মানুষকেই এ ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে; তাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং কৃষকদের সমস্যা সমাধানকল্পে সাহায্য করতে হবে।

পাদটীকা

১. উদ্ধৃতির জন্য দেখুন —A Descriptive and historical account of the cotton manufacture of dhaka-p.p. viii-xi.

২. F. Watson: The textile Fabrics of India, Vol-vii, এই পুস্তকে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত মসলিনের বিবরণ দেয়া আছে।

৩. A general Guide to Dhaka Muslem p-62. এটা ঢাকা বল্ধা মিউজিয়াম থেকে আনা হয়েছে।

৪. Modern Review, April, 1925, p-400.

৫. A Descriptive and historical Accounts of the cotton manufacture of Dhaka, p. p. 48-52.

৬. Ellpt and Dowson. History of India as told by its own historian vol. 1. p. 5.

৭. সাহিত্য পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পৃ. ৮৫--৮৯.

৮. Voyager D Ibn Batoutah, vol-iv. p. 122.

৯. Visva Bharati Annuals. Vol. 1. 1945.

১০. W. Foster ed: Early Travels in India. p-28, Ain-1-Akbari, tr. by Jarrett. vol 11, p. 124.

১১. Journal of the Asiatic Society of Pakistan. vol-v11 No-2 p- 328

১২. ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার ধান চাষের হিসাব অবলম্বনে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Kols, R. L. and Uhl, J. N., **Marketing of Agricultural Products,** 6th edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1985.

2. Shepherd, G. S. and Futrell, G. A., **Marketing Farm Products**. Economic Analysis, 7th edition, The Iowa State University Press/Ames, 1982.

3. Thomsen, F. L., **Agricultural Marketing,** First edition, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1951.

4. Shepherd, G. S., **A Framework of Marketing Theory,** Iowa State College, Iowa, 1938.

5. Stanton, W, J., **Fundamentals of Marketing.** 6th edition McGraw-Hill Book Company, New York, 1981.

6. Koller, P. A. and Armstrong, G, **Principles of Marketing.** 4th edition, Prentice Hall International, Inc. New York, 1989

7. Converse, Huegy and Mitchell, **Elements of Marketing.** 7th edition, Prentice Hall Inc., New York, 1965

8. ফারুক, আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশের পণ্য বিপণন ব্যবস্থা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

9. ফারুক, আব্দুল্লাহ্ ও অন্যান্য, বিপণন তত্ত্ব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ১৯৮৯।

10. ফারুক, আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।